জীবন সংগ্রাম

মণি সিংহ

জীবন-সংগ্রাম

মণি সিংহ

জীবন-সংগ্রাম

অখণ্ড

মণি সিংহ

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

জীবন-সংগ্রাম

অখণ্ড

মণি সিংহ

প্রকাশক

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

মুক্তিভবন, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক
পুরানা পল্টন, ঢাকা
ফোন : ০১৭৬৬৭৯৭৯৭৯, ফ্যাক্স : ৯৫৫২৩৩৩
ই-মেইল : jatiya.sahitya@gmail com

অখণ্ড সংস্করণ প্রথম প্রকাশ
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫, ১৭ পৌষ ১৪২২

প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : ২৮ জুলাই ১৯৮৩
দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

বিশেষ সহযোগিতা
কমরেড মণি সিংহ মেলা উদ্‌যাপন কমিটি

প্রচ্ছদ
শ্যামল চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
লেখনী কম্পিউটার্স
মুক্তিভবন, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক
পুরানা পল্টন, ঢাকা

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১১০ ফকিরেরপুল, ঢাকা। ফোন : ৭১৯৪৫৩০

দাম
বোর্ড বাঁধাই ৪৪০ টাকা
পেপারব্যাক ৩০০ টাকা

ISBN : 978-984-8675-44-1

কমরেড মণি সিংহ

জন্ম : ২৮ জুলাই ১৯০১, মৃত্যু : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯০

অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকা

কমরেড মণি সিংহ এই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা, অন্যতম স্থপতি। তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সভাপতি। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি, গণমানুষের মুক্তির লড়াইয়ে এবং কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। আদর্শ, অনুপ্রেরণা ও উজ্জীবনের অনন্ত উৎস তিনি। কমিউনিস্ট জীবনাদর্শই তাঁকে একজন অনুকরণীয় সাচ্চা কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সততা, আত্মত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুণের সমাহারই তাঁকে এ দেশের রাজনীতিতে অনন্য সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

কমরেড মণি সিংহের পরিবারপ্রদত্ত নাম মণীন্দ্র কুমার সিংহ। পার্টিতে ছদ্মনাম ছিল কমরেড আজাদ, কিন্তু তিনি 'বড় ভাই' বলেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। জনগণ তো বটেই, পার্টির নেতৃস্থানীয় অনেকেই স্বাধীনতার আগে তাঁকে সামনা-সামনি দেখতে পাননি। কারণ প্রায় গোটা পাকিস্তান আমলটাতে তাঁকে আত্মগোপনে থেকে কাজ করতে হয়েছে। সেই অবস্থায়ই আমি অবশ্য তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম—মে দিবস উপলক্ষে ১৯৬৬ সালে আয়োজিত পার্টির এক গোপন সভায়। তবে আরো পরে ১৯৭৭ সালে অনেকদিন ধরে তাঁর সঙ্গে জেলখানায় একই ওয়ার্ডে পাশাপাশি থাকার সুযোগ হয়েছিল। তখন একেবারে কাছ থেকে তাঁকে দেখা ও জানার অনন্য সুযোগ আমার হয়েছিল। জেলখানা তখন আমার জন্য হয়ে উঠেছিল পাঠশালা এবং জেলখানায় কমরেড মণি সিংহ হয়ে উঠেছিলেন পাঠশালার আচার্য।

১৯১৪ সালে কিশোর বয়সেই কমরেড মণি সিংহ ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য গঠিত অনুশীলন পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী সময়ে মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। কলকাতার মেটিয়াবরুজে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৫ সালে দীর্ঘ পাঁচ বছর কারাভোগের পর তাঁকে নিজের বাড়িতে নজরবন্দি করে রাখা হয়। তখন প্রতিদিন বিকেলে থানায় হাজিরা দিতে হতো। এ সময় পাটচাষিদের

দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁকে আবার কারাবরণ করতে হয়ে। ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি তিনি নদীয়া জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে ওই বছরই মাকে দেখার জন্য তিনি সুসং-দুর্গাপুরে আসেন। তখন দশাল গ্রামের কৃষকরা টংক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমরেড মণি সিংহের সাহায্য প্রত্যাশা করেন। তিনি কোনটা করবেন, শ্রমিক আন্দোলন নাকি টংক আন্দোলন—এ নিয়ে মণি সিংহের মনে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। টংক আন্দোলন করতে গেলে নিজ পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, সেজন্য কি শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বের কথা বলে টংক আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবেন? নিজের কাছে তিনি নিজেই সেই প্রশ্ন ছুড়ে দেন। অবশেষে দ্বিধা কাটিয়ে তিনি টংক আন্দোলনে সর্বতোভাবে যুক্ত হন। এটা ছিল তাঁর জীবনের এক ঐতিহাসিক বাঁক। তাঁর নেতৃত্বে গারো পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে টংক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে সে আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেয়।

১৯৪৫ সালে নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটি হিসেবে দুটি কমিটি গঠিত হয়। দুই কমিটিতেই পূর্ব পাকিস্তান অংশের প্রধান নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল কমরেড মণি সিংহকে।

আমাদের জাতীয় বিকাশের সঙ্গে কমরেড মণি সিংহের নাম বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে আছে। নেপথ্যে থেকে তিনি প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল রাজশাহী কারাগার ভেঙে বন্দীরা তাঁকে মুক্ত করেন। মুক্ত হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি গড়ে তোলেন ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনী। স্বাধীনতার প্রশ্নে ১৯৬১ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ও কমরেড খোকা রায়ের ঐতিহাসিক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে রচিত হয়েছিল গণতন্ত্র ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের ভিত্তি। ইতিহাসবিদদের মতে, এই বৈঠকটি এদেশের পরবর্তী ঘটনাবলির বিকাশের ক্ষেত্রে ছিল দিক নির্ধারণমূলক।

কমরেড মণি সিংহ ইতিহাসের মহানায়ক, টংক আন্দোলনের বীর নেতা ‘মণিরাজ’। কৃষক আন্দোলনে অনন্য ভূমিকার জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে সারা ভারতে তিনি পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশের দশক থেকেই তিনি জীবন্ত কিংবদন্তী। আত্মগোপনে থাকার কারণে তাঁর সম্পর্কে স্বপ্নলোকের রাজপুত্রের মতো বহু সত্য ও কল্পনা মেশানো কাহিনী সমাজে প্রচারিত ছিল। মানুষ বিশ্বাস

করত আর বলত যে—তিনি গারো পাহাড়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান, অতি দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে পারেন, মুহূর্তের মধ্যেই চেহারা পরিবর্তন করতে পারেন ইত্যাদি।

কমরেড মণি সিংহ ছিলেন গণচরিত্রের অধিকারী। উচ্চ আরাম-আয়েশকেন্দ্রিক জীবনের মোহ ত্যাগ করে তিনি সাধারণের সঙ্গে সহজেই একাত্ম হতে পেরেছিলেন। টংক আন্দোলনের সময় হাজংদের জন্য কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাজং-গারোদের খাওয়া-পরা, আচার-আচরণ তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন। এভাবে তিনি তাঁদের সমাজেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সুখ-দুঃখের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে তাঁদের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী শক্তিকে তিনি জাগ্রত করতে পেরেছিলেন। মণি সিংহের ডাকে হাজং, গারোরা যখন মাথায় লাল ফিতা বেঁধে হাতে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে 'জান দেব তবু ধান দেব না' বলে মার্চ করত, তখন সেটা অনন্য দৃষ্টিনন্দন বিষয় হয়ে উঠত।

বলপ্রয়োগ, অত্যাচার ও হামলা করে টংক আন্দোলনের প্রথম দফার ব্যাপকতা ও তীব্রতা দমন করতে না পেরে সরকার সংস্কারের পথ ধরে। জমিদারদের ধানের খাজনার পরিমাণ অর্ধেক করা হয়। প্রথম দফায় বিজয় ও নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ রাখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর টংক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলে, তা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। আন্দোলন দমন করতে এবার সশস্ত্র প্যারামিলিটারি বাহিনী এমন কি হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা ও দেশভাগের কারণে তে-ভাগা, টংক আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। '৪৮ সালের ডিসেম্বরে ময়মনসিংহ জেলা কমিটিতে আবারও টংক আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওটা ছিল তৃতীয় পর্যায়—সম্মুখযুদ্ধ ও সশস্ত্র গেরিলা লড়াইয়ের অধ্যায়। ওই লড়াই চলেছিল '৫০ সাল পর্যন্ত।

এ দফায় আন্দোলনকারীদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। আশ্রয়ের জন্য আন্দোলনরত হাজংরা পাহাড়ে ৯টি যুদ্ধঘাঁটি তৈরি করেন। সশস্ত্র পুলিশ, প্যারামিলিটারি এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য হাজংরা পাহাড়ি অঞ্চলে অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেন। গুপ্ত ক্যাম্পে তাঁরা ৮০টি গাদা বন্দুক এবং পর পর ৪০টি গুলি ছোড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন কামারশালার কামান তৈরি করতে সক্ষম হন। অনেক সময় তাঁরা পরাজিত পুলিশের রাইফেলও ছিনিয়ে নিয়েছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সকল কর্মী রাইফেল চালনা শেখেন। ১২ বছর ধরে চলা সংগ্রামে সব মিলিয়ে ৬০ জন হাজং প্রাণ হারান। পাকিস্তান সরকার সামরিক বাহিনী নামিয়ে গ্রামে গ্রামে হাজংদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণ, হত্যাসহ সবরকম নির্যাতন চালায়।

কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তখন ঘোষণা করা হয়, উত্তর ময়মনসিংহ মুক্তাঞ্চল গঠিত হয়েছে। তিন দফার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে টংক আন্দোলনে তখন এক অন্যরকম বিজয় এসেছিল। ধান কড়ারি খাজনা প্রথার অবসান হয়েছিল। অন্যদিকে কঠোর নির্যাতনে শক্তিশালী সংগঠন ভেঙে পড়েছিল। হাজার হাজার হাজং দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।

টংক আন্দোলন ছাড়াও কৃষক সমিতির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ডাকে সারা বাংলার ১৯টি জেলায় শুরু হয়েছিল তে-ভাগা আন্দোলন। '৪৬-'৪৭ সালে ময়মনসিংহের অনেক এলাকায় কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে তে-ভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর মতো গগনবিদারী স্লোগানের মধ্যেও শোষিত শ্রমিক ও নির্যাতিত কৃষকের মাঝে পড়ে থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম চালাতে পারলে কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করা যাবে বলে তিনি মনে করতেন। আন্দোলন করতে গিয়ে জেল-আত্মগোপনকে তিনি তাঁর জীবনের এক স্বাভাবিক অনুষঙ্গে পরিণত করেছিলেন।

রনদিভের লাইন অনুসারে টংকসহ অন্যান্য আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এর সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা কমিউনিস্টদের ওপর চালিয়েছিল প্রচণ্ড দমন-পীড়ন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করা অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল। দেশভাগের পর কমরেড মণি সিংহসহ হাতে গোনা কয়েকজন নেতার উপর দায়িত্ব পড়ে পার্টিকে নতুন করে দাঁড় করানোর। পার্টির অস্তিত্ব রক্ষা ও কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তখন গোপন 'ডেন' ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনের একেবারে পাশেই অধ্যাপক হিশামউদ্দিনের বাড়িতে একসময় তাঁর আস্তানা ছিল।

'৫১ সালে কুখ্যাত নুরুল আমিনের নির্দেশে পুলিশ মণি সিংহের নেত্রকোণার দুর্গাপুরস্থ বাড়ি ভেঙে, গাছ কেটে ভিটের ওপর মই চালিয়ে দেয়। তাঁর বৌদি, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় নামিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মণি সিংহকে তাঁর জমি ফেরত দিতে চেয়েছিলেন। মণি সিংহ তখন বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন—টংক আন্দোলন করতে গিয়ে যেসব হাজং কৃষকের জমি-বাড়ি বেদখল হয়েছে এবং যাঁদের বংশধররা এখনো বাংলাদেশে বেঁচে আছেন তাঁদেরকে তিনি (বঙ্গবন্ধু) বাড়ি-জমি ফেরত দিতে পারবেন কিনা। উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "সেটা সম্ভব নয়।" বঙ্গবন্ধুর উত্তর শুনে মণি সিংহ তাঁর জমি ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানান।

পাকিস্তানের শুরুর দিকে দমন-পীড়ন চালিয়ে টংক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পর নুরুল আমিন সদম্ভ আস্ফালন করেছিলেন—"কমিউনিস্টদের এবার কবর দিয়ে দিলাম।" প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে কমরেড মণি সিংহ তাঁর

ভাষণে প্রায়শই বলতেন—"কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকের পার্টি, কৃষকের পার্টি, গরিবের পার্টি, ইনসাফের পার্টি। এই পার্টিকে যারা ধ্বংস করতে চাইবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দা আছে, জিন্দা থাকবে।" মণি সিংহের এই কথা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থি সুবিধাবাদ, মধ্যবিত্তসুলভ প্রবণতা ও বিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি বহুবার সতর্ক করেছেনে। পার্টির মধ্যে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার ব্যাপারে তিনি সবসময় জোর দিতেন। পার্টির ভেতরে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা, শ্রেণিসংগ্রাম থেকে সরে থাকা, কর্মীদের পার্টি নেতৃত্বের আশেপাশে ভিড় করার প্রবণতা, নানা অজুহাতে পার্টি শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতা-সময়ানুবর্তিতার লঙ্ঘন, সার্বক্ষণিকদের কর্মকাণ্ডে ঢিলাঢালাভাব ইত্যাদির তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন।

পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের আগে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় পার্টির নাম পরিবর্তন করে কার্যত একটা ঢিলেঢালা ধরনের পার্টি করার কথা উঠলে, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "...নাম বদলালেই মানুষ আসতে থাকবে—এ কথা ঠিক না। এখন যাঁরা নাম বদলানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন, তাঁরা আস্তে আস্তে দাবি করবেন ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম কেটে দিতে হবে, ডিক্টেটরশিপ অব প্রলেতারিয়েত কেটে দিতে হবে, ইন্টারন্যাশনালিজম কেটে দিতে হবে, মার্কসিজম-লেনিনিজম কেটে দিতে হবে—ফরাসি পার্টির মতো। তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির কনটেন্টই নষ্ট করে দেবেন।"

কমরেড মণি সিংহ বড় মাপের মার্কসবাদী পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি মার্কসবাদকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে পারতেন। রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি সব সময়ই দৃঢ়তার সঙ্গে সঠিক অবস্থান নিয়েছেন। সবসময়ই পার্টির স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে তিনি ঐক্য ও সংগ্রামের নীতির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সংগ্রামের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি সমালোচনামুখর ছিলেন। তিনি বাকশালের বিরোধিতা করেছেন। জিয়ার খাল কাটা কর্মসূচি এবং 'হ্যাঁ-না' ভোটে অংশ নেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। বিদ্যমান অবস্থাকে বাস্তবতা বলে অজুহাত দাঁড় করিয়ে প্রকারান্তরে চলতি হাওয়ায় আত্মসমর্পণের ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। কিন্তু কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলা মণি সিংহ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি মেনে (কোনো সিদ্ধান্ত নিজের কাছে ভুল মনে হলেও) সব ক্ষেত্রে পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে চলেছেন।

কমরেড মণি সিংহ ছিলেন অতি সাধারণ, অনাড়ম্বর, আটপৌরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তিনি শৃঙ্খলার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতেন। বিশেষ করে সময়

সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। কমরেডদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই দরদী। তরুণ থেকে প্রবীণ সবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারতেন। সকলের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। দল-মত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। মতপার্থক্যকে কখনই ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে দেননি। তিনি মাঝে মাঝে রসিকতাও করতেন। বিপদে বিচলিত না হওয়াই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, চরিত্রের দৃঢ়তা, শৃঙ্খলাবোধ, মানবিক গুণাবলি তাঁকে অনন্য করেছে।

কমরেড মণি সিংহের আদর্শ অক্ষয়, অম্লান। শ্রমজীবী মানুষ ও দেশবাসীর প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রাম ও মুক্তিসংগ্রামের মাঝে কমরেড মণি সিংহ আজও বেঁচে আছেন। তাঁকে স্মরণ করতে হলে, তাঁর জীবনসঙ্গিনী ও সহযোদ্ধা কমরেড অণিমা সিংহকেও স্মরণ করতে হবে। বর্তমানে যখন আদর্শহীন রাজনীতির আধিপত্য চলছে, তখন কমরেড মণি সিংহ আদর্শের বিস্ময়কর প্রতীক হিসেবে দীপ্যমান হয়ে আছেন।

'জীবন-সংগ্রাম' কমরেড মণি সিংহের বিপ্লবী জীবনের এক অনবদ্য মহাকাব্যিক ভাষ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের কালপর্বটি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের আত্মজীবনী হিসেবে 'জীবন-সংগ্রাম' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-সংগ্রামের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, এটি হয়ে উঠেছে এই ভূখণ্ডের মানুষের সম্মিলিত জীবন-সংগ্রাম। নানামাত্রিক নির্যাতনের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি গণমানুষের আন্দোলনে যে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তার অনেকটাই এই গ্রন্থে উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে গ্রন্থটি এ ভূখণ্ডের রাজনীতির এক ঐতিহাসিক দলিল।

দীর্ঘদিন ধরেই 'জীবন-সংগ্রাম' গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে কমরেড মণি সিংহের 'জীবন-সংগ্রাম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালের ২৮ জুলাই। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী এবার গ্রন্থটির অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করছে।

দুই খণ্ডে ব্যবহৃত ভাষা, বানানের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দুটি খণ্ডেই ব্যবহৃত অনেক বানান ও শব্দ এখন অচল হয়ে পড়েছে। অখণ্ড সংস্করণের ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণে নতুন করে সামান্য সম্পাদনার কাজ করতে হয়েছে। অখণ্ড সংস্করণে ভাষারীতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। কিছু শব্দের পরে সেই শব্দের অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। একেবারেই অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। বানানরীতি পরিবর্তন করা হয়েছে। শব্দগত ও বাক্যগত ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। এসব করার ফলে লেখায় কোনো পরিবর্তন বা বিকৃতি আসেনি। তবে কিছু ভুল-ত্রুটি হয়তো রয়েই গেল।

যাঁরা এই গ্রন্থ প্রথমবারের মতো পাঠ করবেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ থাকবে এই গ্রন্থের রচনাকাল বিবেচনায় নেওয়ার। এই গ্রন্থে এমন কয়েকটি শব্দ আছে, যা এখন নেতিবাচকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে প্রগতিশীল মহলে সেসব শব্দের ব্যবহার ছিল স্বাভাবিক ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। যেমন : উপজাতি। এসব শব্দ পরিবর্তন করা হয়নি। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কিছু শব্দ, কিছু বিষয় এখন চরম নেতিবাচক হয়ে উঠেছে। যেমন : 'জঙ্গি', 'জঙ্গি আন্দোলন', 'সন্ত্রাসবাদী সংগঠন' ইত্যাদি। সংগ্রামী বা লড়াকু বোঝাতে জঙ্গি এবং 'অনুশীলন', 'যুগান্তর' এসব বিপ্লবী সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, তাদের বিপ্লবী তৎপরতাকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করা হতো। তরুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে, তাঁরা যেন এসব বিষয় ঐতিহাসিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করেন।

'জীবন-সংগ্রাম' প্রথম খণ্ডে কিছু ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে কোনো ছবি প্রকাশিত হয়নি। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত ছবিগুলো ছাড়াও 'কমরেড মণি সিংহ স্মারকগ্রন্থে' প্রকাশিত ছবিগুলো থেকে কয়েকটি ছবি অখণ্ড সংস্করণে প্রকাশিত হলো। কমরেড হেনা দাসের মেয়ে ডা. দীপা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কয়েকটি ছবি দিয়েছেন, সেগুলোও প্রকাশিত হলো। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদই অখণ্ড সংস্করণের প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে কমরেড মণি সিংহ মেলা উদ্‌যাপন কমিটি বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। এই সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ ও সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছেন জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর অনিরুদ্ধ দাশ অঞ্জন ও অর্ণব সরকার। ভুল-ত্রুটি, বানান সংশোধনসহ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন আজাদুর রহমান চন্দন, সহযোগিতা করেছেন ওয়াকিল মুজাহিদ। প্রকাশনার কাজে আরো ভূমিকা রেখেছেন আরিফুল ইসলাম নাদিম, উয্মা তাজ্বরিয়ান স্বপ্নীল, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী ও ঝোটন দেব। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

প্রগতিশীল কর্মী, রাজনীতি বিশ্লেষক, গবেষকরা এই গ্রন্থের মাধ্যমে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। ইতিহাসের এই অনন্য দলিল তরুণ প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

জীবন-সংগ্রাম

প্রথম খণ্ড

উৎসর্গ

টংক আন্দোলনের

শহীদদের উদ্দেশে

ভূমিকা

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট এবং কৃষক, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এই শতকের বিশের দশক থেকেই কমিউনিস্ট মতবাদে উদ্বুদ্ধ কর্মীরা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করে আসছেন। ত্রিশের দশকের শেষ ভাগে তা আরো জোরদার হয়ে ওঠে।

আমি বিশের দশকের শেষ ভাগ থেকে এই আন্দোলনে সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করেছি। প্রথমে শ্রমিক, পরে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ১৯৪৮-এর মার্চে আমাদের পার্টি বর্তমান বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর থেকে চেষ্টা করেছি পার্টির কাজ ও সংগঠন গুছিয়ে তুলতে। আজ আমি জীবন সায়াহ্নে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে এ দেশের বিপুল অংশ শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুরের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যৌবনের প্রথমে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলাম, আজ তরুণরা অনেকেই এগিয়ে এসেছেন সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে। আর এখানেই আমার মতো সূচনায় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনের সার্থকতা।

ভবিষ্যৎ আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য অতীতের অভিজ্ঞতার মূল্য কমিউনিস্ট আন্দোলনে অপরিসীম। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হলো দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের হাতে সমাজ ও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার। এই মতবাদ কোনো আপ্তবাক্যের সমষ্টি নয়। বাস্তবতা, ঐতিহ্য, জনগণের চেতনার স্তর, প্রস্তুতি অর্থাৎ এক কথায় প্রতিটি দেশের নিজস্ব বিশিষ্টতা ও অবস্থানকে বিবেচনার মধ্যে নিয়েই তার সার্থক প্রয়োগ সম্ভব। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। এই লক্ষ্য থেকেও ভবিষ্যতের অগ্রগতির জন্য অতীতকে জানা প্রয়োজন। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমার নিজের জীবনের কিছু ঘটনা এবং এই সময়ে সংগঠিত কিছু আন্দোলনের ইতিবৃত্ত এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এটা কোনো ইতিহাস নয়। আর সেজন্য সব সময় হয়তো ঘটনার পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি।

আমাদের জীবনের ঘটনাবলি লেখার জন্য সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা অনেকদিন থেকেই তাগিদ দিয়ে আসছিলেন। সবচেয়ে বেশি তাগিদ দিয়েছিল আমার সহধর্মিণী অণিমা। সে সবসময় আমাকে উৎসাহিত করত। দুঃখের বিষয় লেখা যখন শেষ করলাম, তখন সে জীবিত নেই। বেঁচে থাকলে সে যে খুবই খুশি হতো তাতে আমি নিঃসন্দেহ।

এই বই লেখার ক্ষেত্রে অনেকেই সাহায্য করেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করছি প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক অনিল মুখার্জীর কথা। তিনি পাণ্ডুলিপির

অংশবিশেষ পড়ে গিয়েছিলেন। অকাল মৃত্যুর জন্য সবটুকু পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এছাড়া অধ্যাপক সৈয়দ হেশামুদ্দিন, অধ্যাপক আবদুল হালিম, আমার সহকর্মী আবদুস সালাম, মনজুরুল আহসান খান, মতিউর রহমান—এঁরা পাণ্ডুলিপি পড়েছেন ও নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমার সহকর্মী মোহাম্মদ ফরহাদ পাণ্ডুলিপি পড়ে নানা পরামর্শ দিয়ে বইটি উন্নত করতে সহায়তা করেছেন। আর পাণ্ডুলিপিটি পড়ে কিছু বর্জন ও সংযোজনে পরামর্শ দিয়েছেন সহকর্মী অজয় রায়। এঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই বই লিখতে গিয়ে আমি নানা বইয়ের সাহায্য নিয়েছি অকুণ্ঠভাবে। এসব বইয়ের লেখকের প্রত্যেকের কাছেই আমি ঋণী।

আমি বৃদ্ধ, আমার হাতের লেখা ছাপাখানার উপযোগী করে তোলার জন্য পুরো বইটি নকল করেছেন দুজন। একজন সিদ্দিক ও আরেকজন মুশফিক। এঁদের দুজনকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর মফিদুল হক ছাপা ও প্রুফ দেখার মতো বিরক্তিকর কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজের দায়িত্ব নিয়ে এবং বইটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। চল্লিশের দশকের বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী শ্রী সুনীল জানা এতদিন পরে লন্ডন থেকে আমার অনুরোধে সে সময়কার কিছু ছবি পাঠিয়েছেন। এই সুযোগে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সারা দুনিয়ায় আজ দিনবদলের সংগ্রাম চলছে। পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশের মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল মোচন করে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে নিজেদের দেশকে নতুন করে গড়ে তুলছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও সাফল্য প্রতিদিন দুনিয়ার মানুষের সামনে নতুন সম্ভাবনার জগৎ উন্মোচিত করছে। এই গতিধারাকে রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সব অপচেষ্টা এবং নতুন বিশ্বযুদ্ধে দুনিয়াকে জড়িয়ে ফেলার সব পাঁয়তারাকে প্রতিহত করে এগিয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার মানুষের শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম। আমাদের দেশের মানুষ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি আজও অর্জিত হয়নি। আমি এটাও জানি, ইতিহাসের গতি অপ্রতিরোধ্য। আমাদের দেশের জনগণের ওপর, তাঁদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ওপর আমি আস্থাশীল। কাজেই আমি নিশ্চিত যে, এ দেশের মানুষই ভবিষ্যতে এই শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সমাজের রূপান্তর ঘটাবেই। আর এই সংগ্রামের সৈনিকদের আমার এই বই যদি এতটুকুও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তাহলেই আমি আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মণি সিংহ

পূর্বকথা

১২৮০ সাল। একদল সাধু এক বিরাট মসৃণ পাথরের ওপর এসে বসলেন। তাঁরা তীর্থযাত্রী। ওই পাথর ছুঁয়ে এক খরস্রোতা নদী পাহাড়ের বুক চিরে তরতর বেগে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত। কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ তার পানি। উত্তরে সবুজে সবুজে সমাকীর্ণ গাছপালার পাহাড়। পূর্বদিকে মাঠ, দক্ষিণে কিছু ঝোপঝাড় আর পায়ে হাঁটা পথ। পশ্চিমে বেগবতী নদী। কত জানা-অজানা পাখির কাকলী। কত রঙের মেঘ ছুটেছে মাথার উপর দিয়ে। মেঘ-পাহাড়ে ধাক্কা লেগে বৃষ্টি হয়। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জিতে। চেরাপুঞ্জি হতে আকাশপথে এই স্থানের ব্যবধান ৬০ মাইলের বেশি নয়। সূর্যরশ্মি এখানে অকৃপণ। এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। কিন্তু প্রকৃতির এই লীলাভূমিতে জনবসতি বিরল।

কোন সেই সুদূর অতীতের কথা। কিংবদন্তী আছে, একদল সাধু তরুতলে বিশ্রাম করছিলেন; তখন বিশ্রামে ছেদ পড়ল। দরিদ্র ধীবরদল এসে পদধূলি নিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। সাধুদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ সাধু শান্তকণ্ঠে জানতে চাইলেন, তারা কী চায়? ধীবরদের মধ্যে একজন জানাল, তারা খুব নির্যাতন ও অত্যাচারের মধ্যে আছে। পাহাড় থেকে দলবদ্ধভাবে গারোরা এসে তাদের ওপর অত্যাচার করে। লুটপাট করে, খুন-জখম করে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে তারা হত্যা করে। এর প্রতিকার তারা সাধুদের কাছে চায়। সাধুরা সর্বশক্তিমান। অনেক পুণ্যের ফলে আজ সাধু দর্শন হয়েছে, তারা এই নির্যাতন থেকে মুক্তি চায়। প্রবীণ সাধু বললেন, "আমরা সাধু-সন্ন্যাসী, সাংসারিক কাজের বাইরে থাকি। আমরা এর কী প্রতিকার করতে পারি?"

ধীবররা কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। তখন প্রবীণ সাধুর দয়ার উদ্রেক হলো। প্রবীণ সাধুদের সঙ্গে ছিলেন এক যুবক ব্রাহ্মণ, নাম সোমনাথ পাঠক। তাঁকে প্রবীণ সাধু বললেন, "সোমনাথ, তুমি এখনো সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করনি, তুমি এখানে থেকে ওদের সাহায্য কর।" সোমনাথ পাঠক প্রবীণ সাধুর কথা শিরোধার্য করে সেখানে থেকে গেলেন। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় গারোদের নকমাকে (গারোদের প্রধান) ১২৮০ সালে পরাস্ত করে গারো পাহাড়ের দুই-তৃতীয়াংশ এবং সমতল ভূমির এক বিরাট অংশ নিয়ে

'সু-সং' অর্থাৎ ভালো সঙ্গ নাম দিয়ে তিনি এক সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করলেন। নদীটির নাম রাখা হলো সোমেশ্বরী। আজও নদীটি সোমেশ্বরী নামে পরিচিত। পাহাড়ে ছিল অমূল্য সম্পদ। এখানে শুধু গারো উপজাতিই বাস করত। তাদের কথ্য ভাষা ছিল, কিন্তু লিখিত ভাষা ছিল না, এমন কি আজও নেই। পুরুষরা নেংটি পরে থাকত। মেয়েরা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত এক টুকরো শক্ত কাপড় দিয়ে লজ্জা নিবারণ করত। গায়ে কোনো আচ্ছাদন থাকত না। তারা জুম চাষ করত, কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি কেটে বিক্রয় করত। পাথর ছিল তাঁদের দেবতা। গারো পাহাড়ে বন্য হাতি ছিল, আজও আছে। ওই সময়ে হাতির ছিল অভাবনীয় কদর। হাতি ছাড়া সামন্ত প্রথা ছিল অচল। তাছাড়া সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের হাতিই ছিল ঐশ্বর্যের মাপকাঠি। কাজেই সুসংরাজ গারো পাহাড় থেকে বন্য হাতি ধরতেন এবং ওগুলোকে পোষ মানিয়ে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করতেন। তাছাড়া মূল্যবান কাঠ, বাঁশ সেখানে প্রচুর জন্মাত। এক প্রকার মূল্যবান কাঠ গারো পাহাড়ে পাওয়া যায়, এর স্থানীয় নাম 'আগর'। আগর সুগন্ধি কাঠ, এর ঐন্দ্রজালিক সুগন্ধ একমাত্র কস্তুরির সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর এক টুকরো কাঠ জ্বালালে একটি বাড়ি সুগন্ধে আমোদিত হয়ে যায়। এই কাঠ থেকে চোলাই করে তেল উৎপাদন করা হতো। এর কয়েক ফোঁটা তেল এক বোতল নারিকেল তেলকে সুগন্ধি করে তোলে। এই গাছগুলো বেশ বড় হয়। শোনা যায়, আগরের এক সের কাঠের দাম বর্তমানে এক হাজার টাকা। তাছাড়া সুসং এলাকার সমতল ভূমি ছিল খুবই উর্বর, প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো। সোমেশ্বরী নদীতে ছিল বিভিন্ন রকমের প্রচুর মাছ। এখানে মাছের মধ্যে একটি সেরা মাছ আছে, তার নাম মহাশোল। মহাশোল কেন নাম হলো তা জানা যায় না। এই মাছের আকৃতি রুই এবং মৃগেল মাছের মাঝামাঝি, এর আঁশ টাকার মতো গোল ও বড়, দেখতে যেমন সুদৃশ্য, খেতে তেমনই সুস্বাদু। এই মাছ দুষ্প্রাপ্যও বটে। বাংলাদেশে একমাত্র সোমেশ্বরী নদী ছাড়া এই মাছ পাওয়া যায় না। সোমেশ্বরী নদীর বালু দালান তৈরির জন্য খুবই উৎকৃষ্ট।

সোমেশ্বর পাঠকের উত্তরাধিকারীরা অনেক উপাধি বদলিয়ে শেষে সিংহ উপাধি গ্রহণ করেন। এঁরা ব্রাহ্মণ এবং বরেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ। প্রায় তিনশ বছর স্বাধীনভাবে থাকার পর উত্তরে প্রাগ জ্যোতিষ্পুর (আসাম) ও দক্ষিণে ঈশা খাঁর সঙ্গে বিবাদ বেধে যায়। এই দুই দিক থেকে চাপ সৃষ্টির ফলে এই বংশের রাজা রঘু অন্য কোনো উপায় না দেখে মানসিংহের মারফতে বাদশা আকবরের শরণাপন্ন হন। বাদশাকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য সঙ্গে নেন সেই ঐন্দ্রজালিক সুগন্ধি কাঠ 'আগর'। ওই সুগন্ধি কাঠ হেরেমে যাওয়ার পর অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। আগরের গন্ধে সবাই মাতোয়ারা হয়ে যান। বাদশাহ আকবর ও রাজা রঘুর মধ্যে এক চুক্তি হয়। রাজা প্রতিবছর আগর কাঠ পাঠাবেন, আর

বাদশাহ আকবর সব আক্রমণ থেকে রাজা রঘুকে রক্ষা করবেন। রাজা রঘুকে পাঁচ হাজারি মনসবদারির (জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধি) অধিকার দেওয়া হয়। এই সব চুক্তির ফলে রাজা রঘুকে মানসিংহের পক্ষে, চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করতে হয়। যুদ্ধে চাঁদ রায় ও কেদার রায় পরাজিত হলে ওখান থেকে রাজা রঘু অষ্টধাতুর দুর্গা প্রতিমা নিয়ে আসেন। ওই দুর্গা প্রতিমা সুসং-এ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারপর থেকে সুসং-এর সঙ্গে দুর্গাপুর যোগ করে দেওয়া হয়, নাম হয় সুসং-দুর্গাপুর। সুসং ছিল একটি পরগনা, আর দুর্গাপুর হচ্ছে জমিদারদের বাসস্থান এলাকা। আজ সুসং হচ্ছে এখানকার পোস্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস, থানা হচ্ছে দুর্গাপুর। আকবরের আমলে সুসংকে 'মুলক-এ-সুসং' বলা হতো। তখন থেকে স্বাধীন সামন্তরাজ্য হিসেবে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো। এখানে একটি কিংবদন্তী আছে। একটি অশোক গাছ লাগানো হয়েছিল। কিংবদন্তী হলো, যতদিন অশোক গাছটা বেঁচে থাকবে, ততদিন তাঁদের স্বাধীনতাও থাকবে। চুক্তি করার পর নাকি ওই অশোক গাছ মরে যায়, আর তাঁদের স্বাধীনতাও সেই সঙ্গে শেষ হয়। পরে অবশ্য আরেকটি গাছ ওই স্থানে লাগানো হয়েছিল।

সুসং জমিদারদের আয়ের মূল ক্ষেত্র ছিল গারো পাহাড়। সমতল ভূমির আয়ের দিকে নজর অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তালুকদারি, নিষ্কর প্রভৃতির জন্য সমতল ভূমির এক বড় অংশ তাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ব্রিটিশ আমলে গারো পাহাড় হস্তচ্যুত হওয়ায় সুসং রাজ্য অন্য দশটি জমিদারির মতো একটি জমিদারিতে পরিণত হলো। ব্রিটিশ সরকার যখন জানতে পারল যে, গারো পাহাড়ে প্রচুর কয়লা আছে এবং অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যেতে পারে, তখন গারো পাহাড়কে সরকারি খাসে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের তরফ থেকে জমিদারকে নোটিশ দেওয়া হলো, গারো পাহাড়ের ওপর জমিদারের আইনত কোনো অধিকার নেই। ফলে মামলা বেধে গেল। মোগল আমলের সনদ ছিল, কাজেই মামলায় হাইকোর্টে জমিদাররা জয়লাভ করেন। ব্রিটিশ সরকার প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করে। ভারত সরকার যখন জানতে পারল যে, জমিদাররাই জিতে যাবে, তখন 'গারো হিলস্ অ্যাক্ট' নামে ১৮৮৫ সালে একটি আইন করে গারো পাহাড়ের ওপর জমিদারদের স্বত্ব রদ করে দেওয়া হলো। আইন করা হলো যে, এ জন্য মামলা করা যাবে না। ব্রিটিশ সরকার ক্ষতিপূরণস্বরূপ উত্তরাধিকার সূত্রে 'মহারাজা' উপাধি এবং এক লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা জানাল। জমিদাররা বললেন, "আমাদের মহারাজা উপাধি তো আছেই, আর ক্ষতিপূরণও যৎসামান্য—আমরা কোনোটাই চাই না।" পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে তাঁদের এটা গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এর ফলে সুসং রাজাদের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়। প্রকাশ্যে

তারা ছিলেন ব্রিটিশভক্ত, কিন্তু মনে ছিল তাঁদের ব্রিটিশবিরোধী আগুন। এই ক্ষত এই বংশ কোনোদিন ভুলতে পারেনি।

সুসং রাজ্যের গোড়াপত্তনের পর খুব সম্ভব আসাম থেকে আমদানি করা হয়েছিল হাজং উপজাতিদের। তারা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কামাখ্যা ছিল তাদের জাগ্রত দেবতা। তাদের ভাষা ঠিক বাংলা বা আসামি (অহমিয়া) নয়। বলা যায় বাংলা ভাষার অপভ্রংশ। গারো পাহাড়ের পাদদেশে এঁদের বসানো হয়েছিল। তারা ছাড়া ডালু, কোচ, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি উপজাতি গারো পাহাড়ের পাদদেশে বাস করত। হাজংরা ছিল সৎ, সাহসী ও দুর্ধর্ষ। এঁদের গারো পাহাড়ের পাদদেশে বসানোর উদ্দেশ্য ছিল উভয় দিক হতে হামলা প্রতিরোধ করা।

সুসং একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ হলেও, বহুদিন পর্যন্ত এখানে তেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। অথচ এ মহারাজ বংশের অধিকাংশ ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। ওই পরিবারের শিক্ষা সম্পর্কে একটি ঐতিহ্যও ছিল। এই বংশের লেখকরা 'পদ্মপুরাণ' লিখে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। এই অবদানের কথা ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করে গেছেন। নিজেরা কলকাতায় গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেও, নিজের এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের কোনো ব্যবস্থা তাঁরা করেননি। সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা থেকেই এটা করা হয়েছিল। "শিক্ষিত হলে জনসাধারণের চোখ খুলে যাবে, কাজেই শিক্ষাকে জনসাধারণ থেকে দূরে রাখ"—এটাই ছিল তাঁদের নীতি।

এখানে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় মাত্র ১৯২১ সালে। সুসং অঞ্চল খুব জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমান কৃষকরা ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে এসে চাষাবাদে লিপ্ত হন। মুসলমান কৃষকরা উপজাতীয় কৃষকদের চেয়ে ছিলেন চাষাবাদে নিপুণ।

গারো পাহাড় সুসং জমিদারদের হাতছাড়া হলেও, কিছুদিন পর্যন্ত হাতি খেদার (ধরা) অধিকার ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পরে সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হাজং, গারো, ডালু, কোচ, রাজবংশী যারা গারো পাহাড়ের পাদদেশে বাস করত, তাঁদের মধ্যে হাজং উপজাতীয়রাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের মধ্যে ওই সময় সামান্য কিছু ব্যক্তি লেখাপড়া জানত। খ্রিস্টান মিশনারিরা গারোদের অধিকাংশকেই ধর্মান্তরিত করে। সুসং-দুর্গাপুরের অপর পারে একটি অস্ট্রেলিয়ান মিশন ছিল, এখনো আছে। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ানরা এখন নেই। উপজাতীয়দের কোনো খাজনা ছিল না। কারণ তাঁরা হাতি খেদার

(ধরা) সময় সাহায্য করত। হাতি ধরার সময় সাড়ে চারশ থেকে পাঁচশ লোকের প্রয়োজন হতো। হাতি খেদা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে জমিদাররা খাজনা আদায়ের দিকে নজর দিলেন। তাঁরা দেখলেন—এক বিরাট এলাকা এর পূর্ব পর্যন্ত খাজনা ছাড়া চলছিল, কিন্তু এখন তাঁদের আর খাজনা থেকে রেয়াদ দেওয়া যায় না। ১৮৯০ সালে জমিদাররা হাজং উপজাতীয় নেতাদের ডেকে আনলেন।

বিভিন্ন এলাকার চারজন বিশিষ্ট হাজং নেতা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে গোরাচাঁদ হাজং ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কিছুটা লেখাপড়াও জানতেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। জমিদাররা তাঁদের বোঝালেন যে, আমাদের এখন পাহাড় নেই, হাতি খেদা নেই, কাজেই এ অবস্থায় তোমাদের জমির খাজনা দিতে হবে। বিনা খাজনায় আর এত জমি আমাদের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। হাজংরা ছিলেন জমিদারদের ভক্ত। জমিদাররা আবার ব্রাহ্মণ, কাজেই হাজংরা তাঁদের ভগবানের অংশ হিসেবেই মনে করতেন। এ সকল উপজাতি জমিদারদের খুব বাধ্য ছিল। গোরাচাঁদ হাজং বললেন, "ধর্মাবতার! আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা জঙ্গল কেটে সাফ করে জমি চাষাবাদের উপযুক্ত করেছেন, কত লোক বাঘের কবলে ও সাপের কামড়ে প্রাণ দিয়েছেন, জংলি দুরন্ত মহিষের সঙ্গে সংগ্রাম করে জমি আবাদযোগ্য করেছেন। হাতি খেদায় আমরা লোক দিয়েছি, সেখানেও লোক মারা পড়েছে। আমরা গরিব, আমরা খাজনা দিতে অপারগ। হুজুর, সুবিবেচনা করে খাজনা মাফ করে দেন।" জমিদাররা অনেক বোঝালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তাঁদের সাফ জবাব, তাঁরা খাজনা দিতে অপারগ। তাঁরা চাষাবাদ করে কোনো রকমে জীবনধারণ করছে, এ অবস্থায় তাঁদের খাজনা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। গোরাচাঁদ বললেন, "আমরা ডাকে-হাঁকে আপনাদের কাছে আছি। আমরা অনুগত আছি।"

ভগবানের অংশ আজ হাজংদের কাছে খাজনা চাচ্ছে, অথচ তাঁরা তা দিতে অস্বীকার করছে। এ এক বিচিত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতি। যখন কোনো রকমে খাজনা পাওয়ার স্বীকৃতি পাওয়া গেল না, তখন জমিদাররা চিন্তা করলেন ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক গৌরবময় কৃষক আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস আছে। তার মধ্যে হাজংদের বিদ্রোহ অন্যতম। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো বুদ্ধিজীবী তাঁদের সাহায্যে ছিলেন না। উপজাতিরাই নেতা, উপজাতিরাই আন্দোলনকারী। গারো পাহাড়ের পাদদেশে ৭০ মাইল লম্বা ৫৬ মাইল প্রশস্ত এই এলাকায় দেশ ভাগাভাগির আগে পর্যন্ত কোনো বাঙালি হিন্দু বা মুসলমান বাস করতেন না। বসবাসকারীরা ছিলেন সব উপজাতি।

জমিদাররা পদ্মাপাড় থেকে লাঠিয়াল সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। তাছাড়া তাঁদের বিহারি-বরকন্দাজ বাহিনী ছিল, ছিল হাতি। এক বিরাট লাঠিয়াল বাহিনীকে হাজং এলাকায় পাঠানো হলো। জমিদারির এই এলাকা ছিল আনুমানিক মাইল ত্রিশ। হাজং এলাকায় খণ্ড সংঘর্ষ হলো। হাজংরা জমিদারদের ভগবানের অংশ মনে করতেন। আজ ভগবানের বিরুদ্ধেই তাঁরা লড়াই করতে লাগলেন। লাঠিয়ালরা কয়েকটি সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে উপজাতিদের কাছে মার খেয়ে দুর্গাপুরে পালিয়ে এলো। এদিকে গুজব রটেছিল যে, হাজংরা রাজবাড়ি লুট করবে। এতে জমিদাররা ভীত হয়ে পড়লেন।

হাজংদের পরিবারে একজনের নাম ছিল জং বাহাদুর। একটি আশ্চর্য ব্যাপার—এই পরিবারের কেউ মদ স্পর্শ করতেন না, এমন কি তামাক পর্যন্ত সেবন করতেন না। তাঁদের নৈতিক চরিত্র ছিল উন্নত। কিন্তু জং বাহাদুর ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক। মদ প্রভৃতি তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। অন্য জমিদাররা তাঁকে ঘৃণা করতেন। তিনি বেশি লেখাপড়া শেখেননি। জমিদারগোষ্ঠী তাঁকে কুলাঙ্গার মনে করত। কিন্তু সেই সময় জংকে ডেকে তাঁরা তোয়াজ করলেন। মদ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে কয়েকটি বন্দুক ও হাতি দিয়ে তাঁকে হাজং বিদ্রোহ দমন করার কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করলেন। অন্যেরা সব সপরিবারে কলকাতায় চলে গেলেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকারকে খবর জানিয়ে রাখা হলো। তাঁদের ভাবখানা হলো, জং যদি হাজং বিদ্রোহ দমন করতে পারে ভালো, আর যদি হাজংদের হাতে নিহত হয়, তবে পরিবারের এই কুলাঙ্গারটা শেষ হয়ে যাবে। যা হোক, দুবছর এই হাজং বিদ্রোহ চলেছিল।

সুসং-দুর্গাপুর থেকে চার মাইল দূরে হাজং এলাকায় এক সংঘর্ষ হলো। এই সংঘর্ষে দুইজন বীর হাজং যোদ্ধা নিহত হলেন। বন্দুকের গুলির সামনে তাঁরা টিকতে পারলেন না। এইখানে বিদ্রোহ পরাজিত হলো। ব্রিটিশ সরকার গোরাচাঁদসহ চারজন হাজং নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে গেল। কয়েক বছর পর তিনজন নেতা বের হয়ে এলেন, কিন্তু গোরাচাঁদ হাজং-এর কী হলো তা আজও কেউ জানে না। এই বিদ্রোহ তখনকার মতো অবদমিত হলো সত্য, কিন্তু তাঁদের বিদ্রোহ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়েছিল মাত্র। আবার যখন ১৯৩৮ সালে টংক আন্দোলন শুরু হলো, তখন ওইসব নেতার নাতিরা ওই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এঁদের মধ্যে বিদ্রোহের যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল, তা অনুকূল বাতাস পেয়ে আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। ওই সময়ে দুইজন নিরীহ কৃষককে স্বাধিকার রক্ষার প্রয়াসের 'অপরাধে' জমিদার-পক্ষ প্রকাশ্যে নির্মমভাবে খুন করল, সেজন্য তাঁদের কোনো জবাবদিহি করতে হলো না, বরং হাজং নেতাদেরই চরম নিগৃহীত করে ফাটকে (জেলখানা) পাঠানো হলো। এটাই যুগে যুগে শাসক-শোষকদের ধর্ম ও চরিত্র।

সাম্যবাদী আন্দোলনের ঊষাকাল

আমার যখন শৈশব তখনই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে শুরু করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের মনে সেদিন সেই আন্দোলনের গভীর ছাপ পড়েছিল। দলে দলে তাঁরা সেদিন সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, নির্যাতিত হয়েছিলেন অনেকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হতে দেশকে স্বাধীন করতে হবে—এটাই ছিল সেদিন এসব যুবকের চেতনা। জন্মের পর থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিও অন্যদের মতো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে শরিক হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও সংগ্রাম করতেন। তাঁদের কথা ছিল—শ্রমিক-কৃষক তথা মেহনতি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। আর অর্থনৈতিক মুক্তির একটাই পথ—সে পথ হলো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

যৌবনের প্রারম্ভেই আমি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করি। তারপর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত। এই দীর্ঘ সময়ের ভেতরে এই দেশে সংঘটিত হয়েছে অনেক পরিবর্তন। এই দেশের জনগণ বারবার সংগ্রাম করেছে। অবসান হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তান। দেশবাসীর রক্তাক্ত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এ দেশের জনগণের জীবনে বিশেষত শ্রমিক-ক্ষেতমজুর মেহনতি কৃষকের জীবনে আজও শোষণ-বঞ্চনার অবসান তো হয়ইনি, বরং তা আরো ঘনীভূত হয়েছে। এটাই ইতিহাসের নিয়ম।

সমাজবিপ্লব অর্থাৎ সমাজ হতে শোষক শ্রেণিসমূহের উচ্ছেদ ছাড়া শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা জনগণের জীবনের কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। কমিউনিস্টরা এতকাল এই ঐতিহাসিক সত্যটিই জনগণের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। সমাজবিপ্লবের পথ, সমাজতন্ত্রের পথই একমাত্র মুক্তির পথ। আমার সৌভাগ্য, এই সত্যটি আমি জীবনের প্রারম্ভেই উপলব্ধি করতে পারি এবং সেজন্য নিজে সাধ্যমতো কাজ করতে চেষ্টা করেছি। আজ জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে তাই অতীতের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন দেশবাসীর প্রকৃত মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে যে যুক্ত রাখতে পেরেছি তা ভেবে মনে করি জীবন আমার বিফলে যায়নি। জনগণের, দেশবাসীর প্রকৃত মুক্তির জন্য সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার চেয়ে গৌরবের আর কী হতে পারে?

আমি তখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছি। সেই সময়েই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটে। তা হচ্ছে ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। রাশিয়াতে আগে যে পঞ্জিকা ব্যবহার করা হতো তা ছিল অসংশোধিত। এই পঞ্জিকা ইউরোপীয় পঞ্জিকা হতে তের দিন পিছিয়ে ছিল। এটা সংশোধন করায় এখন বিপ্লব দিবস হয়েছে ৭ নভেম্বর। এই বিপ্লব ছিল দশ দিনের, তাই ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বরকে বিপ্লবের সময়কাল ধরা হয়। এই বিপ্লব যে শুধু রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের মুক্তি আনল তা-ই নয়, এই মহান বিপ্লব দুনিয়ার সব নিপীড়িত বঞ্চিত ও পরাধীন জাতির মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও এই বিপ্লব রেখাপাত করে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন কোন পর্যায়ে অবস্থান করছিল? একদিকে কংগ্রেসের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের (স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সহিংস আন্দোলন, অপরদিকে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। মুসলিম লীগের পাশাপাশি হিন্দু মহাসভা। এটাও ছিল একটি সাম্প্রদায়িক দল। তবে এর প্রভাব ছিল নগণ্য।

এই সময়ে তাশখন্দে প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ভারত থেকে কিছু বিপ্লবী ও কিছু মোহাজের* অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় যান। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নিয়ে এম এন রায়ের উদ্যোগে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।

সে সময়ে সাতজনকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। এই সাতজন হলেন :

১. এম এন রায়
২. এভেলিন ট্রেন্ট রায় (এম এন রায়ের আমেরিকান স্ত্রী)
৩. অবনী মুখার্জী
৪. রোজা ফিটিংগোফ (অবনী মুখার্জীর রাশিয়ান স্ত্রী)
৫. মোহাম্মদ আলী
৬. মোহাম্মদ শফীক সিদ্দিকী
৭. এম প্রতিবাদী বায়ঙ্কর আচার্য

মোহাম্মদ শফীককে সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়।

---

* ১৯১৪ সালের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় একদল স্বাধীনতা সংগ্রামী 'পরাধীন দেশে থাকব না'—এই বলে আফগানিস্তানে চলে যান। তাঁদেরকেই মোহাজের বলা হতো। তাঁরা ছিলেন মুসলমান।

প্রবাসে যখন কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, তখন ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির যৌথ উদ্যোগে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন উপমহাদেশজুড়ে সৃষ্টি করেছে বিরাট গণ-আন্দোলন। এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনেও নতুন সংগ্রামী জোয়ার দেখা দেয়। আর এ সময়েই উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকে কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁদের উদ্যোগে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কমিউনিস্টদের কতকগুলো চক্র (Circle) গড়ে ওঠে। ক্রমে চক্রগুলোকে একত্রিত করে পার্টি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগেরই ফল হচ্ছে 'কানপুর কনফারেন্স'।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে কানপুরে কমিউনিস্ট ভাবাপন্নদের কনফারেন্স হয়। ওই কনফারেন্সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সেখানে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। গঠনতন্ত্রও রচিত হয়। কার্যনির্বাহী কমিটিতে এস বি ঘাটে ও জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টাকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। গ্রেট ব্রিটেনের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা শাপুরজি সাকলাতওয়ালা তখন ভারতবর্ষে আসেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন। সাকলাতওয়ালা ওই কনফারেন্সে বাণী পাঠিয়েছিলেন। কনফারেন্সে মাদ্রাজের সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। সত্য ভক্ত নামে এক ব্যক্তি এই কনফারেন্স সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর মত ছিল ভিন্ন। কেউ তাঁর মত গ্রহণ করেননি। ফলে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তিনি আর কনফারেন্সে থাকেননি। ২৬ ডিসেম্বর ওই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সিপিআই ১৯২৫ সালকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের তারিখ বলে গ্রহণ করে নিয়েছে।

এর আগের একটি ঘটনা। গুজরাটের আহমদাবাদ শহরে কংগ্রেসের ছত্রিশতম অধিবেশন হচ্ছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন আহমদাবাদের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে কমিউনিস্টরা একটি ইশতেহার বিলি করে। ওই ইশতেহার রচনা করেছিলেন এম এন রায়। এটাই ছিল কমিউনিস্টদের তরফ থেকে বিলি করা প্রথম ইশতেহার।

ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ দেখে তাঁদেরকে অঙ্কুরেই দমন করার চেষ্টা করে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার তিনটি ষড়যন্ত্র মামলা করেছিল। মামলা তিনটি ছিল—'পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯২২-২৩), 'কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯২৪) ও 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯২৯)। 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়' তিনজন ইংরেজ আসামি ছিলেন। তাঁরা হলেন ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন ব্রাডলি ও হাচিনসন। ফিলিপ স্প্রাট কলকাতায় কাজ করতেন,

ব্রেন ব্রাডলি বোম্বেতে (নতুন নাম মুম্বাই); আর হাচিনসন ছিলেন সাংবাদিক। ভারতে আসার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ষড়যন্ত্র মামলাগুলোর মধ্যে 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' ছিল বিখ্যাত। সেই সময়ে এই মামলা সারা ভারতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১৯২৯ সালের ২০ মার্চ মীরাট ম্যাজিস্ট্রেটের নামে ওয়ারেন্টের বলে এই মামলা করার উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্তদের কঠোর সাজা দেওয়া, কারণ এখানে জুরির বিচার ছিল না, ছিল অ্যাসেসার।

সারা ভারত থেকে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন একত্রিশজন। বাংলায় যাঁরা এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁরা হলেন :

১. মুজফ্‌ফর আহমদ
২. ধরণী গোস্বামী
৩. গোপেন চক্রবর্তী
৪. রাধারমণ মিত্র
৫. শামসুল হুদা
৬. গোপাল বসাক
৭. কিশোরীলাল ঘোষ (ইনি কমিউনিস্ট ছিলেন না)
৮. ফিলিপ স্প্রাট
৯. শিবনাথ ব্যানার্জী (ইনি কমিউনিস্ট ছিলেন না)

আমার বাসস্থান ও টেক্সটাইল ইউনিয়ন অফিস তল্লাশি করা হয়। এই তল্লাশি ভোরবেলা থেকে আরম্ভ করে রাত বারোটা পর্যন্ত চলে। শুধু খাওয়ার জন্য ঘণ্টা দুয়েক বাদ থাকে। সাংবাদিকরা রাত সাড়ে এগারোটার সময় আইবি অফিসারদের প্রশ্ন করেন—আমি গ্রেপ্তার হয়েছি কিনা। তাঁরা জবাব দেন, "আমরা জানি না।" আমি অবশ্য গ্রেপ্তার হইনি, কিন্তু দৈনিক পত্রিকাগুলোতে আমি গ্রেপ্তার হয়েছি বলে খবর বের হয়।

১৯২৮ সালে পূর্ববঙ্গে কিছু কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মধ্যে কুমিল্লার হাসনাবাদে মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাজনদের অত্যাচারে কৃষকরা অতিষ্ঠ ছিল। মহাজনদের লক্ষ্য ছিল কৃষকদের জমি হস্তগত করা। কৃষকরা জমি বন্ধক দিয়ে মহাজনদের নিকট হতে ঋণ আনত, কিন্তু ওই ঋণ পরিশোধ করতে পারত না। মহাজন কোর্টে নালিশ করে ওই বন্ধকি জমি তার পক্ষে ডিক্রি করিয়ে নিত। এভাবে ব্যাপক সংখ্যক কৃষকের জমি নিলাম হয়ে যায়। কৃষকরা বিপর্যয়ের অবস্থায় পড়েন। এই অবস্থায় মোখলেছুর রহমান এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই

ছিলেন প্রধান নেতা। তাঁর সহযোগী ছিলেন আরো অনেকে। মোখলেছুর রহমান কমিউনিস্ট ছিলেন না। কুমিল্লার বড় মিয়া (ইয়াকুব মিয়া) তাঁর সহযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট। মোখলেছুর রহমান কৃষকদের বোঝালেন যে—সরকারের পেয়াদা, পেশকার প্রমুখ এসে জমির ওপর ডিক্রি জারি করবে। কিন্তু জমিগুলোতে যাবে কীভাবে? কোনো না কোনো কৃষকের জমির ওপর দিয়ে তাদের যেতে হবে। কারণ যাদের জমি ডিক্রি হয়েছে তাদের জমিতে যাওয়ার সড়ক নেই। কৃষকরা যদি পেশকারকে বলে যে, "আমার জমির ওপর দিয়ে যেতে পারবেন না, আমার জমির ওপর দিয়ে অন্যের জমিতে যেতে বাধা দিচ্ছি, আমার জমির ওপর দিয়ে যেতে দেব না, তবে কীভাবে তাঁরা অন্যের জমিতে যাবে? নিজের জমির ওপর দিয়ে যেতে না দেওয়া তাঁর আইনসঙ্গত অধিকার।" এভাবে সব কৃষক ঐক্যবদ্ধ হলো। পেশকার, পেয়াদারা যখন ডিক্রি জারি করতে এলেন, তখন তারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন। কৃষকরা বললেন, "আমাদের জমির ওপর দিয়ে যেতে পারবেন না।" কোর্টের পেশকার ও পেয়াদারা মুশকিলে পড়লেন। কৃষকরা সংঘবদ্ধভাবে এই আইনসঙ্গত বাধা সৃষ্টি করলেন। পেশকার বিনা অনুমতিতে একজনের জমির উপর দিয়ে গেলে তিনি ট্রেসপাস চার্জে পড়ে যাবেন। ফলে নিলামি জমিতে ডিক্রি জারি করা সম্ভব হলো না। মহাজনেরা বেকায়দায় পড়ে গেল। জমি দখলের চিন্তা তাদের মাথা থেকে ছুটে গেল। অনেক দাবি ছেড়ে তারা সমঝোতা করল। এই আন্দোলন হয় ১৯২৮ সালে।

অপর আন্দোলন হয় কিশোরগঞ্জে। কিশোরগঞ্জে তখন 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ' গঠিত হয়েছিল। শ্রেণিসংগ্রামের ভিত্তিতে কয়েকটি ইশতেহার ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছিল। কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া থানায় এক বিশিষ্ট মহাজন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে ব্যাপক সংখ্যক কৃষক ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করতে পারছিল না। ঘটনার দিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শত শত কৃষক 'ঋণের খত' ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয় এবং খত ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দাবি করতে থাকে। এই কৃষকরা সবাই ছিলেন মুসলমান এবং খুবই জঙ্গি। কৃষ্ণচন্দ্র দোতলা থেকে গুলি চালাতে থাকেন। কৃষকরা করগেটেড টিন তাঁদের সামনে ধরে এগোতে থাকে, কিছু লোক আহত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের গুলি যখন ফুরিয়ে যায়, তখন কৃষকরা তাঁর বাড়িতে ঢুকে কৃষ্ণচন্দ্রকে মেরে ফেলে। এই নিয়ে বিরাট মামলা হয়। বহু লোকের দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হয়। হিন্দু মহাসভা এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িকতার নাম দিয়ে প্রচার করতে থাকে। কিন্তু এই আন্দোলন মোটেই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল শ্রেণিসংগ্রামেরই বহিঃপ্রকাশ। এ সময়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পূর্ববাংলায় বেশ জোরদার ছিল। এ সময়ে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' নামে দুটি সন্ত্রাসবাদী গোপন সংগঠন ছিল।

পরে অবশ্য 'বিডি' প্রভৃতি আরো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খতম করে দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। এঁদের ধারণা ছিল, বড় বড় সরকারি অফিসারকে খুন করতে পারলেই কার্য হাসিল হয়ে যাবে। এই সন্ত্রাসবাদীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম খুবই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু পথ ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

আন্দোলনে হাতেখড়ি

কিশোর বয়সেই আমি সন্ত্রাসবাদী গোপন সংগঠনে যোগ দেই। এই সংগঠনের নাম ছিল 'অনুশীলন'। ১৯২১ সালে ভারতব্যাপী যখন অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়, তখন ওই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু 'অনুশীলন' পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের এই বলে বিরত করা হয় যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া অহিংস উপায়ে ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করা যাবে না। অহিংসা প্রচার করে বিপ্লবী চেতনাকে খর্ব করা হচ্ছে। কাজেই এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কোনো সার্থকতা নেই। সুতরাং আমরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকি। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা 'হক কথা' নামে ইশতেহার ছাপিয়ে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এটা ছিল মারাত্মক ভুল পন্থা। কংগ্রেস-খিলাফতের আন্দোলনে আমরা কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। এই আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা দেখে আমরা সন্ত্রাসবাদী নীতিতে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ি। আমাদের মধ্যে একটি চিন্তা আসে যে, ব্রিটিশ সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে খতম করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। বিপ্লব করা দরকার, সে জন্য চাই অনেক মানুষ, জঙ্গি (সংগ্রামী, লড়াকু) লোক। নচেৎ কিছুই করা যাবে না।

এই চিন্তা থেকে আমরা লোক সংগ্রহ করার কাজে মন দেই। আমরা আগেই শুনেছিলাম যে, হাজং সম্প্রদায় খুব জঙ্গি। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, যা 'হাজং-বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। আমি ও আমার এক সমবয়সী সন্ত্রাসবাদী বন্ধু উপেন সান্যাল ঠিক করলাম, এই হাজংদের যদি দলে টানা যায় তবে এক চমৎকার কাজ হবে। এই চিন্তা করে আমরা দুজনে আমাদের গ্রাম সুসং-দুর্গাপুর হতে মাইল দশেক দূরে কালিকাবাড়িতে যাওয়া স্থির করলাম। দূরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের অভিভাবকরা আমাদের কাজকর্মের যাতে কোনো হদিস না পান। এই সময়টা হচ্ছে ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে। আমরা ওই গ্রামে গিয়ে মাতব্বরদের সঙ্গে

আলাপ করলাম। তাঁদের কাছে জানতে চাইলাম—তাঁরা কেমন আছেন? কী হালচাল চলছে ইত্যাদি। এর উত্তরে তাঁরা বললেন, "কে আমাদের দেখে? আমাদের ছেলেপেলেদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য এখানে কোনো স্কুল নেই। এরা মূর্খ হয়ে থাকবে। আপনারা সরকারকে বলে আমাদের এখানে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য যদি স্কুল বসাতে পারেন, তবে খুব উপকার হয়। তাছাড়া আমরা হচ্ছি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আমাদের হাতে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরা পানি খান না। আমরা সমাজে পতিত হয়ে রয়েছি। এর প্রতিকার চাই। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কোনো বাঙালি পুরোহিত আমাদের কোনো পূজা করেন না। এই সবই আমাদের সমস্যা। আমরা খুবই লাঞ্ছিত।"

এরপর আমরা নিজেরা এসে চিন্তা করলাম যে, সরকারকে বলে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা নিজেরাই যদি স্কুলের শিক্ষক হই, তবেই এটা সম্ভব হতে পারে। হাজংদের হাতে পানি খেতে আমাদের কোনো অসুবিধা ছিল না। (কিন্তু শুধু আমরা খেলেই কি সমাজে এটার প্রচলন হবে?) আমাদের সমর্থক ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে—এসব চিন্তা করে আমাদের সংগঠন 'অনুশীলন' এর জেলা কমিটিকে শিক্ষক পাঠাতে লিখলাম। উপেন সান্যালকে বললাম, "তুমি কালিকাবাড়িতে গিয়ে শিক্ষক হও। তোমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষ আছে। তোমার বাড়িতে তোমার কোনো খোঁজখবর নেবে না। আমার অবস্থা তা নয়। আমি বাড়িতে না থাকলে হৈ চৈ পড়ে যাবে।" এই কথা অনুসারে উপেন সান্যাল কালিকাবাড়ি গিয়ে স্কুল স্থাপন করল। জেলা থেকেও কিছু শিক্ষক পাঠানো হলো। ওই শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীপ্রভাত চক্রবর্তীও আসেন (পরে আন্তঃপ্রদেশ ষড়যন্ত্র মামলায় ১৩ বছরের সাজা নিয়ে আন্দামানে ছিলেন)।

আমরা এভাবে পাহাড়ি এলাকায় কয়েক মাইল দূরে দূরে স্কুল স্থাপন করেছিলাম। হারান বাগচী নামক আমাদের এক সমর্থককে পুরোহিত হিসেবে হাজংদের পূজা করার জন্য পাঠানো হয়। তাতে তাঁর কিছু অর্থ প্রাপ্তিও হতো। আর আমরা তো হাজংদের হাতে পানি পান করতামই। এসব ব্যবস্থা করায় হাজংদের মধ্যে আমাদের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। এই সাফল্যে আমরা খুব খুশি হই। সুসং-দুর্গাপুরে সুরেশ চন্দ্র দে নামে এক পোস্টমাস্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন অনুশীলন পার্টির উচ্চ কমিটির সদস্য। তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি ছিলেন যুবক, স্বাস্থ্য খুব ভালো, গ্র্যাজুয়েট, কট্টর এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ। তাঁর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার রামগোপালপুরে। তাঁর সঙ্গে পার্টিগতভাবেই আমাদের পরিচয় হয়ে যায়। তিনি সুসং পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বদলি হয়ে ময়মনসিংহ শহরে চলে যান। পরে ময়মনসিংহ থেকে

লোক মারফত একটি চিঠি পাঠান এই মর্মে যে, "একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে পাঠাচ্ছি তাঁকে গোপনে রাখবেন এবং তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করবেন।" আমরা ঠিক করলাম, সুসং-দুর্গাপুর থেকে ছয় মাইল দূরে নাগেরগাতি গ্রামে তাঁকে রাখতে হবে। সেটা আমার কাকিমার বাপের বাড়ি। সেখানে থাকলে জানাজানি হবে না। সে বাড়িতে আমার চাচাত ভাই শচী সিংহও থাকে। কথিত ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা; গায়ের রং ফর্সা, বয়স আমাদের চাইতে কিছু বেশি। নাগেরগাতিতে সবার সঙ্গে আলোচনা করার সুবিধা হবে না বিবেচনা করে আমরা তাঁকে পাহাড়ি অঞ্চলে জগৎকুড়া গ্রামে নিয়ে গেলাম। ময়মনসিংহ জেলার এক পাহাড়ের টিলায় হাজংদের কয়েকটি বাড়ি ছিল নাগেরগাতি থেকে মাইল বারো দূরে। ওই পাহাড়ে টিলার উপর আমাদের একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হলো। টিলাটি বেশ উঁচু। পানি আনতে হতো টিলার নিচে থেকে।

এখানে আলোচনার জন্য আমরা উপস্থিত ছিলাম চারজন—প্রভাত চক্রবর্তী, উপেন সান্যাল, মণি সিংহ ও শচী সিংহ। যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর নাম গোপেন চক্রবর্তী। তিনি এখানে আসার কয়েক মাস আগে মস্কো থেকে ফিরে এসেছিলেন। আমাদের সাক্ষাতের সময়টা ছিল ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস। গোপেন চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কী করছ?" আমরা বললাম, "আমরা স্কুল করেছি, এঁদের ব্রাহ্মণ দিয়েছি এবং এঁদের ইচ্ছানুয়ায়ী এঁদের হাতে আমরা পানি খাচ্ছি। এঁদের পক্ষে আনার চেষ্টা করছি। কারণ ব্রিটিশদের তাড়াতে হলে বহু মানুষ দরকার। এঁরা সাহসী, সৎ এবং দুর্ধর্ষও বটে। তাছাড়া এঁদের মধ্যে আমাদের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এঁদের আমরা সঙ্গে পাব।"

এই কথা শুনে গোপেন চক্রবর্তী বললেন—"তোমরা ভস্মে ঘি ঢালছ।" আমরা এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমাদের এসব কাজের স্বীকৃতি নাই-ই, একেবারে তুচ্ছ করে দিচ্ছে। তিনি বললেন, "এরূপ আন্দোলন করে ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করা যাবে না। দেশে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণ আছে। তোমরা হাজংদের হাতে পানি খাচ্ছ, কিন্তু মেথরদের হাতে পানি খেলে সব হাজং তোমাদের ছেড়ে চলে যাবে। এই সংস্কারমূলক আন্দোলন দিয়ে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। মুসলমানদের তোমরা কীভাবে সংগঠিত করবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে হলে ভারতের সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা কায়েম করে শোষণমুক্ত সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নচেৎ শোষক ও শোষিতের সমস্যার সমাধান হবে না। সর্বহারা শ্রমিকরাই হলো সবচেয়ে

বিপ্লবী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁদের হারাবার কিছু নেই। এদেশে প্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে হবে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রথারও উচ্ছেদ প্রয়োজন। দেশের গরিব জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আন্দোলন করে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে হবে। কেন আমাদের দুর্দশা, কেন আমরা বঞ্চিত, শোষিত—তা জনগণকে বোঝাতে হবে। সামাজিক সংস্কার দিয়ে রাজনৈতিক সাফল্য আনা যায় না।” তিনি শ্রেণিসংগ্রামের ওপর বিশেষ জোর দিলেন।

গলা ফাটিয়ে তর্কবিতর্ক হলো। এমন আওয়াজ হলো যে বাড়ির বয়স্করা ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবছিলেন ঝগড়া বাধল নাকি? আমি যুবক, আমার গলা ছিল সবচেয়ে চড়া। আমাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল স্বল্প। আমরা অবশ্য তখন রাশিয়ার বিপ্লবের কথা শুনেছি এবং এটাও শুনেছি যে, সেখানে কুলি-মজুররা ক্ষমতা দখল করেছে, বড়লোক সব খতম। জার বা সম্রাট খতম। কিন্তু সে বিপ্লব সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। সে সময় দেশে রাশিয়ার বিপক্ষে লেনিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারই হতো বেশি। বলা হতো কুলি-মজুরের রাজত্ব আর কয়েকদিন থাকবে। কিছুদিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। আমরা অবশ্য ‘ভ্যানগার্ড’ প্রভৃতি পত্রিকা কখনো কখনো পেয়েছি। তবে তা থেকে মূলমর্ম ও পথ উদ্ধার করতে পারিনি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনাই ছিল আমাদের সম্বল। কীভাবে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতে হবে সে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অস্পষ্ট।

এই অবস্থায় তর্ক-বিতর্ক কয়েকদিন হলো বটে, কিন্তু গোপেন দা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করে এনেছিলেন তা-ই ছিল আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতির কথা ইতিপূর্বে আমরা কখনো শুনিনি। আমরা গোপেন দার যুক্তি মেনে নিলাম। প্রভাত চক্রবর্তী তখন কিছু বলেননি। আমাদের মনে হলো তিনিও ওটা মেনে নিয়েছেন। অবশ্য পরে আন্দামান বন্দীশালায় তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে কথা হয় শ্রমিকরাই সবচেয়ে বিপ্লবী; কাজেই তাঁদের মধ্যে প্রথমে কাজ আরম্ভ করতে হবে, পরে কৃষকদের মধ্যে। আমি বললাম, “আমি কলকাতায় গিয়ে কাজের একটা ব্যবস্থা করে অন্যদের সেখানে নিয়ে যাব। কারণ কলকাতায় আমি দীর্ঘ দশ বছর ছিলাম। কলকাতা আমার জানা জায়গা। আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন, কাজেই কলকাতায় আমার থাকার কোনো অসুবিধা নেই।”

এসব কথার পর ওই জায়গার কাজ প্রায় গুটিয়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম। যতদূর মনে পড়ে, ১৯২৬ সালে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে ৩৭, হ্যারিসন রোডের দোতলায় এসে দেখা করলাম। তখন

ওখান থেকে 'গণবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকা ছিল শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণিস্বার্থের পত্রিকা। তখন কলকাতায় এই ধরনের আর কোনো পত্রিকা ছিল না। আমি ক্লাইভ স্ট্রিটের গুপ্ত ম্যানসনে একটি ঘর ভাড়া করে ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং নাম দিয়ে একটি অফিস খুলে বসলাম। তাতে টেলিফোনসহ অফিসের যাবতীয় উপকরণই ছিল। উদ্দেশ্য ছিল কীভাবে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেওয়া যায়, তা বের করা। কলকাতায় এসে গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, নীরোদ চক্রবর্তী, নলীন্দ্র সেন প্রমুখের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা সবাই ছিলেন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। ওই সময়ে পার্টির নেতৃত্বাধীনে কোনো শ্রমিক সংগঠন ছিল না। কাজেই এসেই কোনো শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলাম না। গোপেন দা শ্রমিক হয়ে একটি পাটকলে ঢুকলেন, উদ্দেশ্য শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর স্বরূপ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে, তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত হলেন। ওই সময় মাত্র কয়েকজন কমরেড কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য (সদস্য) ছিলেন।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নির্দেশে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সূচনা থেকেই গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি সাহায্য করে এসেছে। সেজন্য বিলাত থেকে কমিউনিস্ট কর্মীরা ভারতে এসে কাজ করেছেন। ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ভারতে কাজ করার সুবিধা ছিল। কারণ একজন ব্রিটেনের বাসিন্দাকে বা অন্য কোনো ব্রিটিশ প্রজাকে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কারের কোনো আইন ছিল না। জর্জ এলিসন ভারতে কাজ করার জন্য ১৯২৬ সালে বোম্বে (নতুন নাম মুম্বাই) আসেন। তিনি সিপিজিবির শুধু মার্কামারা সভ্যই ছিলেন না, পলিটব্যুরোর একজন সদস্যও ছিলেন। তাই তাঁর ভিসা পাওয়ার অসুবিধার জন্য 'ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল' এই ভুয়া নামের পাসপোর্টে তিনি ভারতে আসেন। মাস ছয়েক পরে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে জাল পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে আসার দায়ে বোম্বেতে তাঁর নামে মোকদ্দমা হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয় যে, তিনি জর্জ এলিসন, গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর একজন বিশিষ্ট সভ্য। জাল পাসপোর্টে আসার জন্য তাঁর আঠারো মাস সাজা হয়ে যায়। সাজা খাটার পর তিনি ভারতে থেকে যেতে পারতেন, কিন্তু সাজা শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর আসেন ফিলিপ স্প্রাট। তখন তাঁর বয়স ছিল সাতাশ বছর। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্সে অনার্স (ট্রাইপোস) নিয়ে বিএ পাস করেছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে কমরেড মুজফ্ফরের আস্তানা

২/১ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে ওঠেন এবং সেখানে এ দেশি খাবার খেয়ে অতি কষ্টে জীবনযাপন করতে থাকেন। তিনি নিজেই এই অবস্থা বরণ করে নেন। তিনি লিলুয়া রেলওয়ে স্ট্রাইকারে এবং পরে ধাঙড় ধর্মঘটের সময় কাজ করেন। তাঁর চাল-চলন ছিল খুব সাদাসিধে। তিনি `A call to Action' (এ কল টু একশন) নামে একটি পুস্তিকাও লেখেন। এটা পার্টিতে আলোচনা হওয়ার পর প্রকাশিত হয়। ফিলিপ স্প্রাট 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়' ১৯২৯ সালে অভিযুক্ত হন। ফিলিপ স্প্রাট বাইরে বা জেলে কোনোখানেই তাঁর বিপ্লবী মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেননি। 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের মেয়েকে বিয়ে করে ভারতে থেকে যান। তিনি আর ইংল্যান্ড ফিরে যাননি। দুঃখের বিষয়, তিনি পরে আর কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন না। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ তিনি ত্যাগ করেন। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য। এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে আরো আছে। কিন্তু ফিলিপ স্প্রাটের এরূপ পরিণতি হবে তা আমরা কখনো ভাবতে পারিনি। প্রথমে তিনি যে ত্যাগ ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছিলেন, তা ছিল খুবই প্রশংসাযোগ্য।

আরেকজন ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি। ফিলিপের মতো তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তিনি কাজ করতেন বোম্বেতে। তিনি জার্নিম্যান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ড থেকে ভারতে কাজ করার জন্য আসেন। তিনি ছিলেন সিপিজিবির সভ্য। ১৯২৭ সালে ভারতে কাজ করতে আসলেও ভারত তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না। ১৯২১-২২ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি অস্ত্র মেরামত কারখানায় তাঁকে কাজ করতে হয়। তিনি স্প্রাটের মতো অত কৃচ্ছ্র সাধন করে কাজ করতেন না। সুতাকল ও রেলওয়ে মজুরদের সংগ্রামে তিনি একান্তভাবে জড়িত ছিলেন। 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়' জড়িত হলেও তিনি কোনোদিনই একটু দুর্বলতা দেখাননি। 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়' তাঁর দশ বছর সাজা হয়। হাইকোর্টে আপিলে সেই সাজা কমে এক বছর হয়। তিনি ছিলেন পাকা কমিউনিস্ট, ১৯৩৩ সালে তিনি মুক্তি পান। পরে তিনি ইউরোপে ফিরে যান। 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের' সপ্তম কংগ্রেসে তিনি তাম্বে নামে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কী সম্পর্ক হবে সেই বিষয়ে 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস' পরে ভারতবর্ষে আসে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রাডলির মৃত্যু হয়।

আরেকজন ছিলেন অক্ষয় সাহা। তাঁর বাড়ি ছিল আমার বাড়ির নিকটে। তাঁর স্ত্রীর জন্যই তাঁর নাম করতে হচ্ছে। তিনি বিএসসি পাস করে ১৯২৬ সালে ফ্রান্স হয়ে জার্মানি এবং পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। তিনি সেখানে কী শিখে এসেছিলেন, তা বলতে পারব না। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে বিয়ে

করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল তাতিয়ানা সাহা। তাতিয়ানা ইংরেজি জানতেন, পরে বাংলাও শেখেন। ১৯৩৮-৩৯ এ তাতিয়ানা সাহাকে নিয়ে আমরা অনেক মিটিং করেছি। তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে মিটিং-এ বক্তৃতা করতেন। আমরা তরজমা করে দিতাম। এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে জীবন্ত খবর পাওয়া যেত, তাতে প্রচারের সুবিধা হতো। এঁরা এখন কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কিনা জানি না। অক্ষয় সাহার বাড়ি ছিল আমাদের সুসং-দুর্গাপুর থেকে চার মাইল দূরে এক গণ্ডগ্রামে। নিম্নবিত্ত পরিবারের লোক। তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন না।

আমি কলকাতায় গিয়ে যখন অফিস খুলে বসলাম, তখন ১৯২৬ সালের গোড়ার দিক। শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ করে উঠতে পারলাম না। স্বনামধন্য কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের ওখানে যেতাম, 'গণবাণী' পড়তাম। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিসেও আসতেন।

১৯২৮ সালের প্রথম দিকে একদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় বসে আছি। এই সময়ে কমরেড গোপেন চক্রবর্তী ও কমরেড ধরণী গোস্বামী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা যা বলেছিলেন তাঁর সারমর্ম বলছি। তাঁরা রহস্য করে বললেন, "তুমি এখনো এখানে বসে আছ, আর বিপ্লব তো এদিকে শেষ।" আমি বললাম, "বিপ্লব শেষ হয়ে গেল আর আমি জানতে পারলাম না! এটা কেমন বিপ্লব?" তাঁরা জানালেন, "শ্রমিক আন্দোলন করার মহাসুযোগ উপস্থিত হয়েছে। কে সি মিত্র ওরফে জটাধারী বাবা লিলুয়া রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট করেছেন। সেখানে প্রচারের জন্য বহু কর্মী দরকার। অবশ্যই এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।" শুনেছি কে সি মিত্র (কিরণচন্দ্র মিত্র) রেলওয়ে কর্মচারী ছিলেন। তারপর সাধু হয়ে যান। ফলে তাঁর চুলে জটা বেঁধে যায়। এ থেকেই তাঁর নাম হয় জটাধারী বাবা। আমরা যখন দেখেছি, তখন তাঁর জটা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। শ্রমিক এলাকায় জটাধারী বাবার নাম খুব প্রচার হয়ে পড়ে। আমাকে গোপেন দা ও ধরণী দা বললেন, আগামীকাল তোমাকে লিলুয়া যেতে হবে, এই হলো মাহেন্দ্র-সুযোগ।" আমি দুই দিন সময় চাইলাম। তা তাঁরা দিতে নারাজ ছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে, আমি একদিন পরেই লিলুয়া রেলওয়ে ইউনিয়ন অফিসে উপস্থিত হলাম। এটা ছিল মাঝারি ধরনের একটা দালানবাড়ি। এই সময় একজন অবাঙালি শ্রমিক এসে জিজ্ঞেস করলেন, "জটাধারী বাবা কাঁহা?" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" তখন এই শ্রমিক বললেন, "জটাধারী বাবাকে লেনে আয়া।" কারণ হিসেবে জানালেন, তাঁরা মেটিয়াবুরুজে

কেশোরাম কটন মিলে হরতাল করেছেন এবং জটাধারী বাবার সেখানে যাওয়া দরকার। জটাধারী তখন অফিসে ছিলেন না। গোপেন দা আমাকে বললেন, "জটাধারী সংস্কারবাদী, চল আমরাই যাই।" ওই অবাঙালি শ্রমিকটির নাম ছিল রহমান। তিনি কেশোরাম টেক্সটাইল মিলে তাঁতের কাজ করতেন। গোপেন দা রহমান মিয়াকে বললেন, "জটাধারী নেই, আমরাই তাঁর লোক। চলুন, মেটিয়াবুরুজে আমরা যাই।"

মেটিয়াবুরুজ ওখান থেকে বেশ দূরে। আমরা তিনজন মেটিয়াবুরুজে উপস্থিত হলাম। শ্রমিকরা আমাদের দেখে খুব খুশি। কেশোরাম মিলে অধিকাংশ শ্রমিক ছিল অবাঙালি-বিহার ও যুক্ত প্রদেশের লোক। কে ধর্মঘট করেছেন তা শ্রমিকরা খাস উর্দুতে আমাদের বোঝাতে লাগলেন। একে ভাষা ভিন্ন, অপরদিকে বস্ত্রকল সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমি তো এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। গোপেন দা কিছু কিছু হিন্দি শিখেছিলেন। কিন্তু তিনিও তেমন ভালো বুঝতে পারলেন না। আমাদের ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে শ্রমিকরা বুঝলেন যে, আমরা কিছু বুঝছি না। তাঁরা বললেন, "সেক্রেটারি সাহেবকা পাস চলিয়ে।" সেক্রেটারি নাম থাকলেও তিনি ছিলেন সেখানকার ম্যানেজার। ম্যানেজার ছিলেন শিক্ষিত মাড়োয়ারি ভদ্রলোক, বয়সে যুবক। আমরা সেক্রেটারির কাছে যাওয়াই সমীচীন মনে করলাম। কারণ, আমরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সেক্রেটারির উপাধি ছিল মুন্ডেলিয়া। মুন্ডেলিয়াকে আমরা বললাম, "আমরা দেশকর্মী। মিলে কী কারণে হরতাল হলো তা জানতে এসেছি"। তিনি সাদরেই আমাদের বসালেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—তাঁতিদের আগে পাউন্ড হিসেবে (ওজন) মজুরি দেওয়া হতো, এখন ইয়ার্ড বা গজের অনুপাতে মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিই এখন পৃথিবীর সর্বত্র চালু আছে। বিড়লারা মহানুভব ব্যক্তি। তাঁরা শ্রমিকদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। শ্রমিকরা মূর্খ, না বুঝে হরতাল করেছে। এই সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান না থাকলেও নীতিগত ধারণা থেকে ধরে নিলাম, বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের কখনো ভালো করতে পারে না। এই হিসেবে আমরা এলোপাতাড়ি তর্ক করে চলে এলাম। কারণ মিলের মজুরি প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না।

বাইরে এসে আমি গোপেন দাকে বললাম, এরূপ অন্ধকারের মধ্যে কোনো কাজ করা যায় না। আমরা কিছুই জানি না। পাউন্ড ও ইয়ার্ডের ভেদ আমরা কিছুই বুঝি না—শ্রমিকদের ভাষা জানি না। কাজেই কীভাবে আমরা এখানে কাজ করব? প্রথমে পাউন্ড ও ইয়ার্ডের কী তাৎপর্য তা আমাদের বুঝতে হবে। গোপেন দা বললেন, "কীভাবে বুঝবে?" আমি বললাম, "অন্য একটা মিলে

গিয়ে জানার চেষ্টা করতে হবে।" শ্রীরামপুর বস্ত্রকলে গিয়ে জানার চেষ্টা করতে হবে। গোপেন দা বললেন "তুমি শ্রীরামপুর যাও। আমাকে লিলুয়া ফিরে যেতে হবে, কারণ অন্যরা আমাকে খুঁজবে।"

আমরা দুজনে চলে এলাম। আমি শ্রীরামপুরে খুব সম্ভব বঙ্গলক্ষ্মী মিলে গেলাম। মেটিয়াবুরুজে শ্রমিকদের কাছে উইভিং মাস্টারের নাম শুনেছিলাম। তিনিই আবার উইভিং বিভাগের কর্তা ছিলেন। আমি মিলে গিয়ে উইভিং মাস্টারের নামে একটি স্লিপ পাঠালাম। ৩৮/৪০ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক এলেন। আমার স্লিপে লেখা ছিল—কে সি মিত্রের নিকট থেকে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে সি মিত্র কে?" আমি কে সি মিত্রের পরিচয় বললাম। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, "কী চান?" আমি বললাম, "আমরা দেশকর্মী। কাপড়ের মিল সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। কেশোরাম মিলের শ্রমিকরা হরতাল করে কে সি মিত্র মহাশয়ের কাছে এসেছিল। ওখানে আগে পাউন্ডের ওজনে মজুরি দেওয়া হতো, এখন ইয়ার্ডে দেওয়ার নিয়ম করায় মজুরি কমে গিয়েছে। আগে মাসে তাঁরা যে মজুরি পেত বর্তমানে প্রত্যেক তাঁতির তা থেকে ১০/১২ টাকা কমে গিয়েছে। কাজেই তাঁরা হরতাল করেছে। আমরা কেশোরাম মিলে গিয়েছিলাম। সেখানকার সেক্রেটারি বললেন যে, ইয়ার্ডই দুনিয়াব্যাপী চালু আছে। শ্রমিকরা মূর্খ, তাই তাঁরা হরতাল করেছে। আপনার কাছে পাউন্ড ও ইয়ার্ডের ভেদটা জানতে চাই।" তিনি প্রথমে বললেন, "বলব কেন?" আমি বললাম, "বলা না বলা আপনার ইচ্ছা। তবে এ ব্যাপার এত গোপনীয় নয় যে জানা যাবে না?" তিনি বললেন, "আচ্ছা বসুন।" বসার পরে বললেন, "আজকাল দুনিয়ার সব জায়গায় ইয়ার্ড চালু হয়েছে এটা সত্য কথা। ইয়ার্ড ব্যবস্থা করতে গিয়ে তারা যে হিসাব ধরেছে তাতে তাঁতিদের মজুরি কমে গেছে। ঠিক ঠিক হিসাব ধরলে মজুরি কমত না।" আমি বললাম, "শ্রমিকদের স্বার্থ কোন্‌টা, ইয়ার্ড না পাউন্ড?" তিনি বললেন, "পাউন্ড হলো শ্রমিকদের স্বার্থ। কিন্তু পাউন্ডে রাখতে পারবেন না। কেশোরাম মিলে কতকগুলো উন্নত নতুন তাঁত বসানো হয়েছে, তাই মজুরি ইয়ার্ডে দিয়েছে।" আমি বুঝতে পারলাম যে, মজুরি পাউন্ডে রাখাই শ্রমিকদের স্বার্থ।

আমি লিলুয়ায় ফিরে এলাম। গোপেন দা ও ধরণী দা আমাকে ধরে বসলেন, "তোমাকে মেটিয়াবুরুজে গিয়ে কাজ করতে হবে।" আমি বললাম, "এটা অসম্ভব। আমি তাঁদের ভাষা বুঝি না, তারপর মিল সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। ভাষা জানা থাকলে তবুও চেষ্টা করা যেত।" তাঁরা বললেন, "বিপ্লব তো মাখনের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দেওয়া নয়, এটা কঠিন ও জটিল কাজ। ভাষা শিখে নিতে হবে।" আমি পিছপা হলাম না, মেটিয়াবুরুজে চলে গেলাম। শ্রমিকদের

সাহায্যে একটা অফিসঘর নেওয়া হলো। এদিকে থাকার জায়গার অভাব। ছেলেমেয়ে না থাকলে বাসা পাওয়া যায় না। আমরা ৯৬, পাহাড়পুর রোডে দুটি ছোট ও একটি মাঝারি এই তিনটি ঘর ইলেকট্রিক লাইটসমেত মাসে সাড়ে আট টাকায় ভাড়া করলাম। কাটোয়া থেকে দিদিকে এনে মেয়ে দেখালাম। সময়টা ১৯২৮ সালের প্রথমদিক। অফিসের একটা ঘরের ভাড়া ছিল দশ টাকা। এখন কলকাতা বা তার আশপাশে এরূপ স্বল্পমূল্যে বাড়ি ভাড়া কল্পনা করাও যায় না। অবশ্য তখন চাল, ডাল, চিনি, মাংস ইত্যাদির দামও এত সস্তা ছিল যা এখন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। যেমন, চাল ৪/৫ টাকা মণ, আটা বারো পয়সা সের, চিনি ছয় আনা এবং গরুর মাংস চৌদ্দ পয়সা থেকে চার আনা দরে বিক্রি হতো। এদিকে বাসা নিয়ে উপেন সান্যাল ও শচী সিংহকে দ্রুতই কলকাতায় চলে আসতে লিখলাম। তাঁরা কিছুদিনের মধ্যে চলে এলেন।

মেটিয়াবুরুজ একটি শ্রমিক এলাকা। কলকাতা থেকে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখানে কেশোরাম কটন মিল ছাড়াও চটকল, জাহাজ মেরামতের কারখানা, গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপ, আইজিএন ওয়ার্কশপ, বদরতলায় ইউনিয়ন জুট মিল, ক্লাইভ জুট মিল, ম্যাচ ফ্যাক্টরি প্রভৃতি তখনই ছিল। তাছাড়া এটা ছিল চোরাচালানের স্বর্গ। বিদেশ থেকে যে সব জাহাজ আসত ওইগুলো এই চোরাচালানের উৎস ছিল। অস্ত্রসমেত নানারকম জিনিসের এখানে চোরাকারবার চলত। রাস্তার দুই পাশে দুই পুলিশ ব্যবস্থা। উত্তরে কলকাতা পুলিশ ও দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। তবুও চোরাচালান অবাধেই হতো।

টেক্সটাইল ইউনিয়নের নাম দিয়ে রশিদপত্র ছাপানো হলো। মাসে যে যত মজুরি পাক একদিনের মজুরি ইউনিয়নকে বছরের চাঁদা হিসেবে দিতে হবে বলে ঠিক করা হলো। শ্রমিকরাই এই ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা যেদিন বেতন পেলেন ওই দিনই চাঁদা দিয়ে দিলেন। চারশ টাকার মতো চাঁদা উঠল।

আমি তখন কাজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ও উর্দু শেখার চেষ্টা করছি, মানে জেনে নিচ্ছি। কিছু কিছু শব্দ মুখস্থ করে নিচ্ছি। এইভাবে কাজ চালানোর মতো হিন্দি ও উর্দু কয়েক মাসের মধ্যে শিখে ফেললাম। হরতালের ১০/১২ দিন পর একদিন অফিসে বসে আছি। কয়েকজন শ্রমিক এসে বললেন, "আপনি এখানে বসে আছেন, আর ওদিকে মালিকপক্ষ মিটিং ডেকেছে। সুভাষ বাবু আসছেন কারবালা ময়দানে।" (আগে এখানে গোরস্তান ছিল, এখন নেই)। কারবালা ময়দান একটি মাঠ। তবে বড় নয়। এখানেই মিটিং হবে। তাঁরা বললেন, "চালিয়ে, আপকো বয়্যান করনে হোগা।" আমি বললাম, " আমি কি বয়ান করব, আমি কিছুই জানি না।" তাঁরা বললেন, "আপকো স্রেফ এক বাত

বোলনে হোগা—হামলোক পাউন্ড মাংগতা, ইয়ার্ড নেই মাংগতা। যো থুক ফেকা হ্যায় উও থুক আউর নেহি চাটেগা। ব্যস আওর কুছ নেহি।” আমি কারবালার ময়দানে গিয়ে দেখি দুই-তিন হাজারের মতো শ্রমিক সেখানে জড়ো হয়েছেন। মিলের বড় বড় অফিসারদের সাত-আটজন চেয়ারে বসে আছেন। কয়েকজন কলকাতা থেকে এসেছেন, কিন্তু সুভাষ বাবু নেই। আমি ভাবলাম সুভাষ বাবু এখানে আসবেন কেন? এটা বোধ হয় একটা ধাপ্পা। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সত্য সত্যই সুভাষ বাবু কিছুক্ষণ পরে এসে উপস্থিত হলেন।

মিটিং আরম্ভ হলো। কর্মচারীরা সব বক্তৃতা দিলেন, বিড়লারা অতি মহৎ লোক, তাঁরা শ্রমিকদের বাপ-মা। ইয়ার্ড খুব ভালো ব্যবস্থা, তোমরা সবাই কাজে যোগ দাও। হরতাল ভেঙে একে একে অনেকেই বক্তৃতা করলেন। এইবার সুভাষ বাবুর পালা। তিনিও বিড়লার পক্ষেই বললেন এবং হরতাল তুলে নেওয়ার উপদেশ দিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকরা নিস্তব্ধ হয়ে শুনছিল, কোনো টু শব্দ ছিল না। আমি একজন শ্রমিককে পাশের দোকান থেকে টেবিল আনতে বললাম। টেবিল আনা হলো। আমি টেবিলের উপর উঠে একটি হুঙ্কারের মতো আমার মুখস্থ করা বুলি বললাম, “ভাইও হামলোক পাউন্ড মাংগতা, ইয়ার্ড নেই মাংগতা। যো থুক ফেকা হ্যায় ও থুক ফের নেহি চাটেগা।” তখন মাইকের প্রচলন ছিল না। আমার গলা ছিল খুব চড়া। আমি যখন এই আওয়াজ উঠালাম, তখন সব শ্রমিক একযোগে “পাউন্ড মাংগতা, ইয়ার্ড নেহি মাংগতা” বলে হৈ চৈ করে উঠলেন। কারণ আমি শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি করেছিলাম। মিটিং ভেঙে গেল, যে যাঁর মতো সরে পড়লেন।

এর আগে একটি ঘটনা ঘটেছিল। মেটিয়াবুরুজের বড় রাস্তার ধারে গঙ্গা নদীর পারেই কারখানাগুলো অবস্থিত। কারখানার পিকেটিং সম্পর্কে খিদিরপুরের ওসি আমাদের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আপনারা করতে পারবেন, কিন্তু বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কিছু করবেন না। একদিন ভোর ছয়টার একটু আগেই আমি এবং আরো বেশ কয়েকজন শ্রমিক কারখানার গেটে যাই। শ্রমিকরা কাজে যাতে যোগ না দেন তার জন্য পিকেটিং করছিলাম, এই সময় লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট আসে। সে মিলের কর্মচারীদের প্ররোচণায় আমাদের পিকেটিং করতে দেখে আমাকে বলে, “তুমি যদি আর এক পা অগ্রসর হও তবে তোমাকে গ্রেপ্তার করব।” আমি বললাম, “এই পা বাড়ালাম।” সে আমাকে গ্রেপ্তার করে মেটিয়াবুরুজের কলকাতা পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে গেল। ওই ফাঁড়ির চার্জে ছিল আরেকজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট। তার নাম ছিল রবিনসন। রবিনসন লোক খারাপ ছিল না। গায়ে পড়ে আমাদের কখনো উত্ত্যক্ত করত

না। আগের দিন রবিনসন ও রহমান সাহেব মিলিতভাবেই আমাকে বলেছিলেন যে, "শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করা যাবে। ওটা আইনসঙ্গত।" লালবাজারের সার্জেন্ট যখন আমাকে ধরে নিয়ে উপস্থিত হলো তখন রবিনসন খুবই বিব্রতবোধ করলেন। লালবাজারের সার্জেন্টকে বললেন, "এটা ঠিক হয়নি।" আমাকে বললেন, "তুমি রহমান সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বল।" আমি রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন, "লালবাজারের সার্জেন্ট কিছু জানে না। আপনাকে ভুলে গ্রেপ্তার করেছে, কিছু মনে করবেন না। এটা পত্রিকায় প্রচার করবেন না-এই অনুরোধ করছি।"

এরই মধ্যে হাজার খানেক শ্রমিক ফাঁড়িতে এসে উপস্থিত। তাঁদের জঙ্গি মূর্তি, স্লোগান হচ্ছিল—"আঞ্জুমান (ইউনিয়ন) বাবুকো ছোড় দো।" রবিনসন বললেন, "এঁদের বল যে, তুমি গ্রেপ্তার হওনি, তুমি মুক্ত, নচেৎ এঁরা হয়তো এই ফাঁড়ি আক্রমণ করে বসবে।" আমি তখন অনভিজ্ঞ। আমি মনে করেছিলাম যে, আমার কথায় শ্রমিকরা আসবেন কেন। যাক, আমি বললাম, "আমি গ্রেপ্তার হইনি।" এই কথা শুনে শ্রমিকরা আমাকে এক রকম কোলে করেই নিয়ে চললেন। আমি নেমে পড়লাম। ওই সময়ে মিলের কর্মচারীরা শ্রমিকদের টিটকারি দিয়ে বলেছিলেন, "তোম লোককে বাপকো পাকাড়-কে লে গিয়া, আভি কিয়া করেগে।" শ্রমিকরা খুবই উত্তেজিত। তাঁরা আমাকে নিয়ে মিলের গেটে উপস্থিত হলো। দেখা গেল মিলের গেট বন্ধ। কোনো কর্মচারী সেখানে উপস্থিত নেই। আইবি প্রথমে আমার পরিচয় জানতে পারেননি। পরে অবশ্য তাঁরা সব জানতে পেরেছিলেন।

এই ঘটনায় চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট দত্ত সাহেব আমার খোঁজ করছিলেন। তিনি মেটিয়াবুরুজে আমাদের অফিসের সামনে এসে আমাকে পেলেন। তিনি বললেন, "তোমাকে আমি জানি।" সুরেশ সিংহ তখন ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ছিলেন আমার মামা। সেই সুবাদে তিনি আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বললেন, "ঘনশ্যাম দাস বিড়লা সমঝোতা করতে প্রস্তুত আছেন। তুমি তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা কর।" আমি বললাম, "আমি একা যেতে পারি না। আট-দশজন শ্রমিক নিয়ে ডেপুটেশনে যেতে হবে।" তিনি বললেন, "তাই যাও, দেখ যেন কোনো অশান্তি বা গোলযোগ না হয়।" আমরা ঠিক করে জন দশেক মাতব্বর শ্রমিককে নিয়ে ঘনশ্যাম দাস বিড়লার অফিসে উপস্থিত হলাম। আমাদের বক্তব্য বললাম—আমরা পাউন্ড চাই, ইয়ার্ড চাই না। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, কাজে যোগ দাও।" আমি বললাম, "স্ট্রাইকের সময়ের মজুরিটা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।" তিনি অস্বীকার করলেন না। হরতাল ১৫/১৬ দিন চলেছিল। এদিকে আমাদের স্ট্রাইকে জয় হওয়ায় আমাদের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। এমন কি দোকানদারসহ নানাজনের কাছেও আমরা

প্রিয় হলাম। আমরা সৎ ও সাচ্চা লোক—এই মর্মে পরিচিতি হলো। আগে এখানে অনেকে এসে ইউনিয়ন করার নামে টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এই ধর্মঘটের সময় কলকাতা থেকে কালী সেন, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, আবদুর রেজ্জাক খান এসে সাহায্য করতেন।

এরপর স্ট্রাইক হয় ক্লাইভ জুট মিলে। একজন শ্রমিককে ছাঁটাই করার ঘটনা নিয়ে স্ট্রাইকটি হয়। এই স্ট্রাইক সংঘটিত হওয়ার আগেই কলকাতা থেকে কমরেডদের মেটিয়াবুরুজে আসতে বলা হয়। আবদুর রেজ্জাক খান ও শামসুল হুদা মেটিয়াবুরুজে আসেন। আমরা সাতদিন পর্যন্ত খুব ভোরে পিকেটিং করে সম্পূর্ণ কারখানায় হরতাল করতে সমর্থ হই। এখানে মিলে ১৫/১৬ জন দারোয়ানকে শ্রমিকরা পিটিয়ে ঘায়েল করেন। কারণ দারোয়ানরা অনর্থক তল্লাশি করতেন। এই হরতালে পাঁচজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের জামিনে মুক্ত করে আনি। একটি বড় মিটিং হয়। সেখানে রাধারমণ মিত্র বক্তৃতা দেন। তিনি ছিলেন উর্দুতে অনলবর্ষী বক্তা। বঙ্কিম মুখার্জীও ছিলেন উর্দু ভাষায় খুব ভালো বক্তা। কিন্তু রাধারমণের বক্তৃতা শ্রমিকরা আগ্রহের সঙ্গে শুনত ও পছন্দ করত। রাধারমণ মিত্র ও বঙ্কিম মুখার্জী ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বঙ্কিম মুখার্জী পূর্ববঙ্গে এসেও অনেক বক্তৃতা করেছেন। তিনি আজ আর বেঁচে নেই। রাধারমণ মিত্র আজও বেঁচে আছেন এবং সুস্থ আছেন। তাঁর বয়স হবে প্রায় ৮৫ বছর। তিনি 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার' আসামি ছিলেন। তাঁর সাজা হয়েছিল। অবশ্য তিনি বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টিতে নেই। তবে তিনি পার্টির বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তাঁর পড়াশোনা ছিল প্রচুর। তাঁর আত্মীয়-স্বজন প্রায় কেউই নেই। তিনি অবিবাহিত। রাধারমণ মিত্র ও বঙ্কিম মুখার্জী বাউরিয়া চটকল ও টেক্সটাইল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯২৮ সালে ধাঙড় (ঝাড়ুদার) ধর্মঘট হয়। এতে শ্রমিকদের এক টাকা মজুরি বাড়ে। তের টাকা থেকে চৌদ্দ টাকা মজুরি হয়। কলকাতা শহরে ময়লা স্তূপীকৃত হতে থাকে। অবস্থা খুবই সঙ্গিন হয়ে পড়ে। ধাঙড়দের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সকলেই হরতালে যোগ দেন। ধাঙড় ইউনিয়নে প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্তা। এই হরতালে কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমদ যোগদান করেন। তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই হরতালে ফিলিপ স্প্রাট, ধরণী গোস্বামী, আবদুল হালিম, মণি সিংহ প্রমুখ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। প্রথমবার হরতালে এক টাকা মজুরি বাড়িয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও কলকাতা করপোরেশনের মেয়র

তা বাড়ালেন না। কাজেই দ্বিতীয়বার ধর্মঘট হয়। ধাঙড়রা রাজনীতি সচেতন না থাকলেও বেশ সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন।

১৯২৯ সালের চটকলের সাধারণ ধর্মঘটের কথা বলা দরকার। এতে শিক্ষণীয় বিষয়ও ছিল। ১৯২৯ সালে চটকল মালিক সংস্থা চটকল শ্রমিকদের মহার্ঘভাতা কেটে দেওয়ার প্রস্তাব করে। এই মালিকদের বেশির ভাগ ছিল ব্রিটিশ। তাদের সংস্থা ছিল খুব শক্তিশালী। তারা শ্রমিকদের হরতালের কাছে সহজে নতি স্বীকার করত না। ১৯২৯ সালে মহার্ঘভাতা কাটার আগেই 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়' সারা ভারত থেকে একত্রিশ জন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমরা কিছু কর্মী গ্রেপ্তার হইনি। আমি ছাড়া অন্য যাঁরা গ্রেপ্তার হলেন না তাঁদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, কালী সেন, আবদুর রেজ্জাক, আবদুল মোমিন, আবদুল হালিম প্রমুখ। এই সময়ে বঙ্কিম মুখার্জী একদিন বললেন, "চটকল শ্রমিকদের হরতাল করবার উপযুক্ত সময় হয়েছে। কিন্তু আমরা এই ধর্মঘট পরিচালনা করব কীভাবে? আমাদের হাতে পয়সাকড়ি নেই। চটকলগুলো এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আমাদের যাতায়াতের পয়সাও নেই।"

ড. প্রভাবতী দাশগুপ্তা (এমএ, পিএইচডি) ছিলেন তখন জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আর কালী সেন ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। তখন আমাদের মধ্যে ঠিক হলো প্রভাবতীর কাছে গিয়ে ধর্মঘটের প্রস্তাব করার। প্রভাবতী কমিউনিস্ট ছিলেন না, তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল নেত্রী। বিদেশে থাকা ও শিক্ষার কারণে তাঁর সাহস ছিল। তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি বললেন, "আমি টাকা পাব কোথা থেকে? আমার পক্ষে টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।" প্রভাবতী আমাদের চেয়ে কিছুটা বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত। যেহেতু মেটিয়াবুরুজে কিছুটা শ্রমিক সংগঠন দাঁড়িয়েছিল, আর কোথাও কিছু ছিল না সেজন্য তিনি আমাকে সুনজরে দেখতেন। কিছুদিন পর তিনি আমাকে দেখা করার জন্য খবর পাঠালেন। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম। তিনি বললেন, "আপনারা যদি চটকলের ধর্মঘট চালাতে চান তবে ব্যবস্থা করুন, আমি টাকা দেব।" তিনি কোথা থেকে টাকা সংগ্রহ করলেন তা আমরা জানি না। আমি বললাম, তাহলে সকলকে ডাকা দরকার, প্রস্তাব গ্রহণ করা দরকার। একদিন তাঁর বাড়িতে মিটিং হলো। কালী সেন ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্থির হলো জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একটি কেন্দ্রীয় অফিস কলকাতায় নিতে হবে। আসবাবপত্র, টেলিফোন থাকবে। থাকার জায়গাও থাকবে। যাতায়াতের ব্যাপারে প্রভাবতী বললেন, কলকাতা থেকে যাঁরা যাবেন, তাঁরা আমার গাড়িতে যাবেন।

মণি সিংহকে একটি মোটরকার ভাড়া করে নিতে হবে। এইভাবে ব্যবস্থা হলো। ৪১ নম্বর হ্যারিসন রোডে কেন্দ্রীয় অফিসের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া করা হলো। টেলিফোন আনা হলো। এখনকার মতো টেলিফোন পাওয়া তখন ঝকমারি (ঝঞ্ঝাট) ছিল না। ত্রিশ টাকা জমা দিলেই সাত দিনের মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়ে যেত। তিন ভাষায় লাখখানেক ইশতেহার ছাপা হলো। আমার বাসস্থানে আমি টেলিফোন নিলাম। একটি প্রাইভেট গাড়ি (এটা ভাড়া খাটত) দৈনিক পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া করলাম। তখন দৈনিক খরচ সংগ্রহ করাই আমাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল। অথচ পঞ্চাশ টাকায় মোটর গাড়ি ভাড়া করা হলো। তাছাড়া তড়িৎগতিতে কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। প্রভাবতী ওই টাকা দিলেন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মিটিং করতে লাগলাম। শ্রমিকরা এমনিতেই বিক্ষুব্ধ ছিল। তাঁরা মনে করত তাঁদের খোরাকি কেটে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য একসঙ্গে সব মিলের খোরাকি কেটে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন মিলে বিভিন্ন মজুরি দেওয়া হতো। যখন যে মিলে শ্রমিকরা মজুরি কম পেল তার পরদিন থেকে স্ট্রাইক শুরু করে দিল। এইভাবে লক্ষাধিক শ্রমিক স্ট্রাইক শুরু করে দিল। দিন দিন স্ট্রাইকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। মুষ্টিমেয় কয়েকটি মিল ছাড়া সব মিলেই স্ট্রাইক হয়ে গেল।

স্ট্রাইক যখন পুরোদমে চলছে তখন মিল মালিকরা প্রভাবতীকে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, “তোমরা যে দাবি দিয়েছ তা আমরা মেনে নিচ্ছি। তোমরা যা দাবি করনি, সেই Maternity Benefit অর্থাৎ প্রসূতি ভাতা তাও আমরা দিচ্ছি, কিন্তু হরতাল কালই তুলে নিতে হবে।” প্রভাবতী হরতাল তুলে নেওয়ার কথা দিয়ে এলেন। প্রভাবতী খুশিতে বাগ বাগ হয়ে আমাদের খবর দিলেন। তিনি বললেন, “আমি অসাধ্য সাধন করে এসেছি।” মিটিং বসল, তাঁকে বলা হলো কার্যকরী সভার অনুমতি না নিয়ে তিনি এককভাবে কী করে হরতাল তুলে নেওয়ার মত দিয়ে এলেন? শ্রমিকদের আমরা কিছুই জানালাম না। তাঁদের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা আমরা জানতাম না। এই অবস্থায় তাঁর এককভাবে হরতাল তুলে নেওয়ার অঙ্গীকার করা কোনোমতেই উচিত হয়নি। দ্বন্দ্ব বেধে গেল। বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করে প্রভাবতী হরতাল তুলে নিয়ে কাজে যোগদান করতে বললেন। এসব মিটিং শ্রমিকরা চুপ করে শুনেছেন, সমর্থন করেননি। পরে অবশ্য আস্তে আস্তে কাজে যোগদান করেন। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া হয় বিরূপ। তাঁরা মনে করেন যে, আমরা এত লোক হরতাল করেছি, খোরাকি পাওয়া তো যাবেই, আমাদের মজুরিও বেড়ে যাবে। কিন্তু মাইজী (প্রভাবতী দাশগুপ্তাকে শ্রমিকরা মাইজী বলে ডাকতেন) সব গণ্ডগোল করে পথে বসিয়েছেন। এই প্রতিক্রিয়া দেখে আমাদের মধ্যে কেউই হরতাল তুলে নেওয়ার জন্য মিটিংয়ে যেতে রাজি হলেন না। আমি সুতাকলের

শ্রমিকদের সহায়তায় মেটিয়াবুরুজে চটকলের মিটিং করে প্রভাবতীর ওপর দোষ দিয়ে হরতাল-ধর্মঘট তুলে নেওয়ার আবেদন করি। কারণ আমাদের টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। অপরদিকে চাঁদাও তোলা হয়নি।

এই ঘটনায় শিক্ষণীয় ব্যাপারটা হলো, আমরা আগে শ্রমিকদের কোনো কথা বললাম না, তাঁদের বুঝালাম না যে, এখন এই সমঝোতা মেনে নেওয়া উচিত। শ্রমিকদের কোনো মত নিলাম না। ঝট করে তাঁদের কাজে যোগদানের কথা বলে দিলাম। ফলে জয়লাভ করা একটি হরতালে আমরা জিতেও হেরে গেলাম। যেখানে বিরাট সংগঠন করার সুযোগ ছিল, তা সবই ভণ্ডুল হয়ে গেল। এক মেটিয়াবুরুজ ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় তখনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এই ঘটনার পর প্রভাবতীর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। হরতালের সময় বাখের আলী মীর্জা নামক একজন অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট প্রভাবতীর সঙ্গে যোগ দেন। তিনি ছিলেন সুন্দর চেহারার হায়দ্রাবাদের এক যুবক, খুব ভদ্র প্রকৃতির লোক। নেহেরু তাঁকে পাঠান। প্রভাবতী নিজে প্রেসিডেন্ট থেকে বাখের আলী মীর্জাকে সেক্রেটারি করে আলাদা জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করলেন। আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক কেটে গেল। আমরা বঙ্কিম মুখার্জীকে প্রেসিডেন্ট করে অন্য ইউনিয়ন স্থাপন করলাম। কালী সেন সেক্রেটারি রয়ে গেলেন। যতদূর মনে পড়ে আবদুর রেজ্জাক খান এবং আবদুল মোমিন এই হরতালে কাজ করেন। কিছুদিন পর প্রভাবতীর ইউনিয়ন আর টিকল না, কারণ তাঁর কর্মী ছিল না। আমাদের ইউনিয়ন টিকে রইল, তবে আমরা চটকল সংগঠন গড়ে তুলতে পারলাম না। প্রভাবতী দাশগুপ্তার শ্রমিক আন্দোলন করাও এখানেই শেষ হয়ে গেল।

এরপর ১৯৩০-এর গোড়ার দিকে আইজিএন-এ হরতাল হয়। এই সময় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কয়েকজন নিম্নমধ্যবিত্ত যুবককে আইজিএন-এর ওয়ার্কশপ ও গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপে ঢুকিয়ে দিলাম। হেম ছিল এই যুবকদের একজন। ওই কোম্পানিতে রাজেন ছিলেন হেড ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। তিনি ছিলেন আমাদের সমর্থক। আমরা হেমকে কাজ শেখাবার জন্য রাজেন বাবুর মারফতে কারখানাতে ঢুকালাম। রাজেন ছিলেন খুব ওস্তাদ মিস্ত্রি। হেম তখন কাজ শিখছে। ক্রংক সাহেব তাঁদের ফোরম্যান। একদিন তিনি কাজ দেখার জন্য কারখানায় ঢুকে দেখলেন—কাজ করছে এটা দেখাবার জন্য হেম হাতুড়ি দিয়ে কী পিটাচ্ছে। ক্রংক এসে বললেন, "কে তোমাকে এ কাজ করতে বলেছে?" সে বলল, "হেড মিস্ত্রি"। হেড মিস্ত্রিকে ডাকা হলো। হেড মিস্ত্রি দেখলেন আমাদের লোক, তিনি বললেন "আমি বলেছি"। তখন ক্ষুব্ধ হয়ে রাজেন বাবুকে ক্রংক বললেন, "তুম মিস্ত্রি নেহি হ্যায়, কুলি হ্যায়।"

রাজেন বাবু খুব জঙ্গি লোক ছিলেন। তিনি বললেন "তুমভি কুলি হ্যায়"। ব্যস্‌ দুজনেরই কাজের সুযোগ্য জবাব হয়ে গেল। এই দুজনকে কাজে নেওয়ার জন্যই শুরু হলো ধর্মঘট। কয়েকদিন স্ট্রাইক থাকে। অবশেষে ওয়ার্কশপ চালানো দায় হয়ে যায়। ফলে কোম্পানি রাজেন বাবু ও হেমকে কাজে নিয়ে নেয়। মন্মথ চ্যাটার্জি ছিলেন রঙের মিস্ত্রি। হরতালে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে কাজ করেন। পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন এবং উচ্চ পদেই উঠেছিলেন। মন্মথের প্রচেষ্টায় সব কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

গরুর গাড়ি ও মহিষের গাড়ির চালকদের ধর্মঘট হয় ১৯৩৯ সালে। এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, আর সেক্রেটারি ছিলেন কমরেড আবদুল মোমিন। কলকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সংস্থার সুপারিশে একটি আইন করা হয় যে, বেলা একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত কোনো গরুর গাড়ি রাস্তায় চলাচল করতে পারবে না। কারণ বলদ ও মহিষের দারুণ কষ্ট হয়। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ও মহিষের গাড়ির গাড়োয়ানরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং অভিনব উপায়ে এই হরতালটি করেন। তাঁরা ৩০/৪০ মণ মাল বোঝাই গাড়ি রাস্তার ওপর রেখে চাকা খুলে নিয়ে যেতেন। খুব ভোরে তাঁরা এই কাজ করতেন। ফলে অন্যান্য গাড়ির যাতায়াতে ভীষণ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। গাড়োয়ানদের ওপর গুলিও চলে। পরে একটা সমঝোতা হওয়ায় এই হরতাল তুলে নেওয়া হয়। এই হরতালের পুরো কৃতিত্ব ছিল গাড়োয়ানদের। অন্য কারো তেমন অংশগ্রহণ ছিল না। গাড়ির মনিবদেরও এতে সাহায্য ছিল।

এরপর গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপে ইউনিয়ন কর্তৃক হরতাল করার কথা স্থির করা হয়। তখন ১৯৩০ সাল। কিন্তু তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলা হয়ে যাওয়ায় পুলিশ অনেককেই খুঁজছে। আমিও গা-ঢাকা দিয়ে আছি। মে মাসের ১ তারিখ থেকে হরতাল হবে। এই সময় গোপনে কার্যকরী কমিটির মিটিং হলো। সেখানে কর্মীরা বললেন, আপনি প্রকাশ্য হয়ে হরতাল না চালালে আমরা স্ট্রাইক চালাতে পারব না। আমি বললাম, আমি বের হয়ে এলেই গ্রেপ্তার হয়ে যাব। হরতাল চালানোর সময়ও পাব না। পরে ঠিক হলো ১ মে হরতাল করতে হবে। ১ মে স্ট্রাইক করে পরের দিন কাজে যোগদান করতে হবে। যদি এজন্য কাউকে ছাঁটাই করে তবে স্ট্রাইক করতে হবে। ১৯৩০ সালের ১ মে গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপে স্ট্রাইক হয়। এখানে আট-দশ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের ১ মে'র স্ট্রাইকের জন্য কাউকেও ছাঁটাই করা বা শাস্তি দেওয়া হয় না। ১৯৩০ সালে এটাই প্রথম মে-ডে স্ট্রাইক। এটা একটা রেকর্ড। মেটিয়াবুরুজে চটকলের সাধারণ ধর্মঘটে শ্রমিকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়া আমরা যতগুলো স্ট্রাইক করেছি

সবগুলোতেই জয়লাভ করেছি। এতে আমাদের জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি বেড়েছে। এখানে একটি ট্রেড ইউনিয়ন বেস গড়ে উঠেছিল। ফিলিপ স্প্রাট, মুজফ্‌ফর আহমদ, অযোধ্যা প্রসাদ এখানে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করতেন।

রাধারমণ মিত্র ও বঙ্কিম মুখার্জী মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন আবদুর রেজ্জাক খান। তিনি ভালো উর্দু জানতেন। তাঁর গলার স্বর ছিল দরাজ, কাজেই সুবিধা হতো। তাছাড়া শামসুল হুদা এখানে এসে সাহায্য করতেন। ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার' আগে এসে সাহায্য করতেন। এছাড়া পরেশ মুখার্জীও সাহায্য করেছিলেন। আমার সঙ্গে থাকত শচী সিংহ ও উপেন সান্যাল। শচী যথেষ্টভাবে সাহায্য করেছেন। উপেন শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে অগ্রসর হতেন না, অন্যান্য কাজ করতেন।

একাত্তর সালে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হবার দুদিন পর প্রথম 'লাল ঝাণ্ডা' ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক এলাকায় আমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

১৯২০ সালের প্রথমদিকে সারা-ভারত শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি গঠিত হয়েছিল। ১৯২৯ সালে নাগপুরের সম্মেলনে এআইটিইউসি বিভক্ত হয়। এই সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। ওই সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। ওই সময় সুভাষ বসু এআইটিইউসির সভায় সভাপতি নির্বাচিত হন। আর দেশপাণ্ডে (সিপি) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দক্ষিণপন্থীরা ওই সভা পরে পরিত্যাগ করেন। ১৯৩১ সালে সুভাষ বসুর নেতৃত্বে কলকাতায় এআইটিইউসির সম্মেলন শুরু হয়। সেখানে দ্বিতীয়বার বিভেদ সৃষ্টি হয়। তখন আমাদের শ্রমিকরা মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক এলাকায় এসে সম্মেলন করেন। এখানে রেড এআইটিইউসির জন্ম হয় ১৯৩১ সালে। পরে অবশ্য নাগপুরেই দুই এআইটিইউসি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এরপরে আবারও বিভেদ হয়ে যায়।

আমি ১৯৩০ সালের ৯ মে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হয়ে যাই। এর পর শচী সিংহ ও উপেন কিছুদিন সেখানে ছিলেন। কিন্তু পরে এঁরা ইউনিয়ন চালাতে পারেননি। শচী চাকরি নিয়ে কার্সিয়াং চলে যান, সেখানে দার্জিলিং পার্টি গঠনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। উপেন সান্যাল সুরেশ ব্যানার্জীর সঙ্গে মিলে কাজ করেন। আমাদের পার্টি ছেড়ে দেন। জেল, ক্যাম্প, অন্তরীণ প্রভৃতির পর আমি ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মুক্তি পেয়ে যাই।

১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষা নিয়ে ১৯২৮ সাল থেকে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যাই। তখন পার্টিতে সভ্যপদ খুবই

সংকীর্ণ ভিত্তিতে দেওয়া হতো। কাজেই আমি শ্রমিক আন্দোলনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করলেও, পার্টির সভ্যপদ তখনো পাইনি। তবে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ আমাকে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস্ পার্টিতে নিয়ে নেন ১৯২৮ সালে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কথা তিনি ঘুর্ণাক্ষরেও বলেননি। জেল থেকে বের হয়ে এলে, আমি পার্টিসভ্য বলে আমাকে জানানো হয়। তখন ১৯৩৭ সাল।

ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস্ পার্টি ছিল একটি বামপন্থী প্রকাশ্য দল। এটা ছিল প্রগতিশীল চিন্তার ব্যক্তিদের একটি দল। এটা কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সংগঠন ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি কলকাতার মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে থাকলেও, তা ছিল সম্পূর্ণ গোপন। বিভিন্ন প্রদেশে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস্ পার্টি গঠিত হয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক পার্টিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার জন্য কলকাতায় একটি সম্মেলন ডাকা হয় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। সোহান সিং যোশ সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট হন। বাংলা প্রদেশের সেক্রেটারি হন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, আর সারা ভারতে সেক্রেটারি হলেন বোম্বের নিম্বকার। তখন সারা-ভারত কংগ্রেস অধিবেশন চলছিল কলকাতার পার্কসার্কাসে। ওই সময়ে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস্ পার্টি একটি মিছিল করে। ওই মিছিল নানারূপ স্লোগান দিয়ে কংগ্রেস প্যান্ডেলের গেট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে।

এরপর শ্রমিকদের তরফ থেকে একটি মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয়—শ্রমিকরা কংগ্রেস প্যান্ডেলে যাবে এবং স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করবে। কারণ তখন কংগ্রেস এক বছরের জন্য ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের (ব্রিটিশ রাজত্বের অধীনে স্বায়ত্তশাসন) প্রস্তাব নেবে বলে ঠিক করেছিল।

এই ব্যাপারে কে সি মিত্রের উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। ঠিক হলো আমি মেটিয়াবুরুজ থেকে শ্রমিকদের সংগঠিত করে আনব। আরো কথা হলো, কিছু জঙ্গি শ্রমিক আনতে হবে। কারণ প্যান্ডেলে সহজে ঢুকতে দেবে না। কথা হলো ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে আমরা সব জড়ো হব। তারপর একযোগে মিছিল করে আমরা কংগ্রেস প্যান্ডেলে যাব। তখন কংগ্রেসের প্রায় সব ভলান্টিয়ার ছিল সন্ত্রাসবাদী বিভিন্ন পার্টির কর্মী। সন্ত্রাসবাদী নেতারা সবাই অফিসার। প্রত্যেকের মিলিটারী কায়দার পোশাক। সুভাষ বাবু ছিলেন সব বাহিনীর জিওসি। তিনিও এইরূপ পোশাক পরিহিত।

মনুমেন্টের সামনে পনের-বিশ হাজার শ্রমিক জড়ো হয়েছে। আমরা দুই লাইন করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পার্ক সার্কাসের কংগ্রেস প্যান্ডেলের দিকে নানা স্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হলাম। আমাকে বলা হলো, "তুমি সাইকেলে মিছিলের আগে আগে অগ্রসর হও।" আমি মেটিয়াবুরুজের জঙ্গি শ্রমিকদের মিছিলের

সামনে প্রথম সারিতে নিয়ে এলাম। পঞ্চাশ-ষাটজন জঙ্গি শ্রমিক। আমরা কংগ্রেসের প্যান্ডেল গেটে গিয়ে দেখলাম, কংগ্রেস ভলান্টিয়াররা গেট বন্ধ করে আগলিয়ে আছে। তাঁরা কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। কিছু বচসা হলো। আমাদের জঙ্গি কর্মীরা কয়েকজন ভলান্টিয়ারের টুপি খুলে ফেলে দিল। তাঁরা বলল, “রাস্তা ছোড়।” একটা মারামারির উপক্রম। আমি শ্রমিকদের শান্ত থাকতে বললাম। আমাদের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মতিলাল নেহেরুর কাছে বার্তা গেল যে, আমাদের কংগ্রেসে যেতে দেওয়া হোক। বেশ কিছুক্ষণ পর মতিলাল নেহেরু এক ঘণ্টার জন্য আমাদের কংগ্রেস প্যান্ডেলে আসবার অনুমতি দিলেন। ফলে সব শ্রমিক প্যান্ডেলে এসে উপস্থিত হলেন।

সেখানে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করে আমাদের সব শ্রমিককে প্যান্ডেল ছেড়ে চলে যাবার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। শ্রমিকরা সব বের হয়ে যাচ্ছেন এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধী একটি সিডান বডি মোটর গাড়ির ছাদে বসে আবির্ভূত হলেন। সব শ্রমিক তাঁকে নমস্কার ও সালাম জানাচ্ছেন এবং বের হয়ে যাচ্ছেন। তখন আমাদের বোম্বের নেতা নিম্বকার যোগলেকারসহ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন, “তুমি শ্রমিকদের বল—হামলোগকো মনসা পুরা হুয়া, আভি ঘর চলা যাইয়ে।” আমি বললাম, “ওই ফ্ল্যাগ স্টান্ড আছে, ওর প্লাটফর্মে যদি উঠতে পারি তবেই কিছু বলা সম্ভব। কিন্তু উঠতে গেলেই ভলান্টিয়াররা আমাকে নামিয়ে দেবে।” তাঁরা বললেন, “আমরা তোমাকে সাহায্য করব।” আমি প্লাটফর্মে উঠছি, তখন ভলান্টিয়াররা আমাকে বাধা দিচ্ছে। এই সময়ে নিম্বকার উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, “সে যাবেই। সে যাবেই। যেতে হবে।” পরে ভলান্টিয়াররা কোনো বাধা দিল না। আমি দেখলাম আমার কয়েক গজ দূরে গান্ধীজীর গাড়ি। তিনি কী কী বলছেন। তবে তা আমিই শুনতে পাচ্ছিলাম না, শ্রমিকরা শুনবেন কি? আমি তারস্বরে (অত্যন্ত উচ্চ) চিৎকার করে বলতে লাগলাম, “হামলোগকো মনসা পুরা হুয়া, আব ঘর চলা যাইয়ে।” কেউ কিছু শুনতে পেয়েছিল কিনা জানি না। সব শ্রমিক গান্ধীজীকে সালাম দিয়ে একে একে বের হয়ে যেতে থাকলেন। কংগ্রেসের ইচ্ছা ছিল গান্ধীজীকে প্যান্ডেলে নিয়ে একটি বক্তৃতা দিয়ে স্বাধীনতার প্রস্তাবকে ভণ্ডুল করে দেওয়া। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। শ্রমিকরা তার আগেই বের হয়ে এসেছিলেন।

শ্রমিকদের এরূপ শৃঙ্খলার সঙ্গে আসা এবং সময় মতো চলে যাওয়ায় দৈনিক পত্রিকাগুলো পরদিন ভূয়সী প্রশংসা করল এবং মন্তব্য করল, “শ্রমিকরা একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রবল শক্তি হয়ে উঠেছে।”

এই ঘটনার পর অনেকদিন চলে গিয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সূচনায় আমাদের কার্যক্রমের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া

হলো। আমাদের দেশে মেহনতি মানুষের আন্দোলন আজও তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। আজও তাঁদের ওপর শোষণ আর জুলুমের অবসান হয়নি।

জনসাধারণের মুক্তির পথ একটাই—শোষণহীন সমাজ বা সমাজতন্ত্র। এছাড়া তাঁদের মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। সেই পথেই শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণকে অগ্রসর হতে হবে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি কোনো পথ নেই। ধনতন্ত্র মানুষকে মুক্তির বদলে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ওই শৃঙ্খল চূর্ণ করে সমাজতন্ত্র আনতে হবে। ধনতন্ত্রের শৃঙ্খল চূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়েই সব মেহনতি মানুষকে অগ্রসর হতে হবে।

টংক

আমি কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে শ্রমিক আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলাম ১৯২৮-এর প্রথমদিকে। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়, তখন ব্রিটিশ সরকার পাগলা কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কে টেরোরিস্ট বা কে কমিউনিস্ট তার কোনো বাছবিচার ছিল না। তখন শত শত রাজনৈতিক কর্মীকে বিনাবিচারে আটক করা হয়। রাজনৈতিক এই পটভূমিতে আমি ৯ মে ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হই। বিভিন্ন জেল, ক্যাম্প প্রভৃতি ঘুরিয়ে এনে আমাকে ১৯৩৫ সালে সুসং-এ নিজের বাড়িতে নজরবন্দী করা হয়। আমাকে থানায় প্রতিদিন বিকেলে হাজিরা দিতে হতো। কিন্তু আমার সুবিধা ছিল যে, আমার যাতায়াতের চৌহদ্দি ছিল অনেক বড়। আমার বাড়ি থেকে আধা মাইল দূরে ছিল কৃষকদের গ্রাম। সেখানে মুসলমান কৃষকরাই বসবাস করতেন। তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হতো। আলোচনা থেকে জানতে পারি যে, টংকের অত্যাচারে কৃষকরা জর্জরিত। তাঁরা অবিলম্বে ওই প্রথার অবসান চান। আমি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলি, “আপনারা যদি সব একজোট হয়ে আন্দোলন করেন, তবে নিশ্চয়ই টংক প্রথা উচ্ছেদ হয়ে যাবে।”

এরই মধ্যে এক জমিদারের জনৈক রাজমিস্ত্রিকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করা নিয়ে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। এই দ্বন্দ্বের ফলে জমিদার আমার নামে আইবিতে এই মর্মে দরখাস্ত দেয় যে, আমি এখানে রাজনীতি করছি। একদিন আমাদের গ্রামে বন্যার সময় হঠাৎ ওই জমিদারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন, “দেখত, আমি ব্যাপারটা কী রকম ম্যানেজ করলাম।” অর্থাৎ তিনি সাত দিনের মধ্যে রাজমিস্ত্রিকে উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—তা তিনি করেননি, জোর খাটাননি। কারণ থানায় একটি শান্তিরক্ষার দরখাস্ত দেওয়া

হয়েছিল। তিনি বললেন, "কিন্তু উত্তেজনার মাথায় তোমার নামে একটি দরখাস্ত দিয়েছিলাম। এটা ঠিক হয়নি, এখন বুঝছি। কিন্তু তীর তো ছেড়ে দিয়েছি, ফল ফলবেই। আইবি নিশ্চয়ই আসবেন।" ঘটনা ঘটল। কিছুদিন পর আইবি এলেন। আমি রাজনীতি করছি বলে জানালেন ও কিছু কাগজপত্র নিয়ে গেলেন।

আমি অনুমান করলাম এবার আমাকে আবার জেলে যেতে হবে। এই সময় নেত্রকোণার এসডিও পাট উৎপাদন কম করার জন্য একটি জনসভা ডেকেছিলেন। আমি ভাবলাম জনতার অজ্ঞাতে জেলে গিয়ে লাভ কী? জনতার মধ্যে প্রচার করে জেলে যাওয়াই শ্রেয়। আমি এসডিও সাহেবের মিটিংয়ে বক্তৃতা করলাম এবং অভিযোগ তুললাম—পাটের নিম্নতম দাম বাঁধা হয় না কেন ইত্যাদি। পাট কম উৎপাদন করার বিষয়ে কিছু বললাম না। শুধু বললাম, "সরকার ৩৫ ভাগ পাট কম বুনতে বলেছে আর আপনি বলছেন ৫০ ভাগ। আমরা কোনটা মানব?" বক্তৃতা ইত্যাদি দেওয়া সরকারি নির্দেশে নিষিদ্ধ ছিল। আমার বিরুদ্ধে মামলা হলো। আমাকে তিন বছরের সাজা দেওয়া হলো। আপিলে দেড় বছর হলো। ঢাকা জেলে সাজা খাটার পর আমাকে নদীয়া জেলার করিমপুর থানার এক গণ্ডগ্রামে অন্তরীণ করা হলো।

১৯৩৬-৩৭ সালে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার দাবিতে জোর আন্দোলন হয়। ফলে আন্দামান বন্দীদের যাঁর যাঁর নিজস্ব প্রদেশের বন্দীশালায় আনা হয়। কথা থাকে, আন্দামান বন্দীরা মুক্তি পাবেন কিনা, তাঁদের স্ব-স্ব প্রদেশের মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেবে। গোটা বাংলাদেশে তখন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অন্যান্য প্রদেশে ছিল কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছিল—সেসব প্রদেশে আন্দামান বন্দীরা মুক্তি পেলেন, কিন্তু বাংলায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছিল না। এখানে ছিল মুসলিম লীগ। তাছাড়া ছিল ইউরোপিয়ান কনস্টিটিউয়েনসির ২৫ জন সভ্য ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউয়েনসির পাঁচজন সদস্য। এই অবস্থায় বাংলায় আটক আন্দামান বন্দীরা মুক্তি পেলেন না। তৎকালীন গোটা বাংলাদেশ সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, যারা বিনাবিচারে বন্দী আছেন, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে বিনাবিচারে আটক এগারশ বন্দীর একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ওই এগারশ বন্দী প্রথম দফায় মুক্তি পান। আমিও এগারশর তালিকার মধ্যে ছিলাম। আমি ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি করিমপুর থানা, নদীয়া জেলা থেকে মুক্তি পাই। আমি মুক্তি পেয়ে কলকাতায় গেলাম, কিন্তু বন্ধু কমিউনিস্টদের কারো দেখা পেলাম না। ওই সময়ে কলকাতা ছাড়া

আর কোথাও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। সেই কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল আত্মগোপনে। আমার কাছে যে রেলওয়ে পাস ছিল—ওই পাস নিয়ে ওইদিনই আমার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলাম—মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য। গ্রামে আসার ২/৩ দিনের মধ্যেই মুসলিম কৃষকরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ৮/১০ জন বয়স্ক মুসলিম কৃষক আমার বাড়িতে এসে বললেন, "খোদার রহমতে আপনে খালাস পাইছেন—আমরা খুব খুশি হইছি। এহন আপনে টংকটা লইয়া লাগুইন। আমরা আর টংকের জ্বালায় বাঁচতাছি না।" আমি তাঁদের বললাম, "আমি কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন করি, মাকে দেখার উদ্দেশ্যে সাত দিনের জন্য বাড়ি এসেছি, কাজেই আমি ফিরে যাব।" তাঁরা বললেন, "এডা হয় না। দেশের ছাওয়াল দেশে থাইক্যা টংক লইয়া লাগুইন। আমরা যাতে বাঁচি তার চেষ্টা করুইন। খোদা আপনার ভালা করব।" আমি তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রতিদিন তাঁরা এসে আমাকে টংক আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ করতে থাকলেন।

চার-পাঁচদিন পর, একদিন রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলাম যে, আমি কি ট্রেড ইউনিয়ন কাজের জন্য কলকাতা যেতে উদগ্রীব? ওই সময়ে মেটিয়াবুরুজে একটি ট্রেড ইউনিয়নের বেস (base) সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ আমরা প্রতিটি শ্রমিক-সংগ্রামে জয়লাভ করেছিলাম। এখানে টংক আন্দোলন করা জটিল ও কঠিন ব্যাপার। কারণ যাঁদের বিরুদ্ধে টংক আন্দোলন করতে হবে, তাঁরা সবাই আমার আত্মীয়। কেবল তাই নয়, আমার নিজ পরিবারেরও টংক জমি আছে। কাজেই সবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। হয়তো এসব কারণে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। এই কথা যখন আমার মনে উদয় হলো, তখন আমার মধ্যে এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো। ট্রেড ইউনিয়ন না টংক আন্দোলন? আমি ভাবতে লাগলাম, আমি যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হই, যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে থাকি, তবে যেখানে আমার এবং আমার পরিবারের স্বার্থ নিহিত রয়েছে—প্রয়োজনে ও আদর্শের জন্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা আমার কর্তব্য। যা অন্যায়, যা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও উচিত। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চেতনা উদ্দীপিত করা ও তাঁদের সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। এইভাবেই দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর করে নেওয়া সম্ভব। এটা আমার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ নিহিত আছে বলে আমি ওই আন্দোলন হতে কখনই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আমার স্বার্থ আছে বলেই আমাকে কৃষকদের নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামে কৃষকদের সাথী হয়ে যদি এই সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমার সঠিক পথে যাত্রা শুরু হবে। এটা আমার জীবনের পরীক্ষার মূল। এই

পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। এই দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে চলতে লাগল; যাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি এমন কোনো বন্ধুও তখন ছিল না। আমার মন ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শই ছিল আমার বড় বন্ধু। আমার দুই দাদা ছিলেন ভিন্ন চেতনা ও চিন্তার মানুষ। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রশ্নই ছিল না। সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় এমন একজন কেউ ছিলেন না যাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারত।

টংক মানে ধান কড়ারি খাজনা। হোক বা না হোক কড়ার মতো ধান দিতে হবে। টংক জমির ওপর কৃষকদের কোনো স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কমলাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দী থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। কেন টংক নাম হলো তা জানা যায় না—এটা স্থানীয় নাম। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ওই সময়ের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। যেমন চুক্তিবর্গা, ফুরন ইত্যাদি। ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও ওই প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসং জমিদারি এলাকায় যে টংক-ব্যবস্থা ছিল, তা ছিল খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হতো সাত থেকে পনের মণ। অথচ ওই সময়ে জোত-জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ওই সময়ে ধানের দর ছিল প্রতি মণ সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হতো এগারো টাকা থেকে প্রায় সতের টাকা। এই প্রথা শুধু জমিদারদের ছিল তা নয়; মধ্যবিত্ত ও মহাজনরাও টংক প্রথায় লাভবান হতেন। একমাত্র সুসং জমিদাররাই টংক প্রথায় দুই লক্ষ মণ ধান আদায় করতেন। এটা ছিল এক জঘন্যতম সামন্ততান্ত্রিক শোষণ।

সুসং জমিদাররা গারো পাহাড়ের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে মনে হয় এই প্রথা প্রবর্তন করেন। জোত-স্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে প্রতি সোয়া একরে একশ টাকা থেকে দুইশ টাকা নজরানা দিতে হতো। গরিব কৃষক ওই নজরানার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ ছিলেন না। টংক প্রথায় কোনো নজরানা লাগত না। কাজেই গরিব কৃষকের পক্ষে টংক নেওয়াই ছিল সুবিধাজনক। টংকের হার প্রথমে এত বেশি ছিল না। কৃষকরা যখন টংক জমি নেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন, তখন প্রতি বছর ওই সব জমির হার নিলামে ডাক হতো। ফলে হার ক্রমে বেড়ে যায়। যে কৃষক বেশি ধান দিতে কবুল করত তাঁকেই অর্থাৎ পূর্বতন বেশি ডাককারী কৃষকের কাছ থেকে জমি ছাড়িয়ে হস্তান্তর করা হতো। এইভাবে নিলাম ডাক বেড়ে গিয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে হার সোয়া একরে পনের মণ পর্যন্ত উঠে যায়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল, আর যেটুকু শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাকেই ভিত্তি করে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, টংক আন্দোলনে আমি সর্বতোভাবে শরিক হব। কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর অভাব হবে না। কিন্তু এখানে কোনো প্রগতিশীল কর্মী নেই। কে এখানে আন্দোলন করবে? এই যে কৃষকদের আন্দোলনে এত উৎসাহ—পরিশেষে সংগঠনের অভাবে সব নিভে যাবে। সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম। কিন্তু আমার মনে কতগুলো প্রশ্ন জমে উঠল—

১. কৃষকদের কি ঐক্যবদ্ধ করা যাবে?
২. পুলিশ এলে কৃষকরা কি ভয় পেয়ে যাবে?
৩. আন্দোলনের ধারা কী হবে?
৪. জমিদারদের পক্ষ থেকে চাপ এলে এঁরা টিকে থাকতে পারবে কি?

আমার নিজের যতটুকু অভিজ্ঞতা ছিল তা দিয়ে বিচার করে দেখলাম—টংকের কঠোর নির্যাতন থেকে এঁরা মুক্তি চায়। কাজেই ঠিকমতো প্রচার-আন্দোলন চালাতে পারলে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব নয়। জমিদারদের চাপ এলে কৃষকরা দলবদ্ধভাবে তার সম্মুখীন হবে-এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু পুলিশ এলে এঁরা কী রূপ ব্যবহার করবে, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে কিনা সে সম্পর্কে আমি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না।

আন্দোলনের ধারা হবে অহিংস—আইনসঙ্গত। কী করতে হবে তা ঠিক করে নিলাম। (১) ধান দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এটাই হবে মূল কার্যধারা। কিন্তু বলতে হবে—আমরা খাজনা দিতে চাই, তা জোত-স্বত্বের নিরিখ মতো দেব। ধান দিয়ে আমরা পারি না, আমরা বাঁচি না। আমরা সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছি। আইনসঙ্গত রাখার জন্যই এইরূপ বক্তব্য বলা দরকার। নচেৎ খাজনা বন্ধের আন্দোলন বলে সরকার এই আন্দোলনকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করতে পারে।

আন্দোলনের আওয়াজ হবে এইরূপ :

১. টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই।
২. টংক জমির স্বত্ব চাই।
৩. জোত-স্বত্ব নিরিখ মতো টংক জমির খাজনা ধার্য করতে হবে।
৪. বকেয়া টংক মওকুফ চাই।
৫. জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ চাই।
৬. সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

আমি এসব পরিকল্পনা স্থির করে ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে একদিন দশাল গ্রামে উপস্থিত হলাম। বয়স্ক কৃষকদের বললাম,

"আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। বৈঠক ডাকেন। টংক আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে। জমিদারদের ধান নেওয়ার আগেই এই আন্দোলন শুরু করে দিতে হবে।"—শুনে কৃষকরা খুব খুশি।

বৈঠকে লোকজন এসে জুটল। আমি বললাম, "আপনারা এই আন্দোলনের সামনে থাকবেন, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।"

কৃষকরা বললেন, "এডা হয় না। আপনে থাকবেন সামনে, আমরা থাকবাম আপনের পাছে। কী করতে হইব কইয়্যা দেন।" আমি বললাম, "আপনারা টংকের অত্যাচারে জেরবার হচ্ছেন, আমি জেরবার হই না। আপনারা জানেন আমারও টংক জমি আছে। আমি মনে করি টংক উচ্ছেদ আপনাদের ন্যায্য দাবি। কাজেই আমি আপনাদের সাথী হয়েছি। আপনারা সামনে, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব—যতদিন না টংক প্রথা উচ্ছেদ হয়।" কৃষকরা এটা মানলেন না। তাঁরা বললেন, "আপনি থাকবেন সামনে, আমরা আপনার পিছে।" আমি দেখলাম, এই পর্যায়ে এটা বুঝানো সম্ভব নয়। পরে এঁরা চেতনাসম্পন্ন হলে বুঝতে পারবেন।

দশাল গ্রামে কোনো হিন্দুর বাস ছিল না। চতুর্দিকের গ্রামেই মুসলমান কৃষকের বাস। কৃষকরা বললেন, "কী করতে হইব, আমাদের বলেন, আমরা তাই করুম।" আমি বললাম, "কাজ হলো সব কৃষককে এক করা; একজোট বাঁধা।" এই কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলেন। একজন কৃষক বললেন, "ব্যাঙরে কি পাল্লায় মাপন যায়, যায় না। কৃষকরাও একজুট হইব না।" আমি বললাম, "মানুষ ব্যাঙ নয়, টংকের ডোলের মধ্যে ভরে মাপতে হবে।" (ডোল মানে যে পাত্রে বা আধারে ধান রাখা হয়)। এর উত্তর তাঁদের কাছে ছিল না, কাজেই তাঁরা নীরব রইলেন। আমি বললাম, "কৃষকদের এক করতে হবে। ধান কেউ এক ছটাকও জমিদারকে দেবে না। ধান দিয়ে দিলে চিৎকার করলেও কিছুই করা যাবে না। জমিদারদের পেয়াদা বরকন্দাজ ২৫/৩০ জন জড়ো হলেও সব গ্রামের সব লোক একত্রে তাদের মোকাবেলা করে বলবেন—আমরা ধান দিয়ে পারি না, আমরা জোত-স্বত্বের নিরিখ মতো খাজনা দেব।" আমি যে পরিকল্পনা ঠিক করেছিলাম তাই তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম। আরো বললাম, "আপনারা গ্রামে গ্রামে যান, আমি বৈঠক করব—এটা জানিয়ে দিন। আর আপনারা মুখে মুখে প্রচার করে আসেন।" এরপর কৃষকরা দিকে দিকে বের হয়ে গেলেন।

আমি বহু বৈঠক-মিটিং করলাম। কৃষকরা টংক আন্দোলনের কথা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে দাবানলের মতো এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে টংক আন্দোলনের কথা ছড়িয়ে পড়ল। কৃষকের আকাঙ্ক্ষা ছিল টংক প্রথা

উচ্ছেদের। কাজেই আগ্রহ ও উদ্যোগ নিয়ে তাঁরা প্রচার করলেন। এত তাড়াতাড়ি এটা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তা আগে আমিও ভাবতে পারিনি।

আমরা মুসলিম এলাকা ছাড়াও ওই সময় উপজাতি এলাকায় প্রচার চালাবার ব্যবস্থা করলাম। ললিত সরকার ছিলেন ধনী কৃষক। কিন্তু তিনি ছিলেন দেশপ্রেমী। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ললিত সরকার ছিলেন হাজং উপজাতির একজন প্রধান ও নেতা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে হাজং, গারো, বানাই, কোচ, ডালু প্রভৃতি উপজাতির বাস ছিল। উপজাতি এলাকায় তিনটি মহকুমার পাঁচটি থানা ছিল আংশিক শাসন-বহির্ভূত অঞ্চল।

আন্দোলন মুসলিম ও উপজাতি এলাকায় সমানভাবেই চলছিল। এই সময় একদিন পুলিশের দল এলো। তারা এসে প্রথমে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করতে লাগল—"তোমরা যখন সব টংক দিতে পারবে না, কিছু কিছু করে দাও।" এর ফলে অনেক কৃষক এটা একটা উত্তম ব্যবস্থা মনে করে কিছু ধান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমি ভাবলাম পুলিশের এই প্রচার যদি সফল হয় তাহলে এই আন্দোলনের বেগ একেবারে শিথিল ও মাটি হয়ে যাবে। আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, "পুলিশের এই প্রচারের ফাঁদে পড়বেন না। পড়লে আর কোনোদিন টংক প্রথা উচ্ছেদ হবে না।" এর ফলে যাঁরা কিছু কিছু ধান দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই বিরত হলেন।

মাঘ মাসে ধান আদায়ের সময় দেখা গেল জমিদাররা এক-চতুর্থাংশের বেশি ধান আদায় করতে পারেননি।

গ্রামে আমাদের নিজস্ব এক টংকদার ছিলেন; তাঁর নাম গুল মামুদ। তাঁর টংক ছিল বছরে ষাট মণ। আমি তাঁকে গিয়ে বললাম, "আমি টংক মকুব করে দিলাম।" লোকটি সৎ প্রকৃতির ও পুরনো ধাঁচের। গুল মামুদ বললেন, "রেজিস্টারি করে টংক এনেছি। আমি যদি টংক না দেই, তবে গুনাহ হবে। উপরে খোদা আছেন। সব তিনি জানেন।" আমি বললাম, "আমি মালিক আমি মকুব করে দিচ্ছি, গুনাহ হবে কেন?" অর্থাৎ আন্দোলনে এ ধরনের লোকও ছিল।

টংক আন্দোলনের ফলে, কি জমিদার, কি মধ্যবিত্ত সমাজ উভয়েই আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাঁরা সবাই আমার বিরুদ্ধে নানারূপ অপবাদ ও মিথ্যা প্রচার চালাতে লাগলেন। বিয়ে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাকে মধ্যবিত্ত সমাজ দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করল। মধ্যবিত্ত সমাজের কটূক্তি ছিল— 'নাইড়াকে (হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মুসলমানদের তাচ্ছিল্য করে নাইড়া বলত)

নিয়ে নাচানাচি আরম্ভ হইছে। ঠ্যাং ভাইঙ্গা যাইব।" কারণ তাঁদেরও টংক জমি ছিল। আমার দুই দাদা আমার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। তাঁদের শ্রেণিস্বার্থে আঘাত লাগায় তাঁরাও আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। জমিদাররা আমার বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা প্রচার করেও কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হলো। একটার পর একটা প্রচারে ব্যর্থ হলেও জমিদারদের একটি প্রচার সফল হয়েছিল। জমিদারের দালালরা এই বলে প্রচার করল যে, শহর থেকে পুলিশ আসছে; শীঘ্রই আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। দালালরা বলল, "মণি সিংহকে ধরে নিয়ে যাবে, আর আপনারা ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।" কৃষকরা এই প্রচারে সত্যই বিভ্রান্ত হলেন। কারণ তাঁদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমাকে বারবার পুলিশ গ্রেপ্তার করে, আমি জেলখাটা লোক—আমি স্বদেশী বিপ্লবী। কৃষকরা একদিন আমাকে বললেন, "আপনেরে কোনদিন ধইরা লইয়া যাইব, তহন আমরা ফাক্কায় পইড়্যা যাইবাম। আপনার লাহান আর কিছু লোক আনুইন।" তাঁদের এই উৎকণ্ঠা দেখে আমি চিন্তা করলাম, অন্য আর কাউকে আনা যায় কিনা।

ফৈজউদ্দিন সাহেব ছিলেন আমাদের সমর্থক। কলকাতায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে। তিনি চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলেন। ময়মনসিংহ শহরে আমি ফৈজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমার সঙ্গে সুসং-দুর্গাপুর যেতে অনুরোধ করলাম। আমি একটি ইশতেহার ছাপানোর জন্যও ময়মনসিংহ শহরে গিয়েছিলাম। ওই ইশতেহারের কপিতে "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক" এই কথাটি লেখা ছিল। তিনি এতে ঘোর আপত্তি তুললেন। কিন্তু আমি তা বাদ দিলাম না। তিনি বললেন, "আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি আপনাকে লোক দিচ্ছি—তাঁর নাম সুসেন সেন। সুসেন সেন কলকাতায় ১৯২৯ সালের জেনারেল জুট স্ট্রাইকের সময় আপনাদের সঙ্গে ছিলেন।" আমি রাজি হলাম। সুসেন সেনকে ডেকে আনা হলো। তিনি বললেন, "আমি যেতে রাজি আছি। কিন্তু সুসং শীতের জায়গা, আমার কোনো শীতবস্ত্র নেই, কীভাবে যাব?" আমার গায়ে পুলওভার ছিল, খুলে তাঁকে দিলাম এবং পরের দিন স্টেশনে যাবার সময় জানিয়ে দিলাম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তাঁকে স্টেশনে পাওয়া গেল না। হায় একেই কি বলে লোকচরিত্র, আর আদর্শনিষ্ঠা! যা হোক ছয় বছর পরে টাঙ্গাইলে এক বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বটে। তিনি বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিলেন।

পরবর্তী সময়ে কিশোরগঞ্জের জ্যোতিষ রায় সুসং গিয়ে আন্দোলনে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া নগেন সরকারও মাঝে মাঝে সুসং-এ গিয়ে আন্দোলনে সাহায্য করতেন। অন্যান্য কিছু প্রগতিশীল লোকও গিয়েছিলেন।

আন্দোলন চলতে লাগল এবং ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করল। ব্রিটিশ সরকার দেখল যে, এসব এলাকায় কখনো ব্রিটিশবিরোধী কোনো আন্দোলন ছিল না।

শুধু সুসং-এ একটি কংগ্রেস অফিস ছিল—সেটাও ১৯৩০ সালে ভেঙে দেওয়া হয়। অথচ এসব এলাকায় কমিউনিস্টরা প্রভাব বিস্তার করছে। বিশেষ করে উপজাতিরা তাঁদের মতে ছিল ব্রিটিশভক্ত। কাজেই তাঁরা সজাগ হলেন এবং ওই এলাকাকে কমিউনিস্টদের প্রভাবমুক্ত করার জন্য টংক সম্পর্কে আশু কিছু করা দরকার বলে অনুভব করলেন।

সরকারের এই উপলব্ধি থেকেই গারো পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচটি থানা—কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি ও শ্রীবর্দীতে জরিপের ব্যবস্থা করা হলো। উদ্দেশ্য জরিপ করে একরপ্রতি কত উৎপাদন হয়, তার হিসাব নেওয়া। জরিপের কাজ সমাধা হলো। কত উৎপাদন হয় তারও হিসাব হলো। এর ফলে টংক ধানের হার বেশিরভাগ জায়গায় অর্ধেক হয়ে গেল। কোনো কোনো স্থানে অর্ধেকেরও কম হলো। তাছাড়া যাঁর বছরে যে টংক খাজনা আছে—তার সমপরিমাণ—বেশির পক্ষে আট কিস্তিতে পরিশোধ করে দিলে জমির স্বত্ব তাঁর হয়ে যাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। পদ্ধতিটি আসলে একটি নজরানা দেওয়ার মতো। যেমন—একজনের যদি বছরে পঞ্চাশ মণ টংক ধান দিতে হয়—তবে ওই অতিরিক্ত পঞ্চাশ মণ আট কিস্তিতে পরিশোধ করে দিলে তার জমির স্বত্ব হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে টংক জমির কোনো স্বত্ব ছিল না। এভাবে টংক প্রথার কিছু সংশোধন করা হলো বটে, কিন্তু টংক প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হলো না। এই সংশোধিত পদ্ধতির প্রবর্তন হলো ১৯৪০ সালে।

দ্বিতীয় মহাসমর

১৯২৮ সালে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন মাত্র চারজন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, কমরেড আবদুল হালিম, কমরেড আব্দুর রেজ্জাক ও কমরেড শামসুল হুদা। ১৯৩৫ সালে সিলেটে, ১৯৩৭ সালে ঢাকায় এবং ১৯৩৮ সালে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলায়ও ওই সময় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। কলকাতায় ছিল প্রাদেশিক কমিটির দপ্তর। সে সময় পূর্ববঙ্গে গোপাল বসাক ছিলেন কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ নেতা। তাঁর বাড়ি ছিল ঢাকা শহরে। তিনি ১৯২৮ সালে ঢাকেশ্বরী মিলে শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করেন। পরে বিখ্যাত 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়' গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পেয়ে তিনি ঢাকায় পার্টি গঠনের উদ্যোগ নেন। সে সময় পার্টি ছিল গোপন সংস্থা। আমরা আধা গোপনভাবে কাজ করতাম। ওই সময়ে কৃষক সমিতিও গঠিত হয়।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আমাদের ওপর হুলিয়া জারি হওয়ায় বিশিষ্ট কর্মীদের সকলের আত্মগোপনে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

১৯৪১ সালের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহ জেলার নেতৃস্থানীয় সব কমরেড গ্রেপ্তার হয়ে যান। কারণ হচ্ছে ওই সময়ে গভর্নর সাহেবের পাহাড়ি অঞ্চল পরিদর্শনে যাওয়ার কথা। যাতে কোনো অবাঞ্ছিত মিছিল প্রভৃতি না হয় এই জন্য এই সতর্কতা। যা হোক, পনের দিন পর আমরা মুক্তি পেয়ে যাই। এরপর আমরা নেতৃস্থানীয়রা আত্মগোপনে চলে যাই।

সরকার থেকে টংক প্রথার যে সংস্কার করা হলো তা আমরা গ্রহণও করলাম না বা বর্জনও করলাম না। তবে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি, কারণ টংক প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হয়নি।

১৯৩৮-৩৯ সালে কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ী মৌলভী আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাতে থাকেন। সে সময়ে আমাদের মধ্যে মুসলমান কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী ছিলেন সংখ্যায় খুবই কম। ধর্ম-ব্যবসায়ী তথাকথিত মৌলভীরা প্রচার করেন, "টংকের দুধ খাওয়াচ্ছে, একদিন বিষ হইয়া ফুট্টা বাইর হইব।" এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক প্ররোচণামূলক প্রচারণা তো ছিলই। এইসব প্রচারে মুসলিম কৃষকরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা আমাকে বলেন, "আমরা যেভাবে আউগ্যাইয়াছিলাম, অখন ওই রকমে আমাদের আউগ্যানি যাইব না। তবে টংক বাতিলের জন্য সবাই আমরা আপনের লগে আছি।" মৌলভীরা দেখলেন, তাঁদের প্রচারের চাইতে আন্দোলনের প্রচার বেশি বাড়ছে; কাজেই তাঁরা প্রমাদ গুনে আমাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত প্রচারের মাত্রা ও তীব্রতা বাড়িয়ে দিলেন। প্রচারের কুফলও কিছু হলো। আমরা যেহেতু আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হলাম, সেই কারণে আমরা এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যাপক প্রচার করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা উপজাতি এলাকায় প্রধানত আত্মগোপন অবস্থায় থাকার ব্যবস্থা করলাম। উপজাতিদের মধ্যে হাজংরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে আত্মগোপনে অবস্থান করা আমাদের পক্ষে অসুবিধা হলো না। আমরা আত্মগোপন অবস্থায় এঁদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত করার চেষ্টা করেছি। ফলে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত হয়েছিলেন। এই এলাকায় মুসলিম কৃষকদের বাড়িতেও থেকেছি।

এখানে একটি ঘটনা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের সুসং থেকে হেঁটে নেত্রকোণা শহরে যেতে হতো। কারণ আমরা আত্মগোপনে ছিলাম। ১৯৪২-এর দিকে আমি নেত্রকোণা যাবার পথে জনৈক মাহতাবউদ্দীনের

বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। এটা নেত্রকোণা যাওয়ার সোজা পথ। রাস্তার পাশেই মাহতাবউদ্দীনের বাড়ি। আমি খুব ভোরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মাহতাবউদ্দীন সাদরে আমাকে গ্রহণ করলেন। মাহতাবউদ্দীন একজন মধ্য কৃষক। তাঁর টংক জমি ছিল। লোকটিও ছিলেন খুব বুদ্ধিমান। তখন বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ মাতব্বর ধরনের লোক। আমি খুব ভোরে সেখান থেকে চলে যাব।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মাহতাবউদ্দীন বললেন, "আমি আজ মুরিদ হব। মৌলভী সাহেব আসবেন।" আমি বললাম, "আগে বলেননি কেন? এখন আমি যাব কোথায়?" আমি ছিলাম বাইরের ঘরে। মুসলিম বাড়ির ভেতরের ঘরে থাকার মতো সামাজিক ও সাংগঠনিক অবস্থা তখনো আমাদের হয়নি, যদিও পরে আমি বহু মুসলিম বাড়ির ভেতরেও আত্মগোপন অবস্থায় কাটিয়েছি। নেত্রকোণায় হাসান সাহেব নামে এক ক্ষেতমজুরের বাড়িতে দীর্ঘ বছর ছিলাম। আমি বললাম, "মৌলভী সাহেব এসে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমার পরিচয় কী? তখন সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে।" মাহতাবউদ্দীন বললেন, "আপনি চিন্তা করেন কেন? আপনেরে কুটের (কোর্টের) পিয়ন বইল্যা কইবাম। আপনের লাগান (মতো) কত কুটের পিয়ন আছে।" আমার এটা ভালো প্রস্তাব বলে মনে হলো। কারণ অন্য কোনো উপায় ছিল না। পরক্ষণেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "নামাজের সময় আমি কী করব?" তিনি উত্তর দিলেন, "কত লুক নামাজ পড়ে না, হেইটা কিছু হইব না।" ওখান থেকে আমার তখন বের হওয়ার অবস্থা নেই। আশপাশের সব লোক আমাকে চেনে। কাজেই মাহতাবউদ্দীনের কথায় বাধ্য হয়ে থাকতে হলো। একটি ছোট ছাপড়া ঘর, একটি বিছানা পাতা আছে, আর ঘরে গোটা দুই ছোট জলচৌকি আছে। আমি জলচৌকিতে বসে আছি।

গোটা তিনেকের সময় মৌলভী সাহেব এলেন। আমি উঠে তাঁকে আচ্ছালামু আলাইকুম দিলাম। তিনি মাহতাবউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইন কে?" মাহতাবউদ্দীন উত্তর দিলেন, "কুটের পিয়ন।" তখন মৌলভী সাহেব তাঁর এক ফুফাত ভাইয়ের নাম বলে তাঁকে আমি চিনি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যা হোক আমি বললাম, "আমি নতুন বদলি হয়ে এসেছি, কাজেই সব লোক চিনে উঠতে পারিনি।" মাহতাবউদ্দীন মুরিদ হয়ে গেলেন। মৌলভী সাহেব আমাকে যুদ্ধের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ঘরে ঢোকার দরজার দিকে পেছন দিয়ে বসে মৌলভী সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। এমন সময় এক বৃদ্ধ কৃষক ঘরে ঢুকে মৌলভী সাহেবকে সালাম জানালেন। আমাকে দেখে আদাব দিয়ে বললেন, "কুনবালা আইছুন?" আমি মহাবিপদ দেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। মাহতাবউদ্দীনকে আস্তে আস্তে ডাকলাম। ওই বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবকে বললেন, "চিনলাইন মৌলভী সাহেব

এইন হইলান মণি সিং। বড় নেতা, তাঁইন আমাদের বাঁচাইছুন। আর আছুইন ফজলুল হক সাহেব—এনাই আমাদের বাঁচাইছুন।” বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবকে কী বলেছে তা আমি মাহতাবউদ্দীনকে বললাম। “রাখখাইন, আমি ঠিক করতাছি,” বলে মাহতাবউদ্দীন ঘরের মধ্যে গিয়ে বৃদ্ধকে এক ধমক দিয়ে বললেন, “বাহুত্তইরা, চোক্ষে দেখুইনা—কারে কী কইন, কিছুই ঠিক নাই” ইত্যাদি। ভীষণ বকুনিতে বৃদ্ধ তো হতবাক, কিছুক্ষণ পরে যেন কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই চলে গেলেন। মাহতাবউদ্দীন বাইরে এসে আমাকে বললেন, “সব ঠিক কইরা দিছি। এখন যাইন, বইনগা।” আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না। আমি পুনরায় এসে জলচৌকিতে বসলাম। আমি মনে করেছিলাম বৃদ্ধকে কড়া ধমক দেওয়াতেও মৌলভী সাহেবকে ভুলাতে পারবে না।

যা হোক পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়েই আমি ভেতরে গেলাম। বিস্ময়ের বিস্ময়—মৌলভী সাহেব আমাকে বললেন, “এই বৃদ্ধ বলে আপনি নাকি মণি সিংহ। আরে মণি সিংহ এখানে আইব কেন, সে হইল বক্তা, তাঁর এখানে আওনের কাম কী? আপনি মণি সিংহকে চেনেন নাকি?” আমার দেহ-মন হতে যেন বিরাট বোঝা নেমে গেল। মৌলভী সাহেব আমাকে চিনতে পারেননি বা সন্দেহই করেননি। আমি বললাম, “না, আমি চিনি না।” এর কিছু পরে আমাকে উপদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। এটা সবার আদায় করা উচিত। এসব উপদেশ বাণী শুনিয়ে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। মৌলভী সাহেব চিন্তা করলেন, মণি সিংহ একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক; তিনি মাহতাবউদ্দীনের বাড়িতে জলচৌকিতে লুঙ্গি পরে বসে থাকবেন কেন? মাহতাবউদ্দীনের কথায় তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। আমি ভাবলাম, সদ্য মুরিদ হয়েছে এরূপ একজন ব্যক্তি আমার অবস্থা গোপন করার জন্য অম্লানভাবে অসত্য বলে গেলেন! এতে প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ হলো যে, আন্দোলনের স্বার্থেই তাঁকে এই বক্তব্য দিতে হয়েছে।

১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় ফ্যাসিস্ট জার্মানি। হিটলার বিপুল সৈন্য নিয়ে ব্লিৎসক্রিগ কায়দায় যে যুদ্ধ চালায়, তাতে তড়িৎগতিতে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করে। প্রথমদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণের মধ্যে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়; আর অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল মহলে ধারণা জন্মে যে, সোভিয়েত দেশ জয় করা হিটলারের আর মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। যুদ্ধের তিনদিন পর কমরেড স্তালিন সব বিশ্ববাসীর নিকট ঘোষণা করেন যে, হিটলারের বাহিনীর প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও সোভিয়েত জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং হিটলারের পরাজয় অনিবার্য। কারণ সোভিয়েত জনগণ দেশপ্রেমিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদী এবং বিশ্বের

প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাকামী জনগণ সোভিয়েতের পক্ষে রয়েছে। সেদিন কমিউনিস্টরা ছাড়া আর কেউই স্তালিনের এই বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। এমন কি যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং যাঁদের বিনাবিচারে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁরা অনেকে হিটলারের বিজয়ে উল্লসিত বোধ করেছিলেন। কারণ হিটলার ভারতের শত্রু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। যা হোক, অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে কিছুদিনের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ফ্যাসিস্টবিরোধী ঐক্য গড়ে ওঠে।

নাজি জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেল। ইতিপূর্বে এই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যের জন্য এক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর যুদ্ধ। নাজি জার্মানি কর্তৃক বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আক্রান্ত হবার পর যুদ্ধের চরিত্র হলো ভিন্নতর। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের জংলিরূপ ফ্যাসিবাদী জোট, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। যুদ্ধে যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরাজয় হয় তাহলে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণি ও মেহনতি মানুষের আন্দোলন পিছিয়ে যাবে। তাঁরা জয়লাভ করলে এই আন্দোলন অগ্রসর হবে, প্রশস্ত হবে ঔপনিবেশিক দেশগুলোর স্বাধীনতার পথ, পরাজিত হবে সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে জংলি অংশ। কাজেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে জয়লাভ করে তার জন্য চেষ্টা করা বিশ্বের সব দেশের শ্রমিকশ্রেণি ও প্রগতিশীল জনগণের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত হলো। অতএব সঠিক পদক্ষেপ হিসেবেই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে গুণগত পরিবর্তনের জন্য এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করা হলো।

এই অবস্থার পূর্বে আমি পাহাড়ি এলাকা থেকে জুলাই মাসের দিকে শেরপুর গেলাম। শেরপুর থেকে আমি ও প্রমথ গুপ্ত সাইকেলে জামালপুর গেলাম। শহর থেকে মাইলখানেক দূরে ছোট নদীর পাড়ে একটি বাড়ি। আমরা সে বাড়িতে এসে উঠলাম খুব ভোরে। নদীটিতে জল ছিল কম। নদীটির অপর পাড়ে আমরা যাঁর বাড়ি গিয়ে উঠলাম—তিনি ছিলেন যুবক, বালিকা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। ওই বাড়িতে আমাদের যাওয়ার পূর্বে অনেক গোপন-কর্মী যাতায়াত করত। কিন্তু ওই মাস্টারের সঙ্গে আগে থেকেই আইবির যোগাযোগ ছিল। সেদিন ওই মাস্টার আইবিতে খবর দিয়ে দেয়। সকাল আটটার মধ্যে পুলিশ ও আইবি ওই বাড়ি ঘেরাও করে। তবে আইবি আমাকে চিনতেন না। তিনি আমার নাম ছাড়া বহু লোকের নাম করলেন। কিন্তু আমার নাম করলেন না। আমি একটি নাম ও ঠিকানা স্থির করে রেখেছিলাম। প্রমথ গুপ্ত কতকগুলো গোপন কাগজ টিনের ঘরের সিলিংয়ের মধ্যে রেখেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ পুলিশের

হাওলাদার ওগুলো দেখে ফেলে। প্রমথ আইবিকে বললেন, "আমার নাম প্রমথ গুপ্ত, কোথায় যেতে হবে চলুন।" আইবি বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি আমাকে চেনেন কিনা? মালিক বললেন, "না, আমি চিনি না"। আইবি বললেন, "অচেনা লোককে জায়গা দিয়েছেন কেন?" আইবি ঘোড়ার গাড়িতে করে এসেছিলেন। আমাদের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে গেলেন। দেখা গেল, থানার কেউ আমাকে চেনেন না। তবু আমাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে কলমাকান্দা থানার (পাহাড়ি এলাকার) দারোগা সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতেন। তিনি আমার পরিচয় সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আমাকে তিনি অনেক উপদেশও খয়রাত করলেন। বললেন, "কী সংগঠন আছে আপনাদের এখানে? পাহাড়ি অঞ্চলে থাকলে কেউ আপনাকে ধরতে পারত না কোনোদিন।" যা হোক, আমাকে নেত্রকোণায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে আমার নামে আইনভঙ্গের মামলা করা হবে।

আমার ওপর নির্দেশ (অর্ডার) ছিল এরূপ—আমাকে বাড়িতে থাকতে হবে এবং অন্য কোথাও যেতে পারব না ইত্যাদি। কিন্তু গোল বাঁধল ওই নির্দেশনামা ছয় মাস পরপর নতুন করে জারি করতে হবে। যাঁর নামে নির্দেশনামা জারি হয়েছে তাঁকে যদি বাড়িতে পাওয়া না যায়, তবে তাঁর বাড়িতে ওই নির্দেশনামা কোথাও টাঙিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আইবি এরূপ কোনো নির্দেশনামা ছয় মাস পরে আমার বাড়িতে টাঙায়নি। ওই নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে, এরূপ কোনো সাক্ষীও ছিল না। এসডিও ছিলেন একজন অবাঙালি আইসিএস অফিসার। তিনি আমার উকিলকে বললেন, "তোমার ক্লায়েন্ট যদি দুঃখ প্রকাশ করে তবে আমি ছেড়ে দেব।" আমি আমার উকিলকে বললাম, "আমি কখনই দুঃখ প্রকাশ করব না।" সেই সময় এসডিও-কে আইবি অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখা গেল। তিনি আমাকে এক মাসের জেল দিলেন। আইনের বিধান না থাকলেও, আমাকে জবরদস্তি করে জেল দেওয়া হলো। এসডিও জেলখানায় এসে বললেন, "আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আপনাকে আমি এই জেল থেকে অন্যত্র পাঠাব না। আপনার যা প্রয়োজন আমাকে জানাবেন, আমি ব্যবস্থা করব।"

১৯৪২ সালে জেল থেকে বের হওয়ার পর আমাকে আর বিনাবিচারে আটক রাখা হলো না। আমি মুক্তি পেলাম। এ দিকে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে পরিস্থিতির কারণে কমিউনিস্ট পার্টি আইনসম্মত হয়েছে। ভারত সরকার পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।

আমি মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরই নেত্রকোণা শহরে একটি ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন হয়। তাতে কলকাতা থেকে বঙ্কিম মুখার্জী, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু

ও মণিকুন্তলা সেন আসেন। কুমিল্লার বড় মিয়া (ইয়াকুব মিয়া) ওই সভার সভাপতি ছিলেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু আমরা তাতে শরিক হইনি। আমরা ঘোষণা করলাম—সব শক্তি দিয়ে এই মুহূর্তে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাই প্রাথমিক ও আশু কর্তব্য। কারণ ফ্যাসিবাদই হলো এখন দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু। মধ্যবিত্ত সমাজ ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে আমাদের 'জনযুদ্ধের' নীতির তাৎপর্য ও যুক্তি গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে আমরা মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমাদের 'জনযুদ্ধের' নীতি যে সঠিক ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর প্রমাণ বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিই। ফ্যাসিস্ট জার্মানি যদি একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে পর্যুদস্ত করতে পারত—তাহলে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণি ও নিপীড়িত জনগণের মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা বহুকালের জন্য ধূলিসাৎ হয়ে যেত।

প্রকাশ্য কাজের সুবিধা পাওয়ায় আমরা ময়মনসিংহ জেলায় পার্টি গড়ে তোলার বিশেষ চেষ্টা করলাম। জেলা কমিটি এই সময় পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হয়ে উঠল। এই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা বেশ জোরেশোরে আরম্ভ করা হলো। বিশেষত হাজং এলাকার কর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক ক্লাস শুরু করা হলো। এর ফলে হাজংদের মধ্যে নেতা তৈরি হলো, কর্মী সৃষ্টি হলো, ভলান্টিয়ার সংগঠিত হলো। এই এলাকায় আমি ছাড়া আর মাত্র তিনজন মধ্যবিত্ত নেতা ছিলেন। লেংগুরা এলাকায় কমরেড ভূপেন ভট্টাচার্য, হালুয়াঘাট এলাকায় কমরেড প্রমথ গুপ্ত, নালিতাবাড়ি এলাকায় কমরেড জলধর পাল। কমরেড রবি নিয়োগী রাজনৈতিক ক্লাস করার জন্য পাহাড়ি অঞ্চলে যেতেন।

আধা গোপন ও আধা প্রকাশ্য অবস্থায় প্রথম জেলা কমিটি গঠনের সময় কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও কমরেড ধরণী গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটিতে তখন সভ্য ছিলেন—খোকা রায়, পুলিন বক্সী, মণি সিংহ, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, রবি নিয়োগী, পবিত্র শঙ্কর ও আলতাব আলী—এই সাতজন। যুদ্ধের সময় রবি নিয়োগীর জায়গায় প্রমথ গুপ্তকে জেলা কমিটিতে নেওয়া হয়। খোকা রায় সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। কিছুদিন পর খোকা রায়কে প্রাদেশিক কমিটির সংগঠক করার ফলে তিনি কলকাতায় চলে যান। এরপর সেক্রেটারি হন পুলিন বক্সী। পুলিন বক্সী সেক্রেটারি হওয়ার সময় আমাকে বলেন, "আপনি থাকতে আমি কি সেক্রেটারি হব?" আমি তাঁকে বোঝালাম, "আপনি সেক্রেটারি থাকেন, আমি তো আছিই, কোনো অসুবিধা হবে না।" কিছুদিন

পর পুলিন বক্সীকেও প্রাদেশিক কমিটির সংগঠক করা হয়। তখন আবার সেক্রেটারি নির্বাচনের প্রশ্ন আসে। মিটিংয়ে সুনির্মল সেনের নাম আমি প্রস্তাব করি। খোকা রায় কলকাতা চলে যাবার পর সুনির্মল সেনকে জেলা কমিটিতে নেওয়া হয়েছিল। কমরেডরা বলেন, "আপনি দায়িত্ব হতে পিছিয়ে থাকতে চান, এটা কমিউনিস্টসুলভ নীতি নয়। আপনাকে সেক্রেটারি হতে হবে।" ফলে আমি সেক্রেটারি নির্বাচিত হলাম। ১৯৪৩ সালে সুসং-এ জেলা কমিটির সম্মেলন হয়। সেখানে কমিটি আরো বর্ধিত হয়।

১৯৪৩ সালে বোম্বেতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলার প্রতিনিধি ছিলেন দুজন। পুলিন বক্সী তখন সেক্রেটারি। তিনি এবং অপরজন ছিলাম আমি।

আমি বললাম, "না আমি যাব না, জহুরউদ্দীন মুন্সীকে পাঠাতে হবে। তিনি নবাগত। তাছাড়া তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা যেমন আছে, ঠিক তেমনই ইংরেজি শিক্ষায়ও তিনি শিক্ষিত। খুব সৎ ব্যক্তি। তাঁকে পাঠালে আরো উৎসাহিত হয়ে আসবেন।" যা হোক, তাঁকেই পাঠানো হলো। তখন আমাদের দলে শিক্ষিত মুসলিম নেতা ছিলেন খুব কম। দুঃখের বিষয় কমরেড জহুরউদ্দীন মুন্সী আজ আর বেঁচে নেই। তিনি ছিলেন ভালো বক্তা, তাঁকে আমরা বিভিন্ন জেলায় বক্তা হিসেবে পাঠিয়েছি।

১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জ শহরে জেলা কৃষক সভার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলে প্রায় পাঁচশ কৃষকের এক ঐতিহাসিক মিছিল প্রায় সত্তর মাইল পথ হেঁটে কিশোরগঞ্জে আসে। এটাই ছিল আমাদের প্রথম কৃষক র‍্যালি। অবশ্য রাস্তায় খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। যা হোক, কিশোরগঞ্জের ওই সভায় মুসলিম লীগ নানাভাবে আমাদের বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ওই বাধা অতিক্রম করে কিশোরগঞ্জ শহরে সুষ্ঠুভাবে আমাদের সম্মেলন সম্পন্ন হয়। ওই সম্মেলনে রাশিয়ান মেয়ে তাতিয়ানা সাহা বক্তৃতা করেন।

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অবিভক্ত বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে এক সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ হয়। এটা ছিল মনুষ্যসৃষ্ট, বিশেষত ব্রিটিশের। ওই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় অকালে মৃত্যুবরণ করে। ময়মনসিংহ জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। সে এক করুণ দৃশ্য। আমরা ময়মনসিংহ শহরে লঙ্গরখানা খুলে একবেলা খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতার তুলনায় আমাদের ওই লঙ্গরখানা ছিল নগণ্য। সুখের বিষয় পাহাড়ি অঞ্চলকে ওই দুর্ভিক্ষের ছোবল স্পর্শ করতে পারেনি। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায়ও বহু লঙ্গরখানা চালু করা হয়।

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন ১৯৪৩

১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জে জেলা কৃষক সম্মেলনের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য আর কোনো সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে পুনরায় জেলা কৃষক সম্মেলন সুসং-দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশিষ্ট নেতা মণিকৃষ্ণ সেন সভাপতি ছিলেন, আর প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত নেতা ভবানী সেন। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য জনসভায় হিন্দু-মুসলমান, উপজাতি মিলে ছয়-সাত হাজার মানুষ সমবেত হন। টংক সংস্কার নয় সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদের দাবি জানানো হয় এই সম্মেলনে।

নালিতাবাড়ির আশপাশেই উপজাতিদের বাস, উত্তরে গারো পাহাড়। নালিতাবাড়ির পাশে গারো পাহাড় থেকে আগত ভোগাই নদী। পাহাড়ি অঞ্চলে পাঁচ বছর একটানা কাজের ফলে এখানে পার্টি সাংগঠনিক দিক দিয়ে কিছুটা শক্তিশালী হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নালিতাবাড়িতে ১৯৪৩ সালে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন ডাকা হয়। নালিতাবাড়ি ছিল দুর্গম স্থান। জামালপুর স্টেশন থেকে ২৮ মাইল, আর পিয়ারপুর স্টেশন থেকে ১৮ মাইল দূরে। শেরপুর থেকে গরুর গাড়িযোগে ১৪ মাইল আসা সম্ভব হলেও পিয়ারপুর থেকে হেঁটে আসতে হতো।

অধিকাংশ প্রতিনিধিকে হেঁটে আসতে হয়েছিল। সব প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১৬৯। তাছাড়া ছাত্রসমেত শতাধিক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার অভিজাত পরিবারের কমরেড কমল বোস নালিতাবাড়ি আসার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমি ভলান্টিয়ারদের ট্রেনিং দেব।" আমি তাঁকে বললাম, "নালিতাবাড়ির পথ খুব দুর্গম এবং সেখানে খুব কষ্ট করে থাকতে হবে।" তিনি তাতেও রাজি। কমল প্রায় তিন মাস বেশ কষ্ট স্বীকার করে নালিতাবাড়িতে ভলান্টিয়ার ট্রেনিং দেন। হাজার চারেক ভলান্টিয়ারকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই প্রথমবার ভলান্টিয়ারদের মাথায় লালটুপি ও হাতে লাঠি ছিল। পরবর্তীকালে এই লালটুপি প্রচলিত হয়ে গেল।

নালিতাবাড়িতে মধ্যবিত্ত কর্মী ছিলেন জলধর পাল, শচী রায়, রাজেননাথ, শিবাজী মুখার্জী, জিতেন মৈত্র আরো অনেকে। নারীদের মধ্যে ছিলেন জ্যোৎস্না নিয়োগী, তুলসী বক্সী, বেলা (পাল) আরো অনেকে। জুঁইফুল রায়ও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কৃষক কর্মীরা ছিলেন নামেশ্বর, বিরাট, যতীন,

মস্কো, দিগেন্দ্র, পরেশ সরকার, ললিত সরকার প্রমুখ। নালিতাবাড়ির এক কৃষক কর্মীকে সকলে মস্কো নাম দিয়েছিল। কেননা একই নামে দুজন কর্মী ছিলেন। এঁরা বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষক সমাবেশে সাহায্য করেন। জেলা নেতৃত্ব থেকে এখানে উপস্থিত ছিলেন খোকা রায়, আলতাব আলী, মণি সিংহ, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ও আরো অনেকে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল আসে। প্রকাশ্য সভায় হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি মিলে দশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। কৃষক সভার সভাপতিমণ্ডলীর সভ্য ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জী, সৈয়দ নৌসের আলী, প্রমথ ভৌমিক, হাজী দানেশ। বঙ্কিম মুখার্জী জনসভায় দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতায় সবাই উদ্বুদ্ধ হয়।

সম্মেলন-মণ্ডপের নাম রাখা হয় 'কায়ুর নগর'। মালাবারের কায়ুর গ্রামের কৃষক সন্তান মাদাতিন আঙু, কুইজ্জা মধু, আবুবকর, চিরুকুন্দন—এঁদের ফাঁসির হুকুম হয় এবং তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁদের স্মরণে এই শহরের নামকরণ করা হয়েছিল 'কায়ুর নগর'। একটি তোরণের নাম পাঁচগাঁয়ের ত্রিলোচন হাজংয়ের নামানুসারে 'ত্রিলোচন তোরণ' রাখা হয়। শেরপুরের নীলমণি বক্সীর নামে 'নীলমণি তোরণ' রাখা হয়। সাহিত্যিক শহীদ সোমেন চন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়। এর নাম রাখা হয় 'সোমেন চন্দ প্রদর্শনী'। এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক গোপাল হালদার।

এখানে যেসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয় সেগুলো হচ্ছে টংক প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ; খাদ্য সমস্যা ও সংগঠন সম্পর্কিত আলোচনা, উৎপাদন বৃদ্ধি করা, তে-ভাগা প্রভৃতি।

১৯৪৪ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমার করিমগঞ্জে মহামারী দেখা দেয়। কবর দেওয়ার লোকেরও অভাব দেখা দেয়। আমরা ওখানে পিপলস্‌ রিলিফ কমিটির সাহায্যে ডাক্তারখানা খুলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। ফলে মানুষের পীড়ার কিছু উপশম হয়। এতে করিমগঞ্জ ইউনিয়নে আমাদের সংগঠনও গড়ে ওঠে। জমিয়ত আলী ওই সময় পার্টিতে আসেন।

১৯৪৪ সালে একবার ময়মনসিংহ শহরে চালের মূল্য খুব বৃদ্ধি পায় এবং অত্যন্ত অভাব দেখা দেয়। অসাধু মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা ওই অভাব সৃষ্টি করে। আমরা সরকারের অনুমতি নিয়ে শেরপুর এলাকা থেকে দুইশ মণ চাল এনে পার্টি অফিস থেকে অল্প অল্প পরিমাণে বিক্রি করতে থাকি। ফলে চালের অভাব কমে যায়। মজুতদাররা তখন আর সুবিধা করতে পারেনি।

দীঘাবিল

১৯৪৪ সালের একটি ঘটনা। সুসং-দুর্গাপুরের দুই মাইল দূরে একটি বিল—দীঘাবিল। ওই বিলের আশপাশের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীরা প্রায়ই বিলটি সংস্কার করার জন্য বলত। বিলের পানি আটকে থাকাতে ফসলের ক্ষতি হয়। আমরা মনে করলাম বিলটি সংস্কার করা প্রয়োজন। জনসাধারণকে বোঝানো দরকার যে, কমিউনিস্টরা জনগণের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়। আমরা আলাপ-আলোচনা করে বিলটির পানি সরানোর ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রায় তিনশ লোক কোদাল নিয়ে আসল। মাটি কেটে তিন হাত চওড়া একটা ড্রেনের মতো তৈরি করা হলো। ড্রেনের শেষের দিকে নাজিরপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটি কাটতে হলো।

সকাল থেকে শুরু করে বিকেলের মধ্যেই কাজ সমাধা হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই সন্ধ্যার সময় বাড়ি চলে গেল। ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার পার্টির নেতৃবৃন্দ এই কাজে যোগদান করেন। কমরেড রবি নিয়োগী আরেকজন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে দুই-আড়াই মাইল দূর হতে কাঁধে করে রান্নার জন্য লাকড়ি কিনে নিয়ে আসেন। সুসং-দুর্গাপুরের জমিদারদের মধ্যমপক্ষ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা কাটার জন্য কমরেড ললিত সরকার ও আমার বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং আদালতের রায়ে আমাদের সাতশ টাকা জরিমানা করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ারের সাক্ষ্য আমাদের পক্ষে ছিল। কিন্তু আদালত তা বিশ্বাস করেনি। আমরাও আর ওই জরিমানার টাকা দেই না। আমাদের পক্ষে উকিল ছিলেন তখনকার উদীয়মান আইনজ্ঞ শ্রী দেবেশ ভট্টাচার্য। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন।

নেত্রকোণায় সারা-ভারত কৃষক সম্মেলন

১৯৩৮ সালে বিশিষ্ট আইনজীবী কামিনী দত্তের উদ্যোগে কুমিল্লায় প্রথম সারা-ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন থেকে কৃষক সমিতির উদ্যোগে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ১৯৪৫ সালে বাংলায় ফের কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা আলোচিত হয়। বিখ্যাত

কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ প্রাদেশিক কমিটির এক সভায় প্রস্তাব দেন যে, সারা-ভারত কৃষক সম্মেলন বাংলায় করতে হবে। তিনি বলেন "আমি মনে করি একমাত্র ময়মনসিংহ জেলাই এ ভার নিতে পারে। অবশ্য আমরা সবাই সাহায্য করব।" আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "আপনি দায়িত্ব নিন।" আমি বললাম, "আমি এজন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি, আমাদের কমিটিতেও এটা আলোচিত হয়নি।" তিনি বললেন, "এরপরে আলোচনা করবেন। আমি বিশ্বাস করি আপনারা এটা পারবেন। অন্য কোনো জেলা এখন পারবে না।" অবশেষে আমি রাজি হলাম।

ময়মনসিংহ এসে জেলা পার্টির সভা ডেকে আলোচনা করলাম। তাতে আলতাব আলী বললেন, "সম্মেলন ময়মনসিংহ শহরে করা হোক।" আমি এর বিরোধিতা করে বললাম, "ময়মনসিংহ শহরে আমাদের তেমন কোনো সংগঠন বা ভিত্তি (base) নেই। এখানে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে কৃষকদের আসা খুব কঠিন। নেত্রকোণা শহরে করলে আমরা পাহাড়ি অঞ্চল থেকে কৃষকদের র‍্যালি (শোভাযাত্রা) করতে পারব। তাছাড়া নেত্রকোণা শহরের কাছে গ্রামে মুসলিম কৃষকদের মধ্যে আমাদের প্রভাব রয়েছে। এখানে র‍্যালি হলে তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে।" এখানে বালি গ্রামের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা যায়। এটা ছিল একটি বড় মুসলিম গ্রাম। এখানে আন্দামান ফেরত শচীন হোমের বাড়ি। আমি তাঁকে শচীন দা বলে ডাকতাম। সম্মেলনে তারক, উমেশ সরকার, হান্নান মৌলভী প্রমুখের সাহায্য পাওয়া যাবে। যদিও কয়েকজন মাত্র পার্টির সভ্যপদ লাভ করেছিল। কাজেই নেত্রকোণায় সম্মেলন করলেই সুবিধা হবে। উল্লেখ্য, পরে এই গ্রামের ক্ষেতমজুর হাসানের বাড়িতে আমি বহু বছর আত্মগোপন অবস্থায় ছিলাম। পরে নেত্রকোণায়ই সারা-ভারত কৃষক সম্মেলন করা হবে বলে স্থির করা হলো।

এবার ওই সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব ও প্রকাশ্যসভা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছু বলব। নেত্রকোণা শহরের নদীর অপর পাড়ে প্রায় ১০০ একরের একটি মাঠ শ্রী যোগেন তালুকদারের নিকট থেকে নেওয়া হলো। এই মাঠের নাম ছিল নাগরার মাঠ। তিনি খুশি মনে মাঠটি সম্মেলনের কাজে ব্যবহারের জন্য দিলেন। ওই জমির কিছু দূরে তাঁর বাড়ি। সেখানে সব নেতা থাকবেন এটাও তিনি বললেন। সারা-ভারত সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য আমরা ১২৫ জন ভলান্টিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আনালাম। তাঁরা সভাস্থলে বেড়া দেবে, মঞ্চ তৈরি করবে, তাছাড়া হাসপাতাল বানাবে। এসব কাজে তাঁদের লাগানো হলো। আমরা আশপাশের গ্রাম থেকে শত শত বরাক বাঁশ চেয়ে আনলাম। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ৫০ হাজার ডলু ও তরুই বাঁশ আনা হলো। খুশি মনে কৃষক ভাইয়েরা ও জনসাধারণ বাঁশ ইত্যাদি দিলেন। এক বাঁশের শহর তৈরি

হতে লাগল। ২৫টি টিউবওয়েল পোতা হলো। ৫০০ হ্যাজাক লাইট বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হলো। মাড়োয়ারি রিলিফ কমিটি আমাদের অনুরোধে হাসপাতালের খরচ বহন করতে রাজি হলো। গুদামঘর করা হলো। বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষক ও জনসাধারণ চাল দিয়ে এবং অন্যভাবেও সাহায্য করলেন। চাল এনে গুদামে জমা করা হতে লাগল। লাকড়ির জন্য জেলা বোর্ডের রাস্তার দুই পাশের গাছ থেকে ডাল কাটার অনুমতি আনা হলো। আমরা নদীর উপর তিনটি পুল বানালাম (এখন অবশ্য নদীর উপর পাকা পুল হয়েছে, আগে ছিল না)। এই সকল পরিকল্পনায় ছিলেন অজিত মিত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে কমরেডরা সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁদের প্রতিদিন প্রচারকার্যে লাগানো হলো।

ব্যাপক প্রচার কাজ যখন চলছে তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ থেকে দুটি ইশতেহার বিলি করে ওই সভায় জনগণকে যোগদান করতে নিষেধ করা হলো। বিশেষত মুসলিম লীগ বাধা দিলে আমাদের খুব অসুবিধায় পড়তে হবে; কাজেই আমরা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলাম। ওই সময় আমাদের সমর্থক উকিলরা বললেন, "আপনি মুসলিম লীগের নেতা উকিল কবিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আপনার বক্তব্য বলেন।" আমি কবিরউদ্দীন সাহেবের কাছে গিয়ে আমার বক্তব্য বললাম। বললাম যে, "আমরা টংক উচ্ছেদের আন্দোলন করছি—এটা আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়।" কবিরউদ্দীন সাহেব ভালো লোক ছিলেন। তিনি বললেন, "আপনারা সভা করুন, আমরা কোনো বাধা দেব না।" আমি কংগ্রেসের নেত্রকোণার প্রেসিডেন্ট শ্রীশ ধর মহাশয়ের সঙ্গেও আলাপ করলাম। তিনিও ছিলেন একজন উকিল। তিনি বললেন, "যাও তোমরা সারা-ভারত সম্মেলন করতে পার, আমরা আর কিছু করব না, দূর থেকে দেখব।"

উল্লেখ্য, এই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমর্থক নেত্রকোণার উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল। এটা হলো কংগ্রেস নেত্রকোণায় সারা-ভারত সম্মেলন করতে পারেনি, পারেনি মুসলিম লীগও। অথচ কমিউনিস্টরা সারা-ভারত সম্মেলন করছে, আমরা এতে বাধার সৃষ্টি করে আর ব্যর্থতার বোঝা বৃদ্ধি করি কেন? বরং সারা-ভারত থেকে প্রতিনিধিরা এসে অসুবিধায় পড়লে নেত্রকোণার বদনাম হবে। অতএব, কেউ নেত্রকোণার বদনাম হতে দিতে রাজি নন। এখন সবারই সুমতি হয়েছে। এই আবেগে নেত্রকোণা শহরবাসীর মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। ফলে আমাদের খুব সুবিধা হয়ে গেল। বাধা তো দূর হলোই, অধিকন্তু নেত্রকোণার মধ্যবিত্ত সমাজ আমাকে বলল যে, "আমাদের বাড়ি আপনার জন্য খোলা রইল। আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

সম্মেলনের কিছুদিন আগে জুঁইফুল রায়ের নেতৃত্বে একদল নারীকর্মী গ্রামে গ্রামে নারীদের মধ্যে প্রচারে বের হয়ে গেলেন। এই সময় আমার দিদি নির্মলা সান্যালও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে প্রচারের কাজে অংশগ্রহণ করেন। নির্মলা সান্যাল ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির মেদিনীপুর জেলা কমিটির সভ্য। সম্প্রতি তাঁর প্রয়াণ হয়েছে।

বিপুল সংখ্যায় নেত্রকোণা শহরবাসী তখন কৌতূহলী মন নিয়ে প্রতিদিন আমাদের প্রস্তুত করা পুলের ওপর দিয়ে 'কমিউনিস্টদের বাঁশের শহর' বানানো দেখতে যেতেন। লাকড়ির পাহাড় দেখে এঁরা মন্তব্য করলেন,"এত লাকড়ি এঁরা কী করবে? এতে তো গোটা নেত্রকোণা শহর পুড়িয়ে দেওয়া যায়।" অর্থাৎ সম্মেলনের আয়োজনের বিশালতা দেখে এঁরা সবাই বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও বিব্রত বোধ করছিলেন।

কৃষ্ণনগর (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে লক্ষ্মীপাল নামে একজন কারিগর এসে আট ফুট উঁচু একটি মূর্তি তৈরি করলেন—'হৃদয়' নামে আমাদের এক হাজং কমরেডের আদলে। মূর্তিটি এভাবে গড়া হলো যে, হাতের শৃঙ্খল ভেঙে গেছে বটে, কিন্তু পায়ের শৃঙ্খল এখনো রয়েছে। এই অতুলনীয় অর্থবহ ভাস্কর্য-শিল্পের দর্শকমাত্রই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। প্যান্ডেলের সম্মুখে একটি প্রদর্শনীও খোলা হলো। সভামঞ্চ তৈরি করলেন নেত্রকোণার কুশলী কারিগররা। এটা যেমন বৃহৎ তেমনি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছিল।

পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচার চলছে কৃষক সভা ও সারা-ভারত সম্মেলনের। সেখানে সবার মধ্যে এমন উৎসাহ এবং এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, নারী-পুরুষ সবাই সভায় আসবেন। বাড়িতে কেউই থাকবেন না। পরে এ বিষয়ে আলোচনা হলো। আমি বুঝিয়ে বললাম বৃদ্ধরা বাড়িতে থাকবেন আর নারী-পুরুষরা সভায় আসবেন। মোটকথা চারদিকে উৎসাহ-আবেগের আর সহযোগিতা-সহৃদয়তার এক বিশাল তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথমে ঠিক হলো ভারতখ্যাত কৃষকনেতা স্বামী সহজানন্দ হবেন সভাপতি, আর কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। কিন্তু স্বামী সহজানন্দ কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করলেন। ফলে সভাপতি হলেন মুজফ্‌ফর আহমদ, আর আমি হলাম অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি।

কলকাতা থেকে পার্টি কর্তৃক দুজন হিসাবরক্ষক পাঠানো হয়েছিল—হিসাব প্রভৃতি রাখার জন্য। তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। রেজগির অভাব প্রচণ্ড। এটা কীভাবে সমাধা করা যায় তা নিয়ে আমরা দোকানদারদের সঙ্গে আলাপ করলাম। আমরা বললাম, "আমরা কাগজে এক আনা, দুই আনা, চার আনা, আট আনা ছাপিয়ে অভ্যর্থনা কমিটির সিলমোহর করে দেব। আপনারা এগুলো

পেলে রেখে দেবেন এবং সন্ধ্যার পর অভ্যর্থনা কমিটির হিসাবরক্ষকের নিকট থেকে টাকা নিয়ে যাবেন।" সব দোকানদার এতে রাজি হলেন। ফলে আমাদের রেজগির সমস্যার সমাধান হলো। যাতায়াতেরও বেশ অসুবিধা ছিল। ট্রেন ছিল বটে, কিন্তু ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। নেতাদের অনেককে বাস রিজার্ভ করে ময়মনসিংহ থেকে আনা হলো। অন্য প্রতিনিধিরা ট্রেনে এসে পৌঁছুলেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছুলেন।

গোটা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এলেন বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ—পি সি যোশী, ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখার্জী, কৃষ্ণবিনোদ রায়, সোমনাথ লাহিড়ী, গুরুমুখ সিং, হরকিষণ সিং সুরজিৎ, ভাগসিংহ, চন্দ্রিকা সিংহ গাড়োয়াল, গোদাবরী পারুলেকর, নাম্বুদ্রিপাদ, সুন্দরায়া, কেরোলিয়ান, ড. জেড এ আহমদ, যদুনন্দন শর্মা, নীলমণি, বড় ঠাকুর, ইরাবত সিং মণিপুরী, বিষ্ণু রাতা, কল্পনা যোশী প্রমুখ।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের চার-পাঁচ তারিখ ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিপুলসংখ্যক হাজং উপজাতি মেয়ে পিঠে তাঁদের শিশু সন্তানদের বেঁধে ৭০/৮০ মাইল হেঁটে এসেছিলেন। পথে অবশ্য তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া ছিল হাজংদের এক বিরাট ভলান্টিয়ার বাহিনী। কিশোরগঞ্জ থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের এক বিরাট বাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছিল। এ ছাড়া ঢাকা জেলা থেকেও কৃষকবাহিনী এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মীবাহিনী ও নেতারা এসেছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী চন্দ্রিকা সিং গাড়োয়াল। তিনি ১৯৩০ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিলেন। এতে সে সময় তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টায় প্রথমে ওই দণ্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং সর্বশেষে মুক্তি পান। তাছাড়া মণিপুরের প্রখ্যাত নেতা ইরাবত সিংসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের দীর্ঘ ও সবলদেহী শিখরা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা নদীতে যখন স্নান করতেন তখন ওইরূপ জোয়ান পুরুষের লম্বা লম্বা চুল দেখে দর্শকরা আশ্চর্য হতো। তাছাড়া হাজার হাজার উপজাতি মেয়েকে দেখে নেত্রকোণাবাসী তো বিস্ময়ে অভিভূত। তাঁরা ভাবেন—এত অল্প সময়ে এত মেয়ে কমিউনিস্টরা আনল কীভাবে! কমিউনিস্টদের কৃষক সংগঠনের শক্তি ও শৃঙ্খলা দেখে সবাই আশ্চর্য হলেন।

প্রকাশ্য বিশাল জনসভায় সমাগম হয় প্রায় এক লক্ষ লোকের। বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান কৃষক। তাছাড়া হিন্দু ও উপজাতি কৃষকরাও উপস্থিত

ছিলেন। জনসমুদ্রের সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ইতিপূর্বে স্মরণকালের মধ্যে এত বিশাল কৃষক সমাবেশ বাংলায় আর হয়নি। প্রতিবেলা একুশ হাজার লোক সম্মেলনে আহার করত।

প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠানের আগে নেত্রকোণা শহরে সম্মেলনের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে এক বিরাট মিছিল বের হয়। আজও নেত্রকোণার নাগরার মাঠের কৃষক সম্মেলনের কথা ওখানকার মানুষ বিশেষভাবে স্মরণ করেন।

সভার দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টি হওয়ায় সভার কাজের কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। এটা ছিল পূর্ববঙ্গের এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক বিশাল কৃষকসভা। পল্লী গায়কদের গান দিয়ে সভা শুরু করা হয়। হিন্দু-মুসলমান অনেক পল্লীগীতির রচয়িতা, গায়ক, শিল্পী ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিনয় রায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অখিল চক্রবর্তী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হেনা দাস, জিতেন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক মুসলমান গায়কও ছিলেন। এঁদের গান শুনে সবাই ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সম্মেলনের ফলে আমাদের প্রভাব-পরিচিতি ও সংগঠনের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। নেত্রকোণা শহর ও নাগরা মাঠের নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের মুসলমান কৃষকরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং বিপুল সংখ্যায় সভায় যোগ দেন।

উল্লেখ্য, উপজাতি মেয়েরা ছাড়া বহু মধ্যবিত্ত মহিলাও সম্মেলনে যোগ দেন। নেত্রকোণার খুসু রায়, সুকুমার ভাওয়াল, শশীন চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী সবাই সম্মেলনকে সফল করার জন্য কাজ করেন। প্রমথ গুপ্ত, নিখিল রায় চৌধুরী সম্মেলনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ময়মনসিংহের আলতাব আলী প্রয়োজনমতো বিভিন্ন জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সাহায্য করেন। গুরুদাস তালুকদার, রবি নিয়োগীরা ছিলেন রন্ধনশালার তদারক। তাছাড়া রন্ধনশালার জন্য অন্যান্য লোক ছিল। ঢাকার ৮০০ কর্মীকে পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এভাবে বিভিন্ন জেলার কমরেডরা বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই সামরিক ধাঁচের পোশাকে (ইউনিফর্ম) সুসজ্জিত ছিলেন; খোকা রায় ছিলেন ভলান্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক। অবশ্য একমাত্র আমি বাদে ভলান্টিয়াররাও অনুরূপ পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশজনের মতো চিকিৎসক ছিলেন। সাব-ইঞ্জিনিয়ার অজিত বোস সব বেড়া, মঞ্চ ইত্যাদি তৈরির মূল দায়িত্বে ছিলেন—তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিরাট সম্মেলন সমাপ্ত হয় এবং সম্মেলনের যে মূল উদ্দেশ্য এ দেশের নিপীড়িত কৃষকদের সংগঠিত করা—তা সম্পূর্ণ সফল ও সার্থক হয়।

টংক উচ্ছেদ, তে-ভাগা আন্দোলন সম্পর্কে প্রস্তুতি, অধিক ফসল উৎপাদন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচন ছিল সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ হিন্দুরা হিন্দু প্রার্থীদের ও মুসলমানরা মুসলমান প্রার্থীদের ভোট দেবে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় আইন পরিষদেই নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। এর ভিত্তি ছিল ১৯৩৫ সালের নির্বাচন পদ্ধতি। জনসংখ্যার মাত্র শতকরা সাড়ে ১৩ ভাগ ভোটের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষাগত ও কর দেওয়ার যোগ্যতার ভিত্তিতেই ভোটার হওয়ার উপযুক্ততা নির্ধারিত হতো। ফলে কৃষক, শ্রমিক, গরিব জনসাধারণ যাঁরা আমাদের সমর্থক ছিলেন—তাঁদের বিপুল অংশ ভোট দেওয়ার উপযুক্ততা থেকে বাদ পড়েন।

এই অবস্থা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ১৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন স্থির হয়। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যাঁরা সেসময়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—জ্যোতি বসু (রেলওয়ে); রূপনারায়ণ রায় (দিনাজপুর); রতনলাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিং); কল্পনা যোশী (চট্টগ্রাম); মণি সিংহ (ময়মনসিংহ); ব্রজেন দাস (ঢাকা); রংপুরে দুজন। এর মধ্যে মাত্র তিনজন জয়লাভ করেন। তাঁরা হচ্ছেন—জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায় ও রতন লাল ব্রাহ্মণ।

ময়মনসিংহ জেলা থেকে আমাকে মনোনীত করা হয়। আমার নির্বাচনের এলাকা ছিল আড়াইটি মহকুমা—নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও সদরের এক অংশ। পাহাড়ি অঞ্চলে আমাদের সংগঠিত এলাকা হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দী বাদ থাকে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী। আমরা বড় বড় নির্বাচনী সভা করেছি। সারা-ভারত কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার সাধারণ সম্পাদক কমরেড যোশী আমার গ্রাম সুসং-এ এসে বিরাট সভায় বক্তৃতা দেন। মধ্যবিত্তরা সে সময় সাধারণভাবে আমাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আমরা যুদ্ধের সময় বিশ্বযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করে ইংরেজদের সহায়তা করেছি। অপরদিকে আরেকটি আওয়াজ উঠল—স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস ভালো, ভাত-কাপড়ের জন্য কমিউনিস্ট। এখন প্রথমে স্বাধীনতা চাই, পরে ভাত-কাপড়ের দাবি—তাই কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অসংগঠিত এলাকায় জনসাধারণকে বেশ প্রভাবিত করে। আমরা যে সংখ্যক সভা করেছি

তার তুলনায় কংগ্রেস খুব কম সভা করেছে। আমরা সভায় নির্বাচনের ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছি। জনসাধারণ অর্থ দিয়েছে।

এই নির্বাচনের সময় পাহাড়ি অঞ্চলে একটি ঘটনা ঘটে গেল। আমি তখন সদর মহকুমায় ফুলপুরে সভা করছি। কংগ্রেস সুসং থেকে দুজন যুবককে ধরে পাহাড়ি অঞ্চলে জিগাতলায় প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিল। তাঁদের ঝাণ্ডা দেখে আমাদের কয়েকজন ভলান্টিয়ার তাঁদের বলল, এখানে কংগ্রেসের প্রচার করে লাভ নেই। এটা কমিউনিস্ট ঘাঁটি। অন্য এলাকায় যাও। এর ফলে কথা কাটাকাটি হলো। শেষ পর্যন্ত তা মারামারিতে পর্যবসিত হয়। এক পর্যায়ে আমাদের এক ভলান্টিয়ারের লাঠির আঘাতে ওই কংগ্রেস ভলান্টিয়াদের একজন মারা যায়। যে ছেলেটি মারা যায় সে ছিল জমিদার বাড়ির এক ধোপার ছেলে, নাম মহেন্দ্র। আমি এই সংবাদ পেয়ে রাত বারটার সময় সুসং পৌঁছি। ঘটনাস্থল হচ্ছে আরো সাত মাইল দূরে। শুনলাম লাশ পাওয়া যাচ্ছে না। পরের দিন সকালে শুনলাম লাশ পাওয়া গিয়েছে। ওই লাশ পাওয়ার পর কংগ্রেস ওই মৃতদেহের এক বীভৎস চিত্রসহ লক্ষ লক্ষ ইশতেহার ছাপিয়ে বিলি করে। ওই ইশতেহার শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও প্রেরণ করা হয়। কমিউনিস্টরা খুনি, বর্বর প্রভৃতি বিশেষণ দিয়ে ওই ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এমনিতেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের অবস্থা নাজুক, তার ওপর হঠাৎ এই খুন হওয়ায় আমাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল।

কমিউনিস্ট পার্টির এই নির্বাচন ছিল এক জ্বলন্ত শ্রেণিসংগ্রাম। জমিদার বাড়ির মেয়েরা কখনো ভোট দিতে যেত না। তাঁরা ধোপা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণিকে অত্যন্ত হেয় চোখে দেখতেন। তথাকথিত নিম্নশ্রেণির ও দরিদ্র লোকেরা জমিদারদের সামনে কখনো টুলে পর্যন্ত বসতে পারত না। কিন্তু কথায় বলে গরজ বড় বালাই। আশ্চর্যের বিষয়, নির্বাচনের দিন দেখা গেল, জমিদার বাড়ির মেয়েরা স্কুলের বারান্দায় (ভোটকেন্দ্রে) মহেন্দ্রের মাকে একটি চেয়ারে বসিয়েছে, আর জমিদারের এক মেয়ে তাঁকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছে। আমার চাচাত ভাইয়ের স্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন, "একটি মজা দেখে যান।" আমি ওই দৃশ্য দেখে ভাবলাম—শ্রেণিস্বার্থে সব কিছুই সম্ভব। আর উচ্চবিত্তের তো বটেই, মধ্যবিত্তেরও সাধারণ চরিত্র যেমন ভঙ্গুর তেমনি বেসামাল। সুসং অঞ্চলে অবশ্য প্রকৃত মহেন্দ্রের মাকেই আনা হয়েছিল, কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলের অন্যান্য কেন্দ্রেও এক একটি জাল 'মহেন্দ্রের মা'কে উপস্থিত করা হয়েছিল। এসব কারণ ছাড়া বিশেষভাবে রাজনৈতিক কারণে আমি হেরে গেলাম। আর কংগ্রেস আমার চাইতে দ্বিগুণেরও বেশি ভোট পেল।

নির্বাচনের পর মহেন্দ্রের মা ময়মনসিংহ শহরে এসে সাহায্যপ্রার্থী হন। অথচ তখন কংগ্রেস তাঁকে হাঁকিয়ে দেয়। এই ব্যবহারের উত্তরে তিনি বলেন,

"আমি মণি সিংহের কাছে গেলে এই ব্যবহার পেতাম না।" এই বলে তিনি চলে আসছিলেন। তখন কংগ্রেসের কোনো এক নেতার হুঁশ হয়; মহেন্দ্রের মাকে তখন রাস্তা থেকে ডেকে আনা হয়।

যা হোক, আমাদের গজেন্দ্র ও যোগেন্দ্র এই দুই নেতার বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়। ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য এই মামলায় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁর চেষ্টায় ভালো উকিল দেওয়া হয় এবং তিনিও মামলায় জেরা প্রভৃতি করেন। ফলে আমাদের দুজন নেতা কোর্ট হতে বেকসুর মুক্তি পান। এভাবে আমাদের আন্দোলন, সংগ্রাম ও সংগঠন এগিয়ে চলে। নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি আমাদের নিরাশ করতে পারে না।

প্রাদেশিক কমিটির অর্থ সংগ্রহ

নির্বাচনের আগে প্রাদেশিক কমিটি একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য সকল জেলার টাকার কোটা নির্ধারণ করে। পার্টির নীতি ও মতামত প্রকাশ ও প্রচারের জন্য দৈনিক পত্রিকা অতি আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন। কারণ সব দৈনিক পত্রিকার মালিকই হচ্ছেন বড়লোক, কাজেই শ্রমিক-কৃষকের খবর সেখানে ওঠে না। তাই শ্রমিক, কৃষক, গরিব মেহনতি মানুষের কথা জানতে ও জানাতে হলে কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব পত্রিকা একান্ত দরকার। দৈনিক পত্রিকার জন্য লক্ষ টাকারও বেশি প্রয়োজন। কাজেই সব পার্টি শাখাকে টাকা সংগ্রহ করে পাঠাতে হবে। পার্টির বড় জেলাগুলোর (পার্টির সাংগঠনিক দিক থেকে) কোটা পড়ে জেলাপ্রতি ১২ হাজার টাকা। পূর্ববঙ্গের বড় জেলাগুলো ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও দিনাজপুর। আমরা ময়মনসিংহ জেলার প্রতিটি মহকুমায় টাকা তোলার জন্য জোর প্রচেষ্টা নিলাম। পাহাড়ি অঞ্চলে আমাদের সংগঠন অন্য জায়গা থেকে শক্তিশালী। কাজেই সেখানে ব্যাপক প্রচার চালানো হলো। ধান, চাল, মেয়েদের রূপার গহনা প্রভৃতি সংগৃহীত হতে লাগল। এমন কি কিছু কৃষক কিছু জমিও দান করে দিলেন। সকলেই স্বেচ্ছায় চাঁদা দেওয়ার জন্য উৎসাহী। অবশ্য পরবর্তীকালে আমরা এলাকায় জানিয়ে দিলাম যে, জমি নেওয়া হবে না। কারণ জমির প্রকৃত ব্যবস্থা করা আমাদের সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই সময়ের একটি ঘটনা বলা দরকার। ওই এলাকায় সে সময় কী রূপ আবেগ, উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। পাহাড়ি এলাকার কলমাকান্দা থানায় লেঙ্গুরা আমাদের শক্ত সাংগঠনিক

ঘাঁটি এলাকা। আমি ওই সময়ে লেঙ্গুরায় যাই। যাওয়ার পর একজন ভলান্টিয়ার এসে আমাকে বললেন, "গুরুদয়াল অধিকারী (অধিকারী হচ্ছেন হাজংদের পুরোহিত) কলেরায় আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু কী একটা কথা তিনি আপনাকে বলতে চান। এই কথা না বললে তাঁর মরণেও শান্তি হবে না। অধিকারী শুনেছেন যে, আপনি লেঙ্গুরায় এসেছেন। আপনাকে একবার দেখা করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।" গুরুদয়াল অধিকারী একজন মধ্য কৃষক। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নন। কৃষক সমিতির সভ্য। তাঁর অবশ্য টংক জমি ছিল না, সব জোত-স্বত্ব। আমি ভলান্টিয়ারকে বললাম, "চল যাই, তাঁকে দেখে আসি।" তাঁর বাড়ি ছিল মাইলখানেক দূরে। আমি মনে করলাম গুরুদয়াল নিশ্চয়ই ডাক্তারের কথা বলবেন। ডাক্তার আছে সাত মাইল দূরে সুসং-দুর্গাপুরে। আমি চিঠি দিলেই তিনি আসবেন। নচেৎ আসার সম্ভাবনা নেই। আমি একজন ভলান্টিয়ারকে সুসং-দুর্গাপুরে পাঠাব—মনে মনে চিন্তা করে রাখলাম।

আমি গুরুদয়াল অধিকারীর বাড়িতে যখন উপস্থিত হলাম, তখন তাঁর স্বর হয়েছে উন্নাসিক, অবস্থা বেশি ভালো নয়। আমাকে দেখে খুশি হলেন। উন্নাসিক স্বরে বললেন, "আমার একটি আবেদন আছে, এটা আপনাকে রাখতে হবে। তবেই আমি শান্তি পাব; শান্তিতে মরতে পারব। আমার আবেদন হচ্ছে—আমার সব সম্পত্তি আমি পার্টিকে দিয়ে গেলাম। এটা গ্রহণ করলে আমি শান্তি পাব।" আমি এই মৃত্যুপথযাত্রীর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাঁর ডাক্তার ডাকার আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্র নেই, শুধু তাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করলে তিনি শান্তিতে মরতে পারবেন। ক্ষণেক পরে আমি স্তব্ধতা কাটিয়ে বললাম, "আমি কমরেডদের বলে আপনার সম্পত্তি নেওয়ার ব্যবস্থা করব।" এই সময়ে তাঁর চোখে জল এলো। বুঝলাম তিনি আনন্দিত হলেন। এর দুই ঘণ্টা পর তাঁর জীবনাবসান ঘটল। আমি ফিরে এলাম। এরূপ মহৎপ্রাণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা তাঁর সম্পত্তির সব ব্যবস্থা পরে করেছিলাম। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি সব দান করে গেলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়।

পার্টির প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য

আমি ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি লেঙ্গুরায় যাই। লেঙ্গুরায় ললিত সরকারের বাড়িকে কেন্দ্র করে আমাদের সাংগঠনিক ঘাঁটি। ললিত সরকারের বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে লেঙ্গুরা বাজার। এখানে সপ্তায় দুদিন হাট বসে। এই বাজারের তিন-চতুর্থাংশের মালিক একজন হাজং কৃষক। আর বাকি অংশের

মালিক সুসং জমিদারের মধ্য হিস্যা। এই জমিদারদের হাটে একটি কাছারি আছে। এখানে কর্মচারীরা থাকেন। গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করেন। এখানে যেহেতু আমাদের প্রভাব আছে। কাজেই কেউই এখানে বাজারের খাজনা প্রভৃতি তুলতে পারত না। এখানে আসামের গারো পাহাড় থেকে গারোরা নানা রকম জিনিসপত্র বিক্রয় করতে আসত এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিস হাট থেকে কিনে নিয়ে যেত। এই বাজারের ওপর দিয়েই ললিত সরকারের বাড়ি যেতে হয়। আমি দেখলাম পুরান বাজারের সঙ্গেই উত্তরদিকে আরেকটি বাজার স্থাপন করা হয়েছে। ছোট ছোট চালা তো আছেই। জানলাম, এখন নতুন বাজারেই হাট জমে, পুরান বাজারে হাট হয় না। এই বাজার কে স্থাপন করেছে—তাও জানলাম। আমি জানতে চাইলাম, পুরান বাজার চালু না হয়ে জমিদারদের নতুন বাজার চালু হলো কী রূপে? কমরেডরা বললেন, "সারা-ভারত কৃষক সম্মেলনের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমরা এদিকে নজর দিতে পারিনি। ফলে নতুন বাজারে হাট বসেছে।" পরে আমি কমরেডদের একটি সাধারণ সভা ডেকে বললাম, "পুনরায় পুরান বাজারে হাট চালু করতে হবে। নতুন বাজারে একটি লোকও যাবে না। ভলান্টিয়াররা পাহাড়ের গারোদের পুরান বাজারে নিয়ে যাবে।" ফলে পুরান হাট আবার চালু হয়ে গেল। নতুন বাজারে কোনো লোক যায় না। আমি লেঙ্গুরা থেকে চলে আসলাম।

এর কিছুদিন পরে আমি আবার লেঙ্গুরা গেলাম। সকালবেলায় একজন ভলান্টিয়ার এসে খবর দিল, পুরান বাজারের চালাগুলো মাটিতে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কয়েকজন কমরেড একটি মিটিং-এর জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। যেখানে ছিলেন পুলিন বক্সী, আলতাব আলী, ভূপেন ভট্টাচার্য, এঁদের কেউই আজ আর জীবিত নেই। আমি বাজারে গিয়ে একজন ভলান্টিয়ারকে বললাম, "চালাগুলো উঠিয়ে দাও।" সে চালাগুলো উঠাতে লাগল। এই সময় দেখলাম একদল মুসলমান কৃষক লাঠি হাতে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা সবাই আমাকে চেনেন। তাঁরা সুসং-দুর্গাপুরের কাছাকাছি গ্রামের কৃষক; এখানে জমিদারের লাঠিয়ালের কাজে এসেছেন। তাঁরা আমাকে বললেন, "আমাদের সামনে যেন চালাগুলো না উঠানো হয়।" আমি বললাম, "তোমরা জমিদারের লাঠিয়াল হয়েছ। অন্যায় কাজে এসেছ। আর আমরা কৃষকদের জন্য টংক উচ্ছেদের আন্দোলন করছি। তোমাদের গ্রামে গিয়ে আমি বৈঠক করব। দেখি তোমাদের গ্রামের লোক কী বলে? তাঁরা তোমাদের এই অন্যায় কাজের জন্য অবশ্যই শাস্তি দেবেন। এই অপকর্মের জন্য তোমাদের নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হবে। চালা উঠবেই। অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দেব না। তোমরা যখন ভুল করে এসেছ, পাহাড়ের দিকে চলে যাও। চালা উঠবেই।" তাঁরা পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন।

এই সময় যখন ভলান্টিয়াররা চালা তুলতে কাছারির লাইনে এসেছেন, তখন এক জোয়ান পেয়াদা এসে লাঠি দিয়ে হঠাৎ পুলিন বক্সীর মাথায় আঘাত করল। ফলে তাঁর মাথায় এক স্থানে কেটে প্রচুর রক্ত ঝরতে লাগল। এই সময় আলতাব আলীকেও ওই পেয়াদা আঘাত করার জন্য অগ্রসর হলে আলতাব আলী তাকে একটি বাঁশ দিয়ে তাড়া করলেন। সে দৌড়ে কাছারিতে চলে গেল। এরপর সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা। সশস্ত্র পুলিশের হাওয়ালদার বের হয়ে এসে বলল, "কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, গোলি চালায়েগা।" আলতাব আলীকে ধরে হাওয়ালদার বলল, "আপ অ্যারেস্ট হ্যায়, চলিয়ে।" এই বলে তাঁকে কাছারিতে নিয়ে গেল। তখন আমাদের অন্য সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।

আমি একা বাজারে আছি। এমন সময় পেয়াদা-বরকন্দাজ মিলে পঁচিশ-ত্রিশজন লোক লাঠি হাতে বের হয়ে এলো। বাজারের পূর্বদিকে গুনেশ্বরী নদী। বাজার ছিল উত্তর-দক্ষিণ বরাবর। তাঁরা নদীর পাড় পর্যন্ত দৌড়ে যাচ্ছিল আর জয় জয় ধ্বনি দিচ্ছিল। আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল আবার আমার পাশ দিয়ে ফিরে আসছিল। এই সময় হাওয়ালদার এসে, "আপভি অ্যারেস্ট হায়, চলিয়ে" বলে আমাদের কাছারিতে যেতে বলল। আমরা গেলাম। সেখানে আমাদের এক কাঠের সিন্দুকের ওপর বসতে বলল। ভিতরে গিয়ে দেখলাম—জমিদারের পাঁচ-ছয় কর্মচারী সেখানে উপস্থিত। চেয়ার টেবিল আছে, কিন্তু আমাদের সেখানে বসতে বলল না। ওই কর্মচারীরা আমাদের দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমি নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। আমরা এদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারিনি। বোকার মতো এদের খপ্পরে এসে পড়েছি। সেখানে সশস্ত্র পুলিশ ছিল জনাদশেক।

পেয়াদা-বরকন্দাজরা কাছারির বারান্দায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল, তারা মহাউল্লসিত। কারণ, তারা সহজেই জয় করেছে এবং আমরা পরাজিত ও গ্রেপ্তার হয়েছি। আধ-ঘণ্টা কী চল্লিশ মিনিট পরে বারান্দার পেয়াদারা ভীতসন্ত্রস্তভাবে বলল, "হাওয়ালদার সাহেব, হাওয়ালদার সাহেব, কমিউনিস্ট পার্টি আইতাছে, কমিউনিস্ট পার্টি আইতাছে।" এই কথা শুনে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর দিক হতে শত শত লোক বল্লম নিয়ে বাজারে প্রবেশ করার জন্য আসছে। এটা দেখে আমি প্রমাদ গুনলাম। এঁরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন গুলি চলতে পারে, কে মরে তার কোনো ঠিক নেই। আমি হাওয়ালদারকে বললাম, "হামকো যানে দিজিয়ে।" হাওয়ালদার বলল, "নেহি বৈঠিয়ে।" কিন্তু যখন শত শত লোক বাজারে প্রবেশ করতে লাগল, তখন হাওয়ালদার দেখল অবস্থা বেগতিক। সে তখন খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। পুলিশের পক্ষে এই উত্তেজিত ও জঙ্গি জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা

অসম্ভব। তাঁরা মরবে তবুও ফিরবে না। জনতার রুদ্ররোষে পুলিশ ও জমিদারের লোকজন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হাওয়ালদার তখন আমাকে বলল, "আপ যাইয়ে"। বাজারে ঢোকার সরু রাস্তা; আমি সেখানে গিয়ে উত্তেজিত জনতাকে বললাম, "আপনারা ফিরে যান। আমরা শীঘ্রই ফিরছি।" সেই উত্তেজিত উত্তাল জনতা সহস্র কণ্ঠে স্লোগান দিল—"শেষ সংগ্রাম।" সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব নিয়েছিল। সেই প্রস্তাব "শেষ সংগ্রাম" শিরোনামে পুস্তিকাকারে ছাপা হয়েছিল। তাঁরা বললেন, "আপনার কথা অনেকদিন শুনেছি। আর না। এদের পুড়িয়ে মেরে ফেলব। কমরেড—শেষ সংগ্রাম। আপনার কথা আজ আমরা শুনব না। আপনি সরে যান।" আমি জনতরঙ্গের ওইরূপ হিংস্র মূর্তি কোনোদিন দেখিনি।

আমি অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সব বিফল হলো। তাঁদের কথা, "আজ আপনার কথা আমরা শুনব না। বহুদিন শুনেছি, আজ আর নয়, আজ শেষ সংগ্রাম।" এতদিন পর্যন্ত পার্টির নীতি তাঁদের শেখানো হয়েছে—"পার্টিই প্রধান, ব্যক্তি গৌণ। পার্টির কথা শৃঙ্খলার সঙ্গে পালন করতে হবে।" কিন্তু ওই মুহূর্তে তাঁরা সব কিছুই ভুলে গিয়েছিলেন। তখন অন্য উপায় না দেখে আমি বললাম, "পার্টি কি আজ আপনাদের ডেকেছে? না, পার্টি ডাকেনি। পার্টি যেদিন ডাকবে সেদিন লাখ লাখ মানুষ সমবেত হয়ে সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন। যেদিন পার্টির ডাক আসবে সেদিন সবাইকে চূড়ান্ত মুক্তির সংগ্রামে সাড়া দিতে হবে। আপনারা আজ চলে যান। পার্টির নামে আমি বলছি, আপনারা চলে যান। আপনাদের কর্তব্য চলে যাওয়া। পার্টি ডাক দেয়নি। আপনারা চলে যান।" যা হোক পার্টির নাম বলায় অবশেষে উত্তেজিত জনতার রুদ্ররোষ শান্ত হলো, স্তিমিত হলো লেলিহান অগ্নিশিখা। এতক্ষণ জনতা উর্ধ্বে বল্লম উঠিয়ে ক্ষুব্ধ আবেগ প্রকাশ করছিল। ধীরে ধীরে ওটা প্রশমিত হলো। তাঁরা শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আর কোনো স্লোগানও দিলেন না।

আমি পুনরায় কাছারিতে চলে এলাম। এখন সেখানে ভোল বদল হয়ে গেল। চেয়ার এলো, বিছানা পাতা হলো। পাঁচ-ছয় কর্মচারী এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, "আপনার জন্য আজ প্রাণে বেঁচে গেলাম। আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা মধ্যম বাড়ির চাকরি আর করব না।" আমি বললাম, "আপনারা জমিদারের সঙ্গে জমিদারের মারামারি দেখেছেন, এতে অভিজ্ঞও আছেন; কিন্তু কৃষকের সঙ্গে জমিদারের দ্বন্দ্ব দেখেননি। কেন আপনারা এই অন্যায় কাজে এসেছেন? আপনারা মারা পড়লে কে আপনাদের

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দেখত?” এই ঘটনা দেখে পুলিশ ও জমিদারের লোকজন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। হাওয়ালদার বলল, “আপ আদমি হায় নেই, আওর কুছ হ্যায়।” অতঃপর আমরা এখানেই রয়ে গেলাম। আমাদের খাবার-শোবার ব্যবস্থা করা হলো। সন্ধ্যার পর ওই সব কৃষক এসে ওই ঘরে ভিড় করে রইল। যদিও কাছারি ঘর ছিল বেশ বড় কিন্তু এত লোকের সমাগমে গিজগিজ করছিল। আমি ওই লাঠিয়ালদের ডেকে বললাম, “কাছারি ঘরের পিছনে আরো ঘর আছে, তোমরা ওই সব ঘরে গিয়ে থাক।” কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা, তাঁরা এতই ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, ওই সব ঘরে যেতেও তাঁরা সাহস করছিলেন না। আমি বারবার বলায় একজন বললেন, “আপনি এ ঘরে আছেন, এই ঘরে কিছু হইব না, অন্য ঘরে গেলে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মাইরা ফেলব।” মাত্র পাঁচজন বললেন, “তাইন কইতাছুন—চল যাইগা”। সেই পাঁচজন লোকই শুধু অন্য ঘরে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে দারোগা এলেন। ওখান থেকে থানা আট মাইল দূরে। দারোগার সঙ্গে কয়েকজন পুলিশও এলেন। দারোগা আমাকে দেখে বললেন, “ব্যাপার কী?” আমি বললাম, “চায়ের পাত্রে ঝড়।” দারোগা বললেন, “আপনাকে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দিচ্ছি। আলতাব আলী সাহেবকে চিনি না। তাঁর জন্য জামিনদার লাগবে।” গান-বাজনা করত এ ধরনের এক যুবককেও আমাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সে হাজং ছিল না। সে ছিল হিন্দুস্তানি; তবে হাজংপাড়ায় থাকতে থাকতে সেও পার্টির সংস্পর্শে এসেছিল। তার নাম ছিল ধনেশ্বর। সে ছিল খুবই সাহসী ও জঙ্গি। সেও গ্রেপ্তার হয়ে আমাদের সঙ্গে ছিল।

দারোগা বললেন, “আপনি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কেস করুন। আমি তাঁদের অ্যারেস্ট করে জামিন দেব।” আমি কর্মচারীদের নাম বললাম। অন্যদের নাম বললাম না। তাঁদেরও গ্রেপ্তার করে জামিন দেওয়া হলো। আমরা সেদিন যথাসময়ে যথাস্থানে ফিরে এলাম।

তারপর পুলিশ অফিসাররা একে একে আসতে শুরু করলেন। প্রথমে এলেন একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেন্ডেট। তিনি এসে বললেন, “আপনার লোকজন আমাদের পুলিশকে আক্রমণ করবে না বলে আপনাকে কথা দিতে হবে।” আমি বললাম, “এখানকার লোকজন পুলিশকে আক্রমণ করেনি, কাজেই আক্রমণ করবে না এই কথা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।” পরে এলেন এসপি। তিনি ছিলেন অবাঙালি। তিনি আমার নিকট ঘটনা জানতে চাইলেন। এরপরে এলেন এসডিও। এখানে যেন এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়েছে—এরূপ অবস্থা।

যা হোক, কেসে আমরা উপস্থিত হলাম। জামিন হলো। পরে যে আলতাব আলীকে মারতে গিয়েছিল (সে ছিল মুসলমান) সেই পেয়াদা নেত্রকোণা কোর্টে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করে মাফ চাইল। আমি বললাম, "তুমি যাঁকে মারতে গিয়েছিলে তিনি আমাদের বড় নেতা। তাঁর কাছে মাফ চাও।" সে আলতাব আলী সাহেবের কাছে মাফ চাইল। এত সব পুলিশ অফিসার আমদানির কারণ হলো জমিদার, তারা একটি বীভৎস মনগড়া চিত্র এঁকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে।

আবার টংক আন্দোলন

এর পরবর্তীকালে আরম্ভ হলো দ্বিতীয় দফার টংক আন্দোলন। নেতৃস্থানীয় আমরা সকলেই আত্মগোপনে চলে গেলাম। মোক্তারদের জামিনের দেয় টাকা দিয়ে দেওয়া হলো। এটা ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয়বারের টংক আন্দোলনের সময়কার কথা।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা যুদ্ধের মধ্যে কোনো আন্দোলন করিনি। এই যুদ্ধ সম্পর্কে পার্টির নীতি কী ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৪১ সালে নাজি জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর পার্টি এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেজন্য যুদ্ধের সময় পার্টি কোনোরূপ আন্দোলন করেনি। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাগরণ সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস নেতারা তখন গণ-আন্দোলনের পথ ছেড়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসের দিকে ঝুঁকেছে। জনগণের জাগরণ লক্ষ্য করে কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব নিল, জনগণের বিশেষত শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন অগ্রসর করে নিতে হবে। সে হিসেবেই তে-ভাগা ও পুনরায় টংক আন্দোলন করা পার্টি স্থির করল।

টংক আন্দোলন আবার শুরু করার জন্য সুসং-দুর্গাপুর স্কুলের মাঠে আমরা সভা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। স্কুলের মাঠের সঙ্গে লাগোয়া ছিল আমাদের বাড়ি। সেখানে ছিল পার্টি অফিস। অফিসের সামনে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে বেশকিছু জায়গা ছিল, স্কুল মাঠে কোনো অসুবিধা হলে সেখানেও সভা হতো। আমরা স্থির করলাম যে, স্কুল মাঠেই সভা হবে। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বড় মিছিল করে সবাই সভায় আসবে। আমি তখনো আত্মগোপনে আছি। আন্দোলন করতে হবে সেজন্য আমরা আত্মগোপনে চলে যাই। লেঙ্গুরা বাজারের যে ঘটনায় আমরা জামিনে ছিলাম, সেই মামলায় আমাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হয়। কিন্তু

তা সত্ত্বেও আমার সভাস্থলে যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে। দুর্গাপুর থানার পাশ দিয়ে একটি রাস্তা আছে। ওই রাস্তা দিয়ে আমরা মিছিল করতাম। রাস্তার সঙ্গে সোমেশ্বরী নদী। ওই রাস্তার পাশে থানা, টেলিগ্রাফ ও পোস্ট অফিস। রাস্তাটি থানার বলে থানা দাবি করে। মিছিল যাতে যেতে না পারে সেজন্য তারা দুই দিকে কাঁটাতারের পোক্ত বেড়া দিয়ে দেয়। মিছিলের খবর পেয়ে সশস্ত্র পুলিশকেও সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল।

আমাদের পার্টির কাজের জন্য এক বেপারীকে বলে হরিহর ছত্রের মেলা হতে একটি সুন্দর সাদা ঘোড়া এনেছিলাম। হাজার পাঁচেক লোকের এক মিছিল পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আসছিল। আমাদের ভলান্টিয়ারগণ ডিসপোজোলের প্যান্ট-শার্ট কিনেছিল। (সামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত প্যান্ট-শার্ট যুদ্ধের পরে সরকারিভাবে নিলাম করা হয়, সেগুলোকেই ডিসপোজোলের প্যান্ট-শার্ট বলা হতো)। তাঁরা প্যান্ট-শার্ট পরে মিছিলে আসেন। প্রত্যেকের হাতেই বল্লম। ঘোড়ার উপরে আমাদের নেতা বল্লভী বক্সী। ভলান্টিয়ারদের পেছনে শখানেক হাজং মহিলা ছিলেন। ভলান্টিয়াররা যখন কাঁটাতারের বেড়া দেখলেন তখন কালক্ষেপন না করে স্লোগান দিতে দিতে কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে চুরমার করে ফেললেন। বিরাট মিছিল আর বল্লম দেখে সশস্ত্র পুলিশ ওই স্থান ছেড়ে থানার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। শুধু কাঁটাতারের বেড়া নয়, টেলিগ্রামের তারও ছিন্ন করে ফেলা হলো। এসব কাণ্ড করে মিছিল স্কুল মাঠে উপস্থিত হলো। এক বিরাট সভা। এই সভার উদ্দেশ্য আবার টংক উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, ময়মনসিংহ শহরে ভিয়েতনাম দিবসে পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্রনেতা অমলেন্দুর মৃত্যুর প্রতিবাদ করা। সভার পর বল্লভী এই ঘটনাকে বেশ গুরুতর বলে মন্তব্য করলেন। আমি তাঁকে বললাম, “সশস্ত্র পুলিশ ময়মনসিংহ থেকে এসে পড়বে। তোমরা সতর্ক হয়ে যাও।” কয়েকদিনের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিশ এসে বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসল। সুসং-দুর্গাপুরের অপর পাড়ে বিরিশিরিতে একটি সশস্ত্র পুলিশের ঘাঁটি করা হলো। গুলি চালানোর অর্ডার দেওয়ার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকলেন।

১৯৪৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সুসং-দুর্গাপুরের অপর পারে বহেরাতলী গ্রাম। এ গ্রামে হাজং ও গারোদের বাস। বিরিশিরি হতে চার মাইল দূরে। বহু বছর থেকেই এখানে একটি অস্ট্রেলিয়ান মিশন আছে। অস্ট্রেলিয়ার লোকজন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই স্থানের কর্তাব্যক্তি। এখানে হাই স্কুলও আছে। যা হোক, ওই ক্যাম্প হতে পাঁচ জন পুলিশ মাইল চারেক দূরে হাজং বাড়িতে তল্লাশি করতে যায়। তখন হাজং মেয়েরা দা নিয়ে তাদের তাড়া করে। পুলিশ তাঁদের এই মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে যায়। এরা আরো জানত যে, কোনো সঙ্কেত

করলে শত শত হাজং মুহূর্তে পঙ্গপালের মতো এসে উপস্থিত হবে। অতএব তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। পরে পঁচিশ জন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে বহেরাতলী গ্রামে যায়। ওই গ্রাম থেকে বিশ-একুশ বছর বয়সের কুমুদিনী নামে একজন বিবাহিতা মেয়েকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই সময় আমাদের জনা চল্লিশেক ভলান্টিয়ারের এক দল—ত্রিশজন পুরুষ ও দশজন মহিলা ওই মাঠ দিয়ে আসছিল। কুমুদিনীকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে রাশিমণি নামের একজন মধ্য বয়স্কা নারী দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করে। মুহূর্তে পুলিশ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর সুরেন্দ্র নামে একজন গেলে তাঁকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্যরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের দিকে বল্লম ছুড়তে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ তখন নদীর দিকে যায়। শীতকালে নদীর জল অনেক দূরে সরে যায়। নদীর পাড় উঁচু; পুলিশের উদ্দেশ্য সেখান থেকে গুলি চালানো। সেই জন্য সব পুলিশ নদীর দিকে ধাওয়া করে। এদিকে দুইজন পুলিশ নদীর দিকে যাওয়ার জন্য আলাদাভাবে অগ্রসর হয়। এখানে কিছু ঝোপঝাড় ছিল। ওই দুজন পুলিশ বরাক বাঁশের এক বেড়ায় আটকা পড়ে যায়। লতা-পাতায় ঘেরা থাকায় এখানে বেড়া আছে তা তারা বুঝতে পারেনি। ওই উঁচু বেড়া পার হওয়ার চেষ্টা করার সময় আমাদের ভলান্টিয়াররা তাদের আক্রমণ করে; ফলে ওই দুই সশস্ত্র পুলিশ বল্লমের আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অন্যান্য পুলিশ নদীর পাড়ে নামে বটে, কিন্তু তাদের ওপরও বল্লম এসে পড়তে থাকে। তারা মনে করেছিল যে, তারা ঘেরাও হয়ে পড়ছে। কাজেই ভয়ে বাসযোগে সবাই পলায়ন করে। এদিকে দুজন পুলিশ মরে পড়ে আছে, সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

আমরা ছিলাম নদীর অপর পাড়ে, সাত মাইল দূরে। একজন ভলান্টিয়ার সাইকেলে এসে খবর দিল যে, আমাদের দুজন ও পুলিশের দুজন মারা গেছে। কিন্তু সে একটি ভুল খবর দিল যে, "এপারে ওপারে সবখানেই পুলিশ এসে পড়েছে। সুতরাং আপনারা সোজা রাস্তায় যাবেন না।" আমরা সে অনুসারে দুই ভাগ হয়ে রওয়ানা হলাম। একদল গেল পাহাড়ের গা ঘেঁষে উত্তর দিকে। আর আমি গেলাম সমতল ভূমি দিয়ে দক্ষিণ ঘুরে পাহাড়ের দিকে। যা হোক, পরে জানা গেল পুলিশ দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ঘটনাস্থলে আসেনি। গভীর রাতে পুলিশ মিশনারিদের নিয়ে ওই দুটি লাশ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এখানে একটি হাস্যকর ও মজার কাহিনী বলব। ওইদিন একদল যুবক ভলান্টিয়ার আমাকে এসে বলল, "পারলাম না কমরেড।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী পারলে না?" তারা একটি ঘটনার কথা বলল। ওই সংঘর্ষের সময় আমাদের ভলান্টিয়ারগণ মৃত পুলিশের একটি রাইফেল তখনই নিয়ে

আসে, কিন্তু আরেকটি রাইফেল তখন আনতে পারেনি। সন্ধ্যার পর কয়েকজন যুবক ভলান্টিয়ার ওই রাইফেলটি আনতে যায়। তারা মৃত পুলিশের গায়ের সঙ্গে রাইফেল আটকানো দেখতে পায়। তারা রাইফেলটি আনবার জন্য একবার হাত বাড়িয়ে দেয়, আবার ফিরিয়ে আনে, এই ভাবে কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তাদের ওই ব্যর্থতার কথা তারা বিমর্ষভাবে এসে আমার কাছে এভাবে ব্যক্ত করছিল। তারা বলল, "জীবন্ত মানুষ যত শক্তিশালী হোক না কেন, আর যে অস্ত্রই থাকুক না কেন আমরা তা ভয় পাই না। কিন্তু যে মরে গেছে, সে তো শম্ম (অর্থাৎ ভূত হয়ে গেছে)। তার সঙ্গে আমরা পারব কেন?" পরে জানতে পারলাম যে, মৃতদেহের সঙ্গে রাইফেল লেগে থাকার জন্য তাঁরা ভূতের ভয়ে রাইফেল আনতে পারেনি। তাঁদের আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, মৃত ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না। ভূত বলে কিছু নেই, ওটা কুসংস্কার। আমার ওই সব কথায় তাঁদের এতদিনের কুসংস্কার তখনই চলে যাবে এটা আশা করা যায় না। এরূপ একটি ঘটনা ঘটতে পারে এটা কখনো ভাবা যায় না। এ ধরনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও নানা আচার-আচরণে আচ্ছন্ন এবং পশ্চাৎপদ জনসাধারণের মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হয়েছে এবং পার্টি সংগঠিত করতে হয়েছে।

আমাদের টংক এলাকায় প্রথম শহীদ হলেন রাশিমণি ও সুরেন্দ্র। এই সংঘর্ষের জন্য এক বিরাট মামলা হলো। আমাদের অনেক নেতৃস্থানীয় কমরেডের নামে সরকার হুলিয়া বের করল। ওই মামলার মূল সাক্ষী ছিল আটজন নিরক্ষর গারো। গারোদের ওপর আমাদের প্রভাব ছিল খুব কম, মিশনারিদের প্রভাব ছিল বেশি। তাঁরা বেশির ভাগ খ্রিস্টান। আমরা এইসব গারোর মাতব্বরকে ভালোভাবে বোঝালাম যাতে তাঁরা সত্য কথা বলেন। কারণ এই সময় এঁরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। দারোগা এঁদের শিখিয়ে পড়িয়ে টিপসই নিয়েছিলেন। মামলা যখন উঠল, তখন আমরা জানতে পারলাম যে, পঁচিশজন পুলিশ ছিলেন এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। ওই ম্যাজিস্ট্রেটও কোর্টে উকিলদের বলেছিলেন, "খুব বেঁচে গেছি, এক বীরাঙ্গনা আমাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছোড়ে; আমি কাত হয়ে গিয়েছিলাম বলে সৌভাগ্যবশত সে বল্লম লাগেনি।" এখানে প্রকাশ থাকে যে, মেয়েরা বল্লম চালায় না, পুরুষরাই বল্লম চালায়।

মুসলমান ও নেপালি এই দুই সম্প্রদায়ের সশস্ত্র পুলিশদের সাক্ষ্য দেবার জন্য কোর্টে যখন দাঁড় করানো হলো এবং তাঁরা কী জানে বলতে বলা হলো তখন প্রথম সাক্ষী বললেন, "আমরা শুনছি, দেখি নাই।" উকিল জেরা করে বললেন, "তোমরা দারোগা সাহেবের কাছে বলেছ যে, এইসব আসামি ঘটনার সময় ছিল, এখন অস্বীকার করছে কেন?" প্রথম সাক্ষী বললেন, "আমরা কি

লেখাপড়া জানে? দারোগা সাহেব কী বলছে জানে না। টিপ দিতে বলছে—টিপ দিচ্ছি।" এইভাবে আটজনই একই কথা বললেন। অন্য সাক্ষীরা ছিলেন দূরের। তাঁরা কেউ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখেননি। অধিকাংশ সাক্ষীর সঙ্গে আমাদের পূর্বেই আলোচনা হয়েছিল। আমরা তাঁদের আদালতে সত্য কথা বলার জন্য আবেদন করেছিলাম। ফলে কেউই কোনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি। প্রকৃতপক্ষে ওই সংঘর্ষের সময় অন্য কোনো লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। গুলিগোলার শব্দ শুনে কেউই কাছে ঘেঁষেনি। মামলা প্রথম কোর্টেই খারিজ হয়ে যায়। কোনো আসামিই কোর্টে উপস্থিত ছিলেন না (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই মামলা কোর্টে ওঠে)। যে দুজন সশস্ত্র পুলিশ মারা যান তাঁরা ছিলেন মুসলমান। আমি প্রথম দিন উপস্থিত ছিলাম। সরকারি উকিল বললেন, "এখানে নেতা উপস্থিত আছেন, কাজেই ভয়ে তারা সত্য কথা বলতে পারছে না।" আমাদের উকিল বললেন, "নেতা আছে বলেই তারা সত্য কথা বলেছে, মিথ্যা বা শেখানো কথা বলেনি।" ১৯৪৮ সালে ওই কেসটি হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর আমি সামান্য কিছুদিন প্রকাশ্য ছিলাম।

এই সংঘর্ষের পরে সরকারের তরফ থেকে ব্যাপক অত্যাচার চালানো হয়। তছনছ করা হয় বহেরাতলী গ্রাম। অন্য অনেক গ্রাম তছনছ করা হয়। হেলিকপ্টার এসে আকাশে টহল দিতে থাকে। এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হয়। এই সময় যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। এসব অত্যাচারের কাহিনী কলকাতায় পৌঁছুলে কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা হতে একটি অনুসন্ধান কমিটি পাঠানো হলো। ওই অনুসন্ধান কমিটিতে ছিলেন জ্যোতি বসু (পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী), ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য ও সাংবাদিক প্রভাত দাশগুপ্ত।

তাঁরা ময়মনসিংহ পৌঁছে জিপযোগে নালিতাবাড়ি যান। নালিতাবাড়ির প্যারামিলিটারির কমান্ডার তাঁদের আটক করেন এবং তাঁদের নিকট থেকে ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া হয়। কমান্ডার ছিলেন অবাঙালি। তাঁদের বলা হয়, "তোমরা এখানে এসেছ কেন? তোমাদের আগামীকাল ময়মনসিংহ জেলে পাঠানো হবে।" জ্যোতি বসু তখন একজন এমএলএ—আইন পরিষদ সদস্য, ব্যারিস্টারও বটে। জ্যোতি বসু ও স্নেহাংশু আচার্য দুজনেই ব্যারিস্টার। তাঁরা দুই ঘণ্টা তর্ক-বিতর্ক করলেন, কিন্তু ফল হলো না। তখন স্নেহাংশু আচার্য অন্য উপায় না দেখে শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। স্নেহাংশু বললেন, "জানো আমি কে? আমি ময়মনসিংহের মহারাজকুমার।" এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টে গেল। "তুমি মহারাজকুমার!"—কমান্ডার বললেন, "তোমাদের জন্য কী করতে পারি?" চা প্রভৃতি এসে গেল, ক্যামেরা ফেরত দেওয়া হলো।

কমান্ডার বললেন, "জিপ লাগলে আরেকটি জিপ নিয়ে যাও।" সেখান থেকে ফিরে এসে স্নেহাংশু আচার্য আমাকে বলেছিলেন, "দেখুন আপনারা সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের জন্য লড়াই করছেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের প্রতি কী মোহ! এঁরা আমাদের প্রদেশের লোক নয়, তবু সামন্ততন্ত্রের ওপর কী শ্রদ্ধা! আমরা দুই ঘণ্টা তর্ক করলাম, আইনের কথা বললাম। আমরা ব্যারিস্টার সে কথাও বললাম। জ্যোতি বসু এমএলএ তাও বললাম। কিছুতেই কিছু হলো না। কিন্তু মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহারে কার্যসিদ্ধি: এইতো দেশের অবস্থা।" যা হোক, বেস্টিন সাহেব তখন ছিলেন জেলা ম্যাজিস্টেট। তিনি জ্যোতি বসু ও স্নেহাংশু আচার্যকে বহেরাতলীতে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না।

আমি তখন আত্মগোপনে আছি। বেস্টিন সাহেব আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পাহাড়ে এসে ক্যাম্প করলেন। চতুর্দিকে গোয়েন্দা পাঠানো হলো। কে যেন বেস্টিন সাহেবকে বলে দিয়েছিল যে, "কমিউনিস্টদের একটি সাদা ঘোড়া আছে। মণি সিংহ সাদা ঘোড়ায় চড়ে ঘোরে।" তখন হুকুম হলো, "এলাকায় যত সাদা ঘোড়া আছে ধরে আনো।" এই খবর পেয়ে আমরা নেত্রকোণায় আমাদের এক পার্টি দরদির কাছে আমাদের ঘোড়াটি পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর নিজেরও ঘোড়া ছিল। ঘোড়া খুঁজতে এসে পুলিশ ঘোড়া পেল না; কিন্তু ঘোড়ার জিন-গদি ছিল ললিত সরকারের ধানের গোলায়। পুলিশ সন্ধান পেয়ে আক্রোশে জিন-গদিসুদ্ধ সেই বিরাট গোলার ধান পুড়িয়ে দিল। এদিকে যে বেপারী আমাদের কাছে ঘোড়া বিক্রি করেছিলেন তাঁকে ধরে এনে আটকানো হলো। অপরাধ—"কেন তুমি এদের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করেছ?" সে বলেছিল, "আমি ঘোড়ার বেপারী আমার কাছে ঘোড়া চেয়েছে, তাই আমি পাঁচশ টাকায় ঘোড়া বিক্রি করেছি। আমার দোষ কী?" কিন্তু এই সত্যিকারের যুক্তি কে শোনে? পরে তিনশ টাকা দারোগাকে দিয়ে সেই বেপারী কোনো রকমে মুক্তি নিয়ে আসে।

নেত্রকোণা শহরের এক প্রেস থেকে আমাদের একটি ইশতেহার ছাপানো হয়েছিল। ইশতেহারে তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু ওই ইশতেহার ছাপানোর অপরাধে প্রেসের মালিক, কম্পোজিটর এবং ট্রেডেল মেশিনটিও নেত্রকোণা সাবজেলে এনে আটকে রাখা হয়েছিল। এরূপ খামখেয়ালি অত্যাচার-অবিচার খুব বিরল; কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে তাও করা হয়েছিল।

সে যা হোক এই পর্যায়ে টংক আন্দোলন আর অগ্রসর হলো না। টংক উচ্ছেদ হলো না। যতটুকু সংস্কার করা হয়েছিল, তাই রয়ে গেল।

ঐতিহাসিক তে-ভাগা সংগ্রাম

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে তখনকার পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) ও আজকের পশ্চিমবঙ্গে বর্গা কৃষকদের তে-ভাগা আন্দোলন ও সংগ্রাম হয়েছিল। ওটা ছিল যেমন বিরাট তেমনই জঙ্গি। উনিশটি জেলায় ওই সংগ্রাম হয়। এই জেলাগুলো হচ্ছে—দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি। ষাট লক্ষ বর্গা বা ভাগচাষি হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি, নারী-পুরুষ জীবনকে তুচ্ছ করে ওই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাংলার মাটি হিন্দু, মুসলমান ও উপজাতি কৃষকের রক্তে লালে লাল হয়ে এশিয়ার বিখ্যাত এক কৃষক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল।

সারা পৃথিবীতে যতগুলো বড় কৃষক আন্দোলন হয়েছে বাংলার তে-ভাগা আন্দোলন তার অন্যতম। এটা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই আন্দোলনের ফল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে পরে ভাগচাষের আমূল পরির্তন হয়েছে। (সেখানে উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগ চাষি আর একভাগ মালিক পেয়ে থাকে।) কিন্তু বাংলাদেশে আজও ভাগচাষ প্রথার কোনো সংস্কার হয়নি।

প্রকৃতির বিস্ময়কর সৃষ্টি উর্বরা বাংলাদেশ নদীমাতৃক বাংলাদেশ। ভূমি এখানে অত্যন্ত উর্বর। কৃষকের লাঙ্গলের ফলায় ফলায় দেশজুড়ে এখানে ফসলের অকৃপণ সমারোহ। কিন্তু যে চাষি ফসলের প্রাণোচ্ছলতায় দেশ ভরে তোলে—সে যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, দরিদ্র ও অভুক্ত। তবে এই নিপীড়ন কৃষকরা নীরবে মুখ বুজে সহ্য করেনি। অগ্নিশিখার মতো বারবার জ্বলে উঠেছে। বীরের মতো লড়াই করেছে। সেই শিখা সময়ে সময়ে স্তিমিত হয়েছে সত্য; কিন্তু ওই জ্বলন্ত শিখাকে কোনোদিন চিরতরে নেভানো যায়নি। অনুকূল বাতাসে তা বার বার জ্বলে উঠে শাসক-শোষকদের হৃৎকম্প জাগিয়েছে।”

আন্দোলনের সূচনা

১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তে-ভাগার সংগ্রাম শুরু হয়। আন্দোলনের বজ্রকণ্ঠ আওয়াজ ছিল—"ইনক্লাব জিন্দাবাদ। নিজ খোলানে ধান তোল, আধির বদলে তে-ভাগা চাই।" অর্থাৎ মোট উৎপন্ন ফসলের দুভাগ পাবে ভাগচাষি, একভাগ পাবে মালিক। আরো স্লোগান ছিল—"জান দেব তবু ধান দেব না"; "ভাগচাষিদের উচ্ছেদ করা চলবে না"; "জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই"; "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক" প্রভৃতি। পূর্বের প্রথা অনুযায়ী ধান উঠত জোতদারের খোলানে। এবার ধান উঠবে ভাগচাষির বাড়িতে। সংঘবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে ধান কাটা হবে, কেউ আলাদাভাবে ধান কাটবে না। একদল নারী-পুরুষ ভলান্টিয়ার ধান কাটবে, আর একদল লাঠি, বল্লম, তীর, ধনুক নিয়ে পাহারা দেবে। তে-ভাগা আন্দোলনের প্রত্যেক কেন্দ্রে শক্তিশালী ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠিত হয়। বর্গা বা ভাগচাষিদের মধ্যে ছিল হিন্দু, মুসলমান ও উপজাতি কৃষক সবাই। জোতদার ছিল হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক। পূর্ববাংলায় মুসলমান জোতদাররাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। তাঁদের জমিও ছিল বেশি। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জমিদারের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

কিন্তু বাংলায় পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় তে-ভাগা আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। যেসব জেলায় জোতদাররা ভাগচাষিদের অর্ধ-দাসের মতো ব্যবহার করত এবং শোষণ ও জুলুম ছিল মাত্রাতিরিক্ত, সেই সব জেলা ছিল সংগ্রামের পীঠস্থান। দিনাজপুর জেলায় বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) তে-ভাগা আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। এটা ছিল তে-ভাগা আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। দিনাজপুর জেলায় ৩০টি থানার মধ্যে ২২টি থানায় তে-ভাগা আন্দোলন দ্রুত এগিয়ে যায়। রংপুর জেলায় নীলফামারী মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) আন্দোলন হয় তীব্র। যশোর জেলায় আন্দোলন হয় নড়াইল মহকুমায় (বর্তমানে জেলা)। পাবনা জেলার একাংশে তে-ভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ময়মনসিংহ জেলার চারটি স্থানে আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এখানে মূল আন্দোলন ছিল টংক আন্দোলন। ঢাকা জেলার কুকুটিয়া অঞ্চলে তে-ভাগা আন্দোলন গড়ে ওঠে।

জোতদার-পুলিশের মিলিত হামলা

রংপুরের নীলফামারী মহকুমায় তে-ভাগা সংগ্রাম শুরু। শত শত কৃষক অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে যৌথভাবে ধান কেটে ভাগচাষিদের বাড়িতে তুলছিল। এই অভিনব দৃশ্য দেখে জোতদাররা নীরব হয়ে বসে থাকেনি। প্রথমদিকে জোতদাররা নানা রকম গুজব ছড়িয়ে ভাগচাষিদের নৈতিক শক্তি ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। পরে গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়। গুণ্ডার দল কৃষক ভলান্টিয়ারদের লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী হয়ে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। পরে জোতদাররা বন্দুক আমদানি করল। রংপুর জেলার ডিমলা থানার খগাখড়ি বাড়িতে জোতদাররা পাঁচটি বন্দুক নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে এবং কৃষক নেতা তগনারায়ণকে হত্যা করে ও বাচ্চা মামুদকে গুরুতরভাবে জখম করে। জোতদাররা মনে করেছিল তারা এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা কৃষকদের দমিয়ে দিতে পারবে। দমানো দূরের কথা, কৃষকরা প্রতিশোধের জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কৃষকরা বন্দুক উপেক্ষা করে জোতদারদের গুণ্ডাবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। গুলি ছুড়ে আরো কয়েকজনকে আহত করা হয়। কিন্তু তাতেও তারা দমেনি। অবস্থা বেগতিক দেখে জোতদারদের গুণ্ডাবাহিনী পলায়ন করে। স্বভাবতই অতঃপর জোতদারদের ও ধনীদের স্বার্থ রক্ষার্থে দ্রুত সেখানে পুলিশের আবির্ভাব ঘটে। পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাবে সবাই হতবাক হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি পুলিশ কী করে এলো? বস্তুত আগে থেকে ষড়যন্ত্র ও যোগাযোগের ফলেই এত দ্রুত পুলিশের আমদানি হয়েছিল। পুলিশ এসে তগনারায়ণের মৃতদেহ কেড়ে নিল। কিন্তু পরের দিন ২৮ মাইল হেঁটে এক ঐতিহাসিক মিছিল নীলফামারীতে উপস্থিত হলো। তখন ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবস্থা। ওই দাঙ্গা উপেক্ষা করে ২৫ হাজার লোকের এক মিছিল নীলফামারীতে উপস্থিত হলো। আওয়াজ উঠল—"হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, মেহনতি মানুষের জাতিভেদ নাই; জোতদারি ষড়যন্ত্র ধ্বংস কর, তে-ভাগা আইন পাস কর" প্রভৃতি। দাঙ্গার আশঙ্কা সেখানে এভাবে শেষ হয়ে গেল। অনেক জায়গায় প্রতিরোধের মুখে দালালরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো। এরপর সশস্ত্র পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হতে থাকল।

সশস্ত্র পুলিশ দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানার খাঁ-পুরে কৃষক নেতা চিয়ার সাঁই সমেত ২৬ জনকে হত্যা করে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে চিরিরবন্দরে

(দিনাজপুর) শিবরাম (সাঁওতাল) ও নিঃস্ব কৃষক সমিরউদ্দিনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। ১৯৪৭ সালে নালিতাবাড়ির কাছে জোতদার বিনোদ পাল গুণ্ডা লেলিয়ে সর্বেশ্বর ডালুকে হত্যা করে। এটা ছিল টংক এলাকার মধ্যে। এখানে ঐক্যবদ্ধ কোনো তে-ভাগা আন্দোলন হয়নি। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে জোতদার-জমিদারের দালাল, গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশ ভাগচাষিদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলে, মেয়েদের ধর্ষণ করে এবং গ্রামে গ্রামে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে। সারা প্রদেশে ৩১১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, হত্যা করা হয় ৫০ জনকে। এই নৃশংস অত্যাচারের কোনো অজুহাত ছিল না, কারণ কৃষকরা কোনো জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করেনি। কেবল কায়েমি স্বার্থবাদীদের স্বার্থরক্ষার জন্যই সরকার এরূপ বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল।

তে-ভাগা সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য

তে-ভাগা সংগ্রামের কতগুলো বিশেষ দিক আছে, বিশেষত্ব আছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে মুসলিম লীগের জোয়ারের ফলে জনসাধারণের ওপর মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির বিরাট প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে। সংগ্রাম হিন্দুর বিরুদ্ধে। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় সে সময় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। তার ক্ষত তখনো শুকিয়ে যায়নি। এই অবস্থার পটভূমিতে কৃষক সমিতি হিন্দু, মুসলিম ও উপজাতি কৃষকের এক বড় অংশকে তে-ভাগার সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম হয়। তাঁরা শুধু সক্রিয় অংশ গ্রহণই করেননি চিয়ার সাঁইয়ের মতো নেতা, সমিরউদ্দীনের মতো নিঃস্ব কৃষক বীরের মতো অকুতোভয়ে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন।

এই সময়ে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক জিগিরে মুসলমান সমাজের প্রায় সব শিক্ষিত ব্যক্তি পাকিস্তানের সমর্থক হয়ে পড়েন। অন্যদিকে হাতে গোনা যায় এমন কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান নেতা কৃষক আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁরা হচ্ছেন—হাজী মোহাম্মদ দানেশ (দিনাজপুর), আলতাব আলী (ময়মনসিংহ), মোহাম্মদ ইয়াকুব মিয়া (কুমিল্লা), মুন্সী জহিরউদ্দিন (ময়মনসিংহ), ডা. আবদুল কাদের (বগুড়া), কছিম মিয়া (রাজশাহী) ও নূরজালাল মিয়া (যশোর) প্রমুখ। এসব শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনের মধ্য থেকে নেতা গড়ে ওঠে। চিয়ার সাঁই, নিয়ামত আলী, জামসেদ আলী চাটি, বাচ্চা মামুদ (দিনাজপুর, রংপুর), সাবির মণ্ডল, মন্তাজউদ্দিন, মজিদ

মিয়ার (ময়মনসিংহ) নাম এই সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য। রাজবংশীদের মধ্যে বহু নেতা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কম্পরাম সিং, তাঁকে ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি করে হত্যা করা হয়। আরো ছিলেন রূপনারায়ণ রায় (তিনি ১৯৪৬ সালে যুক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। নকশালপন্থীরা তাঁকে ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ হত্যা করে), আভরণ সিং, রাম সিং (দিনাজপুর), তগনারায়ণ, দীন দয়াল, কালাচাঁদ (রংপুর)। ময়মনসিংহে হাজংদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির নেতা হচ্ছেন ললিত সরকার, বিপিন গুণ, পরেশ সরকার, কাঙাল দাস, গজেন্দ্র রায়, নয়াম সরকার প্রমুখ।

শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত থেকে আসা এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এসব বিপ্লবী চিন্তাধারার কর্মী অত্যন্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে মেয়েদের এক বিরাট অংশ তে-ভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শুধু যে তাঁরা ভলান্টিয়ার ছিলেন তাই নয়, তাঁদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ও কৌশলী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। রাজবংশী মেয়ে ভাণ্ডনী পুলিশের এক জমাদারের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে তাকে সারারাত এক ঘরে আটকে রাখেন। দিনাজপুরের রানীশংকাইলের রাজবংশী কৃষকবধূ জয়মণির প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড। তাঁর দলের আক্রমণে অনেক সময় পুলিশ পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি সামান্য লেখাপড়া জানতেন। এমন আরেকজন নেত্রী ছিলেন দিনাজপুরের দীপপুরী। তিনি ভলান্টিয়ারদের উৎসাহ দিয়ে নিজেই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে পুলিশকে আক্রমণ করেন। পুলিশ পিছু হটে পলায়ন করে। দিনাজপুরের আরো অনেকের নাম করা যায়, যেমন শিখা বর্মণ, মাতি বর্মণী, জয় বর্মণী।

কৃষক আন্দোলনের একজন দুর্ধর্ষ নেত্রী ছিলেন সরলাদি। তিনি ছিলেন এক নমঃশূদ্র কৃষক মহিলা। যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার গোয়াখোলা গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ি। নড়াইলে যে তে-ভাগা আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কেন্দ্র ছিল বাকড়িগ্রাম। সরলাদির যেমন ছিল সাহস, তেমনি গায়ে ছিল জোর। পুরুষরাও তাঁর কাছে হার মানত। সরলাদি আড়াইশ-তিনশ মেয়ের একটি ঝাঁটা বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন। ঝাঁটার মুখে দুই-দুইবার পুলিশ বাহিনীকে মাফ চেয়ে সরে পড়তে হয়। ভলান্টিয়ার বাহিনী ঢাল-সড়কি নিয়ে পাহারা দিত। অনেক সময় পুলিশ তাদের ব্যূহ ভেদ করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত। পুলিশ সরলাদিকে ধরার জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই তিনি বুদ্ধির জোরে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে বেষ্টনী ভেদ করে চলে গেছেন। সরলাদি আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী সেখানকার কৃষকরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সাফল্য ও ব্যর্থতা

১৯৪৬ সালে আবার টংক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় সিংহের বাংলা গ্রামে, রামেশ্বরপুরে, কিশোরগঞ্জের চাতল ও টংক এলাকার মধ্যে হালুয়াঘাটের এক অংশে কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত নেতৃত্বে তে-ভাগা আন্দোলন শুরু হয়। রামেশ্বরপুরে সেতু রায় ছিলেন নেতা, তিনি ছিলেন স্থানীয় লোক। এখানে আন্দোলনের শক্তিতে আমরা একটি আপস সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হই। আধিয়ারেরা পাবে নয় আনা, আর মালিক পাবে সাত আনা। হালুয়াঘাটেও আমরা আপস সিদ্ধান্তে পৌঁছি। কৃষক পাবে দশ আনা আর মালিক পাবে ছয় আনা। এটা টংক এলাকার মধ্যে ছিল বলে এখানে আমাদের সংগঠন ছিল শক্তিশালী। কাজেই আপসরফায় বেগ পেতে হয়নি।

আন্দোলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার নেতাদের ওপর দমনপীড়ন নেমে এলো। নেতারা সবাই আত্মগোপন অবস্থায় চলে গেলেন। ময়মনসিংহ জেলায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই তে-ভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। লীগের নেতা গিয়াসউদ্দীন পাঠান (মরহুম) মন্তব্য করলেন, "কমিউনিস্টরা এমন এক আওয়াজ তুলেছে যে, এ ব্যাপারে হ্যাঁ করাও বিপদ, আবার না করাও বিপদ।" তাঁরা মাথা খাটাতে লাগলেন। অনেক মাথা খাটিয়ে গিয়াসউদ্দীন পাঠান কিশোরগঞ্জের চাতলে উপস্থিত হলেন। তিনি চাতলে একটি সভা ডাকলেন। তাঁর বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, "শুনেন মিয়ারা, আমরা কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তান আনছি। পাকিস্তান কী? মুসলমানের সেই বাদশাহি জামানা! তখন তে-ভাগা তো তুচ্ছ, আপনারা চৌ-ভাগা পাবেন, চৌ-ভাগা! কয়েকটা কমিউনিস্টের পাল্লায় পড়ে জেল খাটার বন্দোবস্ত হয়েছে, ছাড়েন এদের পাল্লা। আইন মোতাবেক চলেন। ললিত বাগচীর ধান ললিত বাগচীর বাড়ি দিয়ে আসেন (ললিত বাগচী ছিলেন এলাকার মূল জোতদার, তাঁর জমিতে তে-ভাগা করা হয়েছিল)।" প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতার বক্তব্য মুসলিম কৃষকদের মধ্যে জাদুর মতো কাজ করল। ভাগচাষির বাড়িতে জমা করা ধান মুসলিম কৃষকরা মাথায় করে ললিত বাগচীর বাড়িতে পৌঁছে দিল। তে-ভাগা আন্দোলন চাতলে ব্যর্থ হলো। এটা ছিল একটি নতুন এলাকা। আমরা এখানে ভাগচাষিদের শ্রেণিসচেতন করে তুলতে পারিনি। ফলে আমাদের আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। নিঃস্ব ভাগচাষির শ্রেণিসংগ্রামের মুখে দুই পরস্পরবিরোধী সাম্প্রদায়িক নেতার শ্রেণিস্বার্থের এই অপূর্ব মিলন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

নেত্রকোণার সিংহের বাংলা গ্রামে আমরা জয়লাভ করতে পারিনি সত্য, কিন্তু একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে আজও ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এখানে মালিকরা ছিলেন হিন্দু ও ভাগচাষিদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান। ভাগচাষিরা ছিলেন খুব গরিব। অন্যান্য জায়গার মতো এখানে পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। ভাগচাষিদের মনে ভীতির সঞ্চার করছিল, জেলের ভয় দেখাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, আমাদের এক কর্মী নিত্যানন্দকে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করেছিল। নেতারা তখন আত্মগোপনে। নিত্যানন্দকে প্রহার করা হয়েছে এই খবর গ্রামে বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে। নিত্যানন্দ ছিল এখানে একজন জনপ্রিয় কর্মী। গ্রামে সবাই ক্ষুব্ধ কিন্তু কোনো প্রতিবাদ মিছিল বের করা সম্ভব হয়নি। কারণ এখানকার সংগঠন ছিল দুর্বল। ভাগচাষিদের মেয়েরা গরিব ও পর্দানশীল। আমাদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বা কথাবার্তা ছিল না। রাজবংশী নমঃশূদ্র বা হাজং মেয়েদের মতো তাঁরা বের হতেন না। কাজেই আমরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতাম না। তাঁরা পর্দার আড়ালে থাকতেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন না। তাঁদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এলাকাটিও আমাদের জন্য ছিল অপেক্ষাকৃত নতুন।

এই সময় একদিন দুজন সশস্ত্র পুলিশ খুব দাপাদাপির পর এক গরিব কৃষকের বাড়ির বাইরে, এক গাছতলায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল। এমন সময় ওই বাড়ি হতে দুজন মুসলমান যুবতী বধূ দুটি দা হাতে রণমূর্তির বেশে বের হয়ে এলেন। তারা সামাজিক রীতিনীতি ভুলে গেলেন। উচ্চ স্বরে চিৎকার করে নিজেদের ভাষায় বললেন, "বান্দির পুতরা, আমরার লুকেরে মারছস্ কেন? এই দাও দিয়া তরারে জবো কইরা ফালাইবাম!" যুবতীদের আকস্মিক এই রণমূর্তি দেখে হতচকিত ও ভীতসন্ত্রস্ত এই পুলিশদ্বয় রাইফেল ফেলে যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালিয়ে গেল। যুবতী দুজন এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওই সময়ে এই এলাকার সরকারের খুব খয়ের খাঁ এক মুন্সী ওই দিকে আসার সময় যুবতীদের দেখে বললেন, "যা, যা তোরা বাড়ির ভেতরে আবরুর মধ্যে যা।" অনুগত মুন্সী সাহেব সরকারি বন্দুক ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে সরকারি মাল পৌঁছাবার জন্য দুই কাঁধে দুই রাইফেল নিয়ে চার মাইল দূরে থানায় উপস্থিত হলেন। মুন্সী ভেবেছিলেন, সরকারের এত বড় একটি কাজ করলেন, সেজন্য প্রশংসা তো পাবেনই, এমন কি ইনাম-বখশিশও নিশ্চিতভাবে মিলবে। কিন্তু হায়! ফল বিপরীত হলো। দারোগা মুন্সীকে উত্তম ধোলাই দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। উপকার হলো এই যে, তাঁর ব্রিটিশ-ভক্তির নেশা চিরতরে ছুটে গেল।

তে-ভাগার ব্যর্থতার কারণ

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলোর হাতে। এতে মুসলিম লীগ সরকারের ধারণা হলো, তারাই প্রাদেশিক শাসনকর্তা হচ্ছে। তাই আমলারা লীগ মন্ত্রীদের মনে এই ধারণা দিলেন যে, তে-ভাগা আন্দোলন যদি নির্মমভাবে দমন না করা হয়, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই মুসলিম লীগ সরকার রাজনৈতিক কারণে আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। কংগ্রেস নেতারা ভাবলেন, কেন্দ্রের ক্ষমতা তাঁদের হাতে আসবেই; কিন্তু যদি তে-ভাগা আন্দোলন দমন করা না হয় তবে গ্রামগুলো কমিউনিস্টদের শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এই ধরনের ভীতিতে কয়েকজন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা তে-ভাগা আন্দোলন দমন করার দাবি তুললেন। কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের ভূ-স্বামীরা তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তে-ভাগা যাতে সফল হতে না পারে তার চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। আন্দোলনের চাপে তখনকার বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব 'বেঙ্গল বর্গাদার বিল' এনেছিলেন ২১ জানুয়ারি ১৯৪৭-এ। ওই বিলের কথা ছিল ভাগচাষিরা তিন ভাগের দুইভাগ পাবে। মালিক যদি চাষাবাদের যাবতীয় ব্যয় বহন করে, তবে ভাগ হবে অর্ধেক। ভাগচাষি মালিকের প্রাপ্য অংশ মালিককে যদি দেন, তবে তাঁকে উচ্ছেদ করা যাবে না ইত্যাদি। লীগের আইন পরিষদের সদস্য, যাঁদের অধিকাংশ ছিলেন জোতদার, তাঁরা দাবি তুললেন—এই খসড়া বিল প্রত্যাহার করতে হবে। এটাও শোনা যায় যে, তাঁরা বলেছিলেন এই বিল আইন পরিষদে আনলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে। ফলে ওই বিল কোনোদিন আইন পরিষদে আসেনি।

দেশ ভাগাভাগির পটভূমিতে প্রচণ্ড দমননীতির ফলে ভাগচাষিদের আন্দোলন সফল হতে পারেনি। তাছাড়া লীগ ও কংগ্রেস দুটি বড় সংগঠনই এর বিরোধী ছিল। শ্রেণিস্বার্থে পরস্পরবিরোধী সামন্ত ও বুর্জোয়ারা এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

মুসলিম লীগ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলামানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। ভারতের যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল এলাকা নিয়ে এই রাষ্ট্র গঠন করতে হবে—এটাই ছিল দাবি। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব লাহোরে গ্রহণ করে। মুসলিম সামন্ত ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী বণিকরা হিন্দু বুর্জোয়া বিশেষত মাড়োয়ারি, গুজরাটি ও পার্সি বুর্জোয়াদের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় এঁটে (সামলে) উঠতে পারছিল না। তারা তাই চাচ্ছিল এমন একটা প্রতিযোগিতাহীন বাজার, যেখানে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে নিরঙ্কুশ। গোষ্ঠীগত ও শ্রেণিস্বার্থে তারা তাই 'পাকিস্তান' দাবি তোলে এবং মুসলিম জনগণকে বলে যে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ভারতের সকল সাধারণ মুসলিম মানুষের মঙ্গল আসবে। এই গোষ্ঠীরই নেতৃত্বাধীন দল মুসলিম লীগ। ব্রিটিশ সরকার এদের সমর্থন করে।

ভারতের জাতীয় দল হিসেবে গড়ে ওঠে কংগ্রেস এবং তাদের সমর্থক ছিল মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়। ওই কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়াদের হাতে। তাদের আওয়াজ ছিল অখণ্ড ভারত। কিন্তু কংগ্রেস পরে খণ্ডিত ভারতে রাজি হয়। ভারতবর্ষে যে বহু ভাষাভাষী জাতির বাস তা কংগ্রেস কোনো সময় স্বীকার করেনি। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতির অনেক ভুল-ত্রুটি ছিল। এই কারণে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তোলার আরো সুবিধা পায় এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে। মুসলিম লীগ কোনোদিনই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম করেনি। বরং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে মুসলিম লীগ জনতাকে দূরে রেখেছে। বুর্জোয়া নেতৃত্বে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম করেছে তাদের নিজস্ব কায়দায়। তাদের নীতি ছিল অহিংস। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতা। ১৯২১ সালের কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এতে ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সে সময় ভারতবর্ষব্যাপী হিন্দু-মুসমানদের মিলিত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন খুব বেকায়দায় পড়ে ওই সময় মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করে দেন। যুক্তি হচ্ছে আন্দোলন অহিংসার পথ অতিক্রম করে হিংসার পথ গ্রহণ করেছে।

ঘটনাটি হলো, চৌরীচোরার কৃষকরা পুলিশি জুলুম বন্ধ করতে না পেরে থানা জ্বালিয়ে দেয়। তাতে বেশ কয়েকজন পুলিশ পুড়ে মারা যায়। এই অজুহাতে আকস্মিকভাবে আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার কারণে সমগ্র ভারতে খুব বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। মুসলিমদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ড। এরপর আর কোনোদিন হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপক মিলিত জাতীয় সংগ্রাম হয়নি। বিভেদ আরো প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। কারণ বুর্জোয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব সকল সময় তাঁদের কর্তৃত্বে ও স্বার্থে আন্দোলন চালিত করেছেন। যা হোক, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জাতীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতার ইতিহাস দীর্ঘ। আমাদের বিচারে এই ব্যর্থতার জন্যই এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ সরকার এই তিনের সমঝোতায় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল।

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ায় মেহনতি মানুষের মুক্তির যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। কংগ্রেস ও লীগের মনোভাব ছিল ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ হয়ে গেলে শান্তির মনোভাব বজায় থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ১৯৪৭-এ ভাগাভাগির সময় পাঞ্জাবে প্রচণ্ড দাঙ্গা হয়। বহু হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় প্রাণ হারান। অসংখ্য নারী নির্যাতিত হন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান নর-নারী পিতৃপুরুষের ভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। এরপরও '৬৪ সালে দাঙ্গা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার কারণে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুরা কোনো সময়ই পূর্ণ নিরাপত্তা অনুভব করেননি। অপরদিকে একই কারণে ভারতের মুসলমানগণও নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেননি। ফলে পাকিস্তান থেকে এক বিরাটসংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। তেমনি এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসেন। এতে কোটি কোটি লোকের অশেষ অবর্ণনীয় ও সীমাহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে; শত-সহস্র নিরীহ নির্দোষ জীবন অকালে ঝরে পড়েছে। তাছাড়া সারা ভারতে যে প্রগতিশীল আন্দোলন পড়ে উঠেছিল, তা সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে গতিহীন ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তরাও সম্প্রদায় ও ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেলেন। এতে প্রগতিশীল আন্দোলনের অপূরণীয় ও গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। আশ্চর্য যে, স্বদেশের নেতাদের সমর্থন ও অনুমোদনেই ইংরেজ-রাজ স্বীয় সুদূরপ্রসারী স্বার্থ রক্ষার্থে তার রাজনৈতিক বিষাক্ত কুঠার উপমহাদেশের বক্ষে বসিয়ে দিয়ে গেল। আর এর রক্তক্ষরণ আজও শেষ হয়নি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। আর ১৫ আগস্ট ভারত রাষ্ট্র গঠিত হলো।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাস পরেই ১৯৪৮ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি। সাতদিন এ কংগ্রেসে আলোচনা হয়। কলকাতায় মোহাম্মদ আলী পার্কে বিরাট চাঁদোয়ার নিচে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার পর এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পর এবং ভারত ভাগ করে দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল বেশ কিছুকাল পর্যন্ত সারা-ভারতীয় দলের কাঠামোতেই ছিল। এই কারণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পাকিস্তানের কমরেডরাও উপস্থিত হন। এভাবে ভারতের ও পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেলিগেট এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। ৯১৯ জন ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধি; এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৬৩২ জন। ব্রিটিশ আমলের পার্টি কাঠামোর ভিত্তিতে সে সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ডেলিগেট যান ১২৫ জন। তখন সারা ভারতের পার্টি সভ্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ হাজার। পূর্ব পাকিস্তানে সভ্য ছিল ১২ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র জনপাঁচেক ওই কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি থেকে যুগোশ্লাভিয়ার যুগোভিচ ও দেদিয়ার, অস্ট্রেলিয়ার পার্টি থেকে লরেন্স সারকি, বার্মার পার্টি থেকে পার্টি সম্পাদক থানটুন কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল খুব উত্তেজনাপূর্ণ। তিনি বলেন, "সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই মুক্তি আসবে; আমরা সেই পথেই চলেছি।" ওই কংগ্রেসের মূল দলিল উপস্থিত করেন বি টি রনদিভে। কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় ছিল অতীতের কার্যকলাপের মূল্যায়ন এবং রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ।

রনদিভের করা সমালোচনায় বলা হয়, "এতদিন আমরা সংস্কারপন্থী পথে অগ্রসর হয়েছি, বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি করেছি। স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারিনি। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমঝোতার ভিত্তিতে তথাকথিত স্বাধীনতা এনেছে। এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়। যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার মতো এখনো বিপ্লবী অবস্থা বিরাজ করছে, কাজেই সংগ্রাম করে বুর্জোয়া নেতৃত্বের উচ্ছেদ করতে হবে" ইত্যাদি। মোট কথা 'ভুয়া স্বাধীনতা'র বিরুদ্ধে ধর্মঘট, জঙ্গি মিছিল, সভা ও সশস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতির আহ্বান জানানো হয়।

পরে নীতিগতভাবে বলা হয় যে, “ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিলম্বিত, অথচ পৃথিবীতে প্রলেতারিয়ান বিপ্লব সমাধা হয়েছে। কাজেই দুই বিপ্লব অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে এবং ভারতের বিপ্লবের স্তর হলো সমাজতান্ত্রিক। সর্বহারা অর্ধ-সর্বহারাদের নিয়ে বিপ্লবে এগিয়ে যেতে হবে। এতদিন পি সি যোশীর নেতৃত্বে আমরা সংস্কারপন্থা অবলম্বন করে চলেছি। কাজেই পার্টি তার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংগ্রাম করে বুর্জোয়া নেতৃত্ব উচ্ছেদ করতে হবে।”

এই কংগ্রেসে আমরা যারা পাকিস্তান থেকে গিয়েছিলাম, আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। কাজেই আমাদের পার্টিকেও পৃথকভাবে পাকিস্তান ভিত্তিতে নতুনভাবে গঠন করতে হবে। আগেই বলেছি যে, ১৯৪৭-এর আগস্টে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের মতো কমিউনিস্ট পার্টিও নিখিল ভারত ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এরপর মুসলিম লীগ, কংগ্রেস প্রভৃতি সংগঠনেও দুই রাষ্ট্রের জন্য আলাদাভাবে সংগঠন গঠিত হয়। আমরাও চিন্তা করি যে, যখন আমাদের পৃথক দুটি রাষ্ট্র হয়েছে, তখন দুই পার্টি হওয়াই সঙ্গত। কারণ কমিউনিস্টরা নিজ নিজ রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই কাজ করে থাকে। পাকিস্তান একটি আলাদা রাষ্ট্র, এর সমস্যাও আলাদা। তাই এখানে আলাদা পার্টি করতে হবে। কাজেই পাকিস্তান থেকে যে সব প্রতিনিধি কলকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ৬ মার্চ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের পার্টি সংগঠিত করেন। এইভাবে আমাদের বর্তমান পার্টির প্রতিষ্ঠা।

ভারতের প্রতিনিধিরা বি টি রনদিভেকে ভারতের পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। পি সি যোশী কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নির্বাচিত হতে পারলেন না।

পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ভিন্ন স্থানে সমবেত হয়ে পাকিস্তানের পার্টির জন্য পৃথক সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ৯ জন নিয়ে পাকিস্তানের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এঁরা হলেন : সাজ্জাদ জহির, আতা মোহাম্মদ, জামাল উদ্দীন বুখারী, ইব্রাহিম (শ্রমিক নেতা), খোকা রায়, নেপাল নাগ, কৃষ্ণবিনোদ রায়, মনসুর হাবিব ও মণি সিংহ। পলিটব্যুরো গঠন করা হয় সাজ্জাদ জহির, খোকা রায়, কৃষ্ণবিনোদ রায়কে নিয়ে। মনসুর হাবিব ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। পরে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে যখন বন্দীদের ওপর গুলি চালানো হয়, তখন তিনি আহত হন। তিনি পরে ভারতে চলে যান। মনসুর হাবিব বর্তমানে (গ্রন্থটি রচনাকালে) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার এবং হালে মন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন। কৃষ্ণবিনোদ রায়ও গ্রেপ্তার হন। পরে তিনিও পশ্চিমবঙ্গে চলে যান।

ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকার কমিউনিস্টদের কলকাতা কংগ্রেসের পর ব্যাপকভাবে ধরপাকড় ও তাঁদের ওপর অকথ্য দমননীতি চালাতে থাকে। ফলে পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের আত্মগোপনে থেকে কাজ চালাতে হয়।

ব্রিটিশ কর্তৃক ১৯৪৭-এ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বিপ্লবের স্তর প্রভৃতি সম্পর্কে রনদিভের রিপোর্ট ও থিসিসে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয় পাকিস্তানের পার্টিও তা সেদিন যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করেছিল।

রনদিভের থিসিসে বলা হয়েছিল যে, ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে এবং ভারতীয় বিপ্লবের স্তর হলো সমাজতান্ত্রিক। এই বক্তব্য ছিল নীতিগতভাবে ভুল। গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—দুটি স্বতন্ত্র স্তর। একটি সম্পাদনের পরেই অপরটি সম্পাদন করা সম্ভব—এটাই লেনিনের শিক্ষা। অথচ, রনদিভের বক্তব্যে দুটিকে একটি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে তখন ভারতীয় বিপ্লবের স্তর ছিল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও ধনিক বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। এটা উপেক্ষা করে ভারতীয় বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক—এভাবে বিপ্লবের স্তর চিহ্নিত করাও ছিল ভুল। এই ভুল পার্টি, আন্দোলনকে অনিবার্যভাবে বামপন্থী হঠকারিতার দিকে নিয়ে যায়। পাকিস্তানেও আমরা হঠকারী লাইন অনুসরণ করি।

রনদিভের থিসিসে—১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাকে ভুয়া স্বাধীনতা এবং জনগণ তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তৈরি—সেকথা বলে বুর্জোয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। অথচ সে সময় ভারত কি পাকিস্তান কোথাও জনগণ অনুরূপ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সারা ভারতে আন্দোলনের যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তার পরিবর্তন ঘটে। অথচ রনদিভের থিসিসে তা কোনোরূপ হিসেবের মধ্যেই নেওয়া হয়নি। তাছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভুয়া এই বক্তব্যও সত্য ছিল না। এর ফলে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়েছিল। এই ঘটনা তাৎপর্যহীন ছিল না। বস্তুত সে সময়ে রনদিভের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল—তা ছিল ভুল ও হঠকারী।

পাকিস্তানের পার্টিও সেই ভুল থিসিস গ্রহণ করায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে এটা কার্যকর করতে গিয়ে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ক্ষেত্রে মারাত্মক শিশুসুলভ বামপন্থী হঠকারী ভুল করা হয়। তাতে পার্টি ও গণ-আন্দোলন দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একটি ঘটনা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্ট পার্টি কোনো সময়ই স্বেচ্ছায় আত্মগোপনে যায়নি। নির্যাতনের মুখে তাদের প্রকাশ্য কাজকর্ম অসম্ভব করে তোলা হয়েছে। বাধ্য করা হয়েছে আত্মগোপনে যেতে।

কোর্ট হাউস স্ট্রিটে ঢাকা জেলা কমিটির অফিস ছিল। তাছাড়া কলতাবাজারে ঢাকা জেলা সংগঠনের একটি আবাসস্থলও ছিল। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় ১৩ মার্চ মুসলিম লীগ গুণ্ডারা ওই অফিসে হামলা করে। তারা বইপত্র ও আসবাবপত্র তছনছ করে। ১০ মার্চ রণেশ দাশগুপ্ত ও ধরণী রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ভাষা আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলেও রণেশ দাশগুপ্তকে তাঁদের সঙ্গে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের বন্দীরা বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষভাবে চাপাচাপি করলে ১৫ মার্চ রণেশ দাশগুপ্ত ও ধরণী রায়কে বন্দীদের সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই বছরের জুন মাসের মাঝামাঝি মেয়েদের দিয়ে একটি জনসভা আহ্বান করানো হয়। পুলিশ ও মুসলিম লীগ গুণ্ডারা ওই সভায় হামলা করে। নিবেদিতা নাগসহ এগার জন নারী কমরেডকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পার্টির নির্দেশে করনেশন পার্কে একটি জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। ৩০ জুন করনেশন পার্কে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন মুনীর চৌধুরী (একাত্তরে শহীদ হন)। সভায় সরদার ফজলুল করিম ও রণেশ দাশগুপ্তের বক্তৃতা দেওয়ার কথা স্থির করা হয়। ফজলুল করিম স্থানীয় সমস্যা ও কর্মসূচির বিষয়ে বললেন। রণেশ দাশগুপ্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তৃতা করলেন। জনসভায় হাজারখানেক লোক উপস্থিত ছিল। এই সময় শাহ আজিজুর রহমান তাঁর দলবল নিয়ে সভায় উপস্থিত হন। সরদার ফজলুল করিম তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরেই শাহ আজিজের দল সভাপতির কাছে একের পর এক চিরকুট পাঠিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দাবি করতে থাকে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছাড়াও কমনওয়েলথ ছাড়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। উভয় বক্তাই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। শাহ আজিজের এই গোলমালের পর মুনীর চৌধুরী সাধারণভাবে কিছু বলে সভা ভেঙে দেন।

সভা ভঙ্গের বিরুদ্ধে শাহ আজিজের দল প্রতিবাদ করতে থাকে এবং তাদের বক্তব্য পেশ করার অধিকার দাবি করেন। তারপর কিছু ধাক্কাধাক্কি হয়। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা সভাস্থল ত্যাগ করে অফিসের দিকে চলে যান। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা চলে যাওয়ার পরই শাহ আজিজ মাঠ দখল করে কিছুক্ষণ কমিউনিস্ট পার্টিকে গালাগালি করে।

৩০ জুন করনেশন পার্কের সভার পর প্রায় এক হাজার লোক কোর্ট হাউস স্ট্রিটের পার্টি অফিস ঘেরাও করে আক্রমণ চালায়। ফলে তাদের সঙ্গে অফিসের লোকজনের প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী তুমুল খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিনয় বসু, অমূল্য সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম ছাড়াও প্রায় কুড়িজন যুবক তখন অফিসের মধ্যে ছিলেন। সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে পার্টি অফিসের মধ্যে গুণ্ডারা প্রবেশ করতে পারেনি। সে সময় পার্টিকে বে-আইনি করা হয়নি সত্য, কিন্তু নানা প্রকার নির্যাতনের মাধ্যমে পার্টির কাজ কার্যত অসম্ভব করে তোলা হয়। ৭ জুলাই রণেশ দাশগুপ্ত ও ধরণী রায়কে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর প্রকাশ্য কাজ বন্ধ করে বাধ্য হয়ে গোপনে কাজ করার ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি নির্যাতনই পার্টিকে এই পথ বেছে নিতে বাধ্য করে।

টংক আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায় : সম্মুখ সংগ্রাম ও গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হালুয়াঘাটের নাগেরপাড়ায় ময়মনসিংহ জেলা কমিটির মিটিং ডেকে পুনরায় টংক আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সময় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন খোকা রায়। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, পাকিস্তানের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রথমবারের মতো কলকাতার অধিবেশন ছাড়া আর কোনোদিন বসতে পারেনি। সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহিরের বাড়ি ছিল লক্ষ্ণৌ। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসেন। ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ১২০০ মাইল। বিমান ছাড়া যাতায়াতের তেমন পথ নেই। অপরদিকে নেতৃত্বের সবাই তখন আত্মগোপনে। কাজেই যোগাযোগ বলতে গেলে প্রায় ছিলই না।

ভারতের পার্টি-কংগ্রেস যে দলিল গৃহীত হয়—পাকিস্তানের পার্টি তাঁর সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় রদবদল করে গ্রহণ করে। আমরা এতদিন সংস্কারপন্থায় ডুবে

ছিলাম—এই বেদনা বিপ্লবী হিসেবে আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কাজেই আমরা জঙ্গি আন্দোলন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি। জেলা কমিটির প্রস্তাবের পর বিভিন্ন এলাকার কমরেডদের মধ্যে স্থানীয় কমিটি ডেকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। রাজনৈতিকভাবে আমরা সংস্কারপন্থী বিচ্যুতি করেছি—এটাও বলা হয়। পুনরায় টংক আন্দোলন করার জন্য দিকে দিকে প্রচার চালানো হয় খুব তড়িৎগতিতে। এই আন্দোলন ছিল খুব জঙ্গি। এই এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে। এই দীর্ঘ এলাকায় পাহাড়ের পাদদেশে দুই-তিন মাইল অন্তর অন্তর সরকার সশস্ত্র পুলিশ বসিয়ে দেয়। এক একটি ক্যাম্পে পঁচিশ-ত্রিশজন করে সশস্ত্র সিপাই থাকত। পুলিশের সঙ্গে তখন আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছে। এখানে সব সংগ্রামের উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

কয়েকটি সংগ্রামের কথাই উল্লেখ করব। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার টংক প্রথার সংস্কার করে, কিন্তু টংক প্রথা উচ্ছেদ করে না। একথা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই আওয়াজ উঠল, “টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই”, “জান দেব তবু ধান দেব না”, “জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই”, “লাঙল যার জমি তার” প্রভৃতি। এই প্রচার দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। পাহাড়ি এলাকা থেকে মুসলমান এলাকাতেও আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমান টংক চাষিরা তা গ্রহণ করলেন। যদিও তারা হাজং, ডালু, বালাই প্রভৃতির মতো জঙ্গি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েননি, তবু তারাও টংক বন্ধ করে দিলেন। মুসলিম এলাকায় টংকের হার ছিল বেশি, তাছাড়া লেভি ধানের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলছিল।

প্রথমে জবরদস্তি করে নীল চাঁদ হাজং-এর টংকের বিশ মণ ধান চৈতন্যনগর থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা ওই ধান কেড়ে নিয়ে নীল চাঁদকে ফেরত দিল। জমিদারের লোকেরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। এ ঘটনা জনতার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমান, গারোসহ সমগ্র জনসাধারণ এই আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। ১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারি কলমাকান্দা থানার বটতলায় টংক ধান আটক হলো। সংবাদ পেয়ে পরের দিন দারোগা ছয়জন সশস্ত্র পুলিশ, আনসার ও চৌকিদার নিয়ে এসে ২০ মণ ধান গরুগাড়ি বোঝাই করে রওয়ানা হতেই কৃষকরা গাড়ির পথ রোধ করে দাঁড়াল। আনসাররা লাঠি চালিয়ে কয়েকজন কৃষককে আহত করল। আনসারদের বিরুদ্ধে কৃষকরা ক্ষেপে ওঠেন। তাঁরাও লাঠি দিয়ে আনসারদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করেন। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ গুলি চালিয়ে দুজন কৃষককে আহত করল। গুলি চলছে দেখে কৃষকরা মাটিতে শুয়ে পড়ল। গাড়ি চলছে দেখে গাড়ির গতি রোধ করল। এইরূপ অবস্থা দেখে দারোগা ভয় পেয়ে গেলেন। মনে করলেন আরো লোক নিশ্চয়ই এসে জুটবে। তিনি বললেন, “সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চল আমরা

চলে যাই।" ক্ষণিকের মধ্যে তারা হাওয়া হয়ে গেল। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে বলদ দুটি খুলে গাড়িটি মাঠে ফেলে রেখে চলে গেল। কৃষকরা আওয়াজ তুললেন, "জান দেব তবু ধান দেব না।" আহত চাষি দুজনকে পিঠে বহন করে তাঁরা গ্রামে ফিরে গেলেন।

এরপর ২৬ ফেব্রুয়ারি চৈতন্যনগরে জমিদারি কাছারি দখল করা হলো। কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হলো। তহসিলদার ও পাঁচজন পেয়াদাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। বলা হলো—এখানে কেউ টংক ধান দেবে না। এর দুদিন পরে কালিকাপুরে দুই গাড়ি ধান আটক করা হলো। হাজং মেয়ে মানিক, কলাবতীসহ প্রায় কুড়িজন নারী ধানের গাড়ি আটক করল। বিহারি গাড়োয়ান ইতস্তত না করে নারীদের নির্দেশিত স্থানে ধান তুলে দিয়ে চলে গেছে। সরকারি কর্মচারীরা চাড়ুয়াপাড়া থেকে বিশ্বেশ্বরের ১০০ মণ লেভি ধান জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় পরেশ সরকারের নেতৃত্বে ভলান্টিয়াররা ধান আটক করল। বিশ্বেশ্বর বললেন, "আমার লেভি ধান দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। আমি টাকা চাই না।" সরকারি কর্মচারীরা তা মানতে অস্বীকার করলেন। জঙ্গি ভলান্টিয়াররা ওই ধান দুস্থ হিন্দু, মুসলমান, উপজাতিদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। বিশ্বেশ্বরের এই মহানুভবতা সবাই উত্তম কাজ হিসেবে প্রশংসা করল।

সব গ্রামে টংক ধান, লেভি, মহাজনের ধান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। লেঙ্গুরা পুলিশ ক্যাম্পের কাছে ২৮ জানুয়ারি এক বিরাট সভা হলো। তাতে টংক বন্ধ, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই প্রভৃতি আওয়াজ দেওয়া হলো। ৩০ জানুয়ারি রাশিমণি ও সুরেন্দ্রের স্মরণে শহীদ দিবস ফিরে এলো। চাড়ুয়াপাড়ায় জনসভা করে কর্মী ও ভলান্টিয়াররা দিকে দিকে প্রচারে বের হয়ে গেলেন। তাঁদের হাতে লাল পতাকা। ঘোষগাঁ হাটের দক্ষিণ ভালুকাপাড়া গির্জার সামনে একদল সিপাই ও আসনার কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করল। তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানানো হলো। কিন্তু সিপাইরা ছাড়ল না, বরং ভয় দেখাতে লাগল। সুচতুর নেতা নয়ান সরকার হাজং ভাষায় সবাইকে বল্লম থেকে পতাকা খুলে নিতে বললেন। তিনি তড়িৎগড়িতে রাইফেল ছিনিয়ে একজন সিপাইয়ের বুকে বল্লম বিদ্ধ করে দিলেন। এরই মধ্যে আরেকটি বল্লমের আঘাতে আরেকজন ধরাশায়ী হলো। এই সময়ে তারা আরেকটি বন্দুক ছিনিয়ে নিল। এই অবস্থায় সিপাই ও আনসাররা অন্য উপায় না দেখে পলায়ন করল। আগেই প্রচারিত হয়েছিল যে, হাজং কৃষকরা খুবই দুর্ধর্ষ। কখন কী করে তার ঠিক নেই। সশস্ত্র পুলিশরা তাই সবসময়ে খুব ভয়ে থাকত।

লেঙ্গুরা বাজার গারো পাহাড়ের সন্নিকটে। মঙ্গল সরকার এখানকার একজন দুর্ধর্ষ ও জঙ্গি কর্মী। তাঁর ছিল চরিত্রবল, দুঃসাহস। সে আবার কমিউনিস্ট

পার্টিরও সভ্য ও কর্মী ছিল। গ্রামের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে আমার কাছে নালিশ করল যে, মঙ্গল সরকার মদ খেয়ে যাকে তাকে মারধর করে। এমন কি কর্মীরাও বাদ যান না। এর একটি বিহিত করতে হবে। আমি মঙ্গল সরকারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে মদ খায় কিনা। সে বলল যে, সে মদ খায়। কারণ তাতে তাঁর যোশ পয়দা হয়। আমি বললাম, "মদ খেয়ে মাতলামি করে অন্যদের মারধর করা অন্যায়। তাছাড়া আমাদের দেশে মদ খাওয়াকে জনসাধারণ খারাপ চোখে দেখে। এখন সংগ্রামের সময় সব কর্মীকে জনপ্রিয় হতে হবে। এই অবস্থায় তোমার কাছে আমার প্রস্তাব হলো, তোমাকে মদ ছাড়তে হবে, না হয় পার্টি ছাড়তে হবে। তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হলো, তুমি চিন্তা করে আমাকে জবাব দেবে।" পরের দিন মঙ্গল সরকার এসে বললেন, আমি পার্টি কখনো ছাড়তে পারব না। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনোদিন মদ স্পর্শ করব না।" মঙ্গল সরকার তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে গিয়েছেন।

১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল সরকারের নেতৃত্বে একদল ভলান্টিয়ার লেঙ্গুরা হাটের দিন প্রচারের কাজে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে অবাঙালি সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্প ছিল। তারা সংখ্যায় ছিল পঁচিশ-ত্রিশজনের মতো। মঙ্গল সরকারের দল যখন স্লোগান দিল, "টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই", "বিনা খেশারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কর।" তখন ওই ক্যাম্পের পুলিশরা কোনোরূপ সতর্কতা ঘোষণা না করেই ভলান্টিয়ার দলের ওপর নৃশংসভাবে গুলি চালায়। ফলে মঙ্গল সরকার, অগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন। এই সংবাদ যখন গ্রামে পৌঁছাল তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবালবৃদ্ধবনিতা—যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অগ্রসর হলো। তাঁরা এতখানি উত্তেজিত হয়েছিল যে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার কোনো অবস্থা ছিল না। কিন্তু ত্রিশটি রাইফেল হতে অনবরত গুলিবর্ষণ হতে থাকল। তখন তাঁরা শুয়ে পড়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তাঁদের অভিযান টিকল না। আরো ষোলজন নারী-পুরুষ গুলিতে নিহত হলো। শঙ্খমণি, রেবতি, যোগেন, স্বরাজ প্রমুখ মোট ১৯ জন শহীদ হলেন। ওই সময়ে হাজং নেতারাও কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আমি ছিলাম নেত্রকোণায়। খবর শুনে আমি লেঙ্গুরায় উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, "সরাসরি পুলিশকে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। রাইফেলের মুখে আমরা এইভাবে আক্রমণ করতে গেলে আমাদের ক্ষতি হবে, পুলিশের কিছুই হবে না। কাজেই অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমাদের ওপর হামলা আসবে। পাহাড়ে আশ্রয়স্থল ঠিক করতে হবে। জঙ্গি ভলান্টিয়াররা ওই সব স্থানে থাকবে।"

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আমি ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ধরা পড়তে পড়তে খুব বেঁচে গিয়েছি। এই ঘটনাটি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, আমাদের বাঁচানোর জন্য এক পর্দানশীন গৃহবধূর বিস্ময়কর চাতুর্যপূর্ণ উক্তি।

ঘটনাটি ছিল : আমি পাহাড়ি অঞ্চল হতে হাঁটাপথে নেত্রকোণা যাচ্ছিলাম। যেহেতু আমি এলাকায় খুব পরিচিত তাই আমাকে বেশভূষা পরিবর্তন করতে হতো। আমার পোশাক ছিল কৃষকের মতো। লুঙ্গি, আধা ময়লা শার্ট আর খালি পা। তাছাড়া ক্রেপ ও স্পিরিট গাম দিয়ে গোঁফ ও দাড়ি প্রয়োজনমতো তৈরি করে নিলাম। কেননা আমার দাড়ি রাখা সম্ভব ছিল না। কারণ আমাকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হতো। আমার পকেটে একটা ছোট আয়না থাকত। এই জন্য যে, কখন গোঁফ-দাড়ি বিশৃঙ্খল হয়ে যায় তা লক্ষ্য করা দরকার। আমি পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেত্রকোণা যাচ্ছি, পথের দূরত্ব হচ্ছে ২৫ মাইল। আমার কোনো সাথী ছিল না। কিছু অন্ধকার থাকতে থাকতে ভোরে আমি যাত্রা করলাম। সেদিন খুব বাতাস বইছিল। আমি আয়না দিয়ে দেখলাম, আমার দাড়ি কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। যে জায়গাটায় এটা দেখলাম সে স্থানটা নেত্রকোণা থেকে ৮/৯ মাইল দূরে। ইউনিয়ন হচ্ছে কালিয়ারা গাবরাগাতী। এখানে আমার একজন অনুগত টিকাদার ছিলেন। তাঁর জমি নিলাম হয়ে গিয়েছিল, তা তাঁকে পাইয়ে দিয়েছি। এটাই ছিল আনুগত্যের কারণ। আমি ভাবলাম যখন নকল দাড়ি বিশৃঙ্খল হয়েছে, এখানে যাত্রাবিরতি করে সন্ধ্যার সময় নেত্রকোণার দিকে যাওয়া যাবে। এই চিন্তাটা আমার ঠিক ছিল না। কারণ আমি মাথা ও দাড়ি গামছায় বেঁধে অনায়াসে যেতে পারতাম! এরূপ একটি ভুল সিদ্ধান্তের ফলে আমি বিপদে পড়েছিলাম।

আমি নকল গোঁফ-দাড়ি উঠিয়ে ফেলে টিকাদারের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। কিন্তু টিকাদার বাড়িতে নেই। তাঁর বড় দুই ভাই বাড়িতে আছেন, তাঁরা প্রথমে আমাকে চিনতে পারেননি। অবশ্য পরে চিনতে পেরে মহাযত্নে আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করলেন। আমি তাঁদের বললাম, সন্ধ্যার সময় আমাকে নদী পার করে দিতে হবে। তাঁরা বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্য রকম। সেদিন ছিল ওই এলাকায় হাট, তাঁরা সন্ধ্যায় ফিরতে পারলেন না, অনেক রাত করে এলেন। এই রাতে ওখানে থেকে যাওয়া নিরাপদ মনে

করলাম না। আমি তাঁদের বললাম, "এখানে আমাকে কেউ চেনে কিনা?" তাঁরা বললেন, "না, কেউ আপনাকে কোনোদিন দেখেনি, নাম জানে মাত্র।" আমি বললাম, "আমি খুব ভোরে চলে যেতে চাই।" তাঁরা বললেন, "ঠিক আছে কোনো অসুবিধে নেই।" তারপর বললাম, "আমার বেশ পরিবর্তন করতে হবে এটা এ ঘরে সম্ভব নয়।" তাঁরা বললেন, "আপনাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাব।" আমি বাড়ির ভেতরে গেলাম। খুব ভোরে ক্রেপ দিয়ে গোঁফ-দাড়ি তৈরি করলাম। যখন গোঁফ-দাড়ি বানানো শেষ করেছি এই সময়ে দফাদার ও কয়েকজন চৌকিদার তাঁদের বাড়িতে উপস্থিত হলো। তারা বলল, "এখানে মণি সিংহ আছেন, তিনি ফেরারি, তাঁর নামে হুলিয়া আছে, ডাকুন তাঁকে।" আমি ঘরের ভেতর থেকে সব শুনছি। আমি স্থির করলাম এদের সামনে উপস্থিত হব। এরা আমাকে কিছুতেই চিনতে পারবে না—এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল। ওইরূপ বেশে সাধারণ লোকের পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

এই এলাকা আমাদের সংগঠিত এলাকা হতে অনেক দূরে, এখানে আমাদের কোনো প্রচারও ছিল না। কাজেই দফাদারের সম্মুখে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। আমি দফাদারের সামনে গেলাম। দফাদার আমাকে মোটেই চিনতে পারলেন না। দফাদার বললেন, আপনার নাম? আমি একটি মুসলিম নাম বললাম। দফাদার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী করেন? আমি বললাম, আমিও একজন টিকাদার। বাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন। বাড়িও একটা বলে দিলাম। এই সময়ের লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে টিকাদার-পত্নীর বক্তব্য। তিনি বাড়ির ভেতর থেকে বলতে লাগলেন, দফাদার মিয়া এনে চিনুইন না। এইন হইতান আমার শ্যামগঞ্জের বড়গিরির ভাই, প্রভৃতি। অনর্গল এইসব গল্প বলে যেতে থাকলেন। আমি এই উত্তেজনার মুখে বিস্মিত। কী করে এই গৃহবধূ এসব কথা তৎক্ষণাৎ বানিয়ে বলে যেতে পারলেন! কোনো রাজনৈতিক স্পর্শ এখানে নেই। আমি যে গোপনভাবে আছি, তাও তিনি জানেন না। দফাদার আমার একটা সই নিয়ে চলে গেলেন।

আমি যখন টিকাদারের এক ভাইকে নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি, তখন দেখি দফাদার ছুটে আমাদের কাছে আসছেন। আমার পথ প্রদর্শক বললেন, চলেন প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়িতে যাই। আমি শুনে কেঁপে উঠলাম। তিনি বললেন, তিনি আমাদের আত্মীয়, কিছু হইব না। এ সময় দফাদার এসে সঙ্গ নিয়েছেন। বললেন, আসামি ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছে। চলেন আমাদের হাকিমের বাড়ি অর্থাৎ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের বাড়ি। আমরা প্রেসিডেন্টের বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, প্রেসিডেন্ট বাড়ির ভেতরে। আমার পথ প্রদর্শক বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। আমি বাইরে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর প্রেসিডেন্ট এসে জিজ্ঞাসা

করলেন, আমি কোথায় যাব। তিনি বললেন, আরে বসেন; পান খান। পান খেলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা যাইন এখন।

আমি পথ প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? কেউ আমাকে চেনে না, তবে এতসব কাণ্ড ঘটল কীভাবে? আমার পথ প্রদর্শক বললেন, আমাদের পাশের বাড়িতে আমাদের এক শরিক আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের সাংঘাতিক ঝগড়া। তারা জানে জমি নিলামের জন্য আপনাকে আমরা ধরেছি আর পীর ধরেছি। যখন আপনাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলাম তখন তারা নিশ্চিত হলো মণি সিংহ ছাড়া আর কেউ না। বিশিষ্ট লোক ছাড়া খাঁর বাড়ির ভেতরে কেউ যেতে পারেন না। এরাই দফাদারকে খবর দিয়েছে। প্রেসিডেন্টের পরিচয় পেলাম স্বাধীনতার পর। তিনি হচ্ছেন আমাদের নারী নেত্রী আয়েশা খানমের পিতামহ। স্বাধীনতার পর নেত্রকোণায় ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়েছি। টিকাদারের সঙ্গে গোপন অবস্থায়ই দেখা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এখন তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁর দুই ছেলে আছে, তাঁরা দুজনেই উচ্চশিক্ষিত।

টংকের লড়াই

লড়াই সংগঠিত করার লক্ষ্যে পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয়-স্থান ঠিক করার জন্য কমরেডদের বলা হলো। বলা হলো, গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করতে হবে, সামনাসামনি নয়। এর ফলে ৭০ মাইলব্যাপী এই পাহাড়ি এলাকার মধ্যে নয়টি ক্যাম্প গঠিত হলো। এক একটি ক্যাম্পে ১৫০ থেকে ২০০ লোক অবস্থান করত। যাঁদের ওপর অত্যাচারের আশঙ্কা ছিল তাঁদের এসব ক্যাম্পে আনা হলো। বলা হলো, আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া লড়াই করা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে কমরেড বিপিনের চেষ্টায় দেশি বোমা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হলো। আমাদের হাজং কমরেডদের মধ্যে যাঁরা কারিগর ছিলেন, তাঁরা প্রথমে দুটি গাদা বন্দুক তৈরি করলেন। আমাকে এসে বললেন, "আমরা বন্দুক তৈরি করেছি। তবে কার্টিজের বন্দুক তৈরি করতে পারিনি।" বন্দুকগুলো এত সুন্দর ও মসৃণ ছিল যে তা যন্ত্রে তৈরি আসল বন্দুকের সঙ্গে তুলনা করা যেত। এভাবে আমাদের কারিগররা গোটা পঞ্চাশেক গাদা বন্দুক তৈরি করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা বড় বড় কতকগুলো বন্দুকও তৈরি করেছিলেন। সেগুলোতে পলিতা দিয়ে একসঙ্গে ৩০-৪০টি গুলি ছোড়া যেত। তাঁরা এগুলোকে কামান বলতেন।

সংগ্রামের মধ্যেই কর্মীদের ভেতরে এইরূপ সৃজনীশক্তি সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের হাতে ছিনিয়ে আনা কয়েকটি রাইফেল, স্টেনগান ও গোটা দুই পিস্তল ছিল। অভাব ছিল আমাদের টোটার। রাইফেলের টোটা আমদানি করতে গিয়ে দুবার সে প্রচেষ্টা ধরা পড়ে যায়। বোমা ও বন্দুক তৈরি করার মূল কৃতিত্ব ছিল হাজং কমরেডদের। মধ্যবিত্ত কমরেডদের এতে তেমন কোনো কৃতিত্ব ছিল না। আমাদের একজন বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত (ব্যবসায়ী) কমরেড নালিতাবাড়ির শচী রায় বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে মারা যান। আমরা পরে একটি মাত্র জায়গা থেকে বোমা তৈরির নির্দেশ দেই। এই সময় হাজং মেয়েদের রাইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্য ভলান্টিয়ারদের রাইফেল চালনা ও গেরিলা কায়দায় শিক্ষিত করা হয়। যখন আমরা গাদা বন্দুক তৈরি করতে সক্ষম হলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বোমাও তৈরি হয়ে গেল, তখন সংগ্রামের জোশ অনেকগুণ বেড়ে গেল। বহু খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম হয়েছে, সশস্ত্র পুলিশ পালিয়ে বেঁচেছে। অনেক পুলিশ আহত হয়েছে। কিছু পুলিশ মারাও গিয়েছে। এসব খণ্ড খণ্ড সংগ্রামের সব কথা লেখা সম্ভব নয়।

আমাদের কর্মীরা পুলিশ ক্যাম্পও আক্রমণ করেছে এবং পুলিশ ভয়ে ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। এইভাবে প্রতিদিন পুলিশের সঙ্গে কোনো না কোনো জায়গায় সংঘর্ষ হতো। সমগ্র এলাকা একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। টংক, লেভি, মহাজনি ঋণ সবই বন্ধ হয়ে গেল। কৃষক সমিতির স্লিপ ছাড়া কেউই একসঙ্গে বেশি পরিমাণ ধান বিক্রয় করতে পারত না। সশস্ত্র পুলিশও ভীত হয়ে পড়ল। কখন কোথা থেকে চোরাগোপ্তা গুলি আসে বা বোমা ফাটে কিছুই ঠিক নেই। সরকারও মরিয়া হয়ে সংগ্রামীদের দমাবার জন্য প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে যেতে লাগল। কলমাকান্দা থানার জায়গীরপাড়া গ্রামে একদিন গভীর রাতে দেড়-দুইশ পুলিশ গুলি করতে করতে চারদিক থেকে আক্রমণ করল। অনেককে তারা হত্যা করল। এইরূপ বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কিছু লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে গেল। পরে গ্রামটি পুড়িয়ে দিল।

এর পরের ঘটনা ঘটেছে রানীপুর চিরাখালীতে, পাহাড়ের অতি নিকটে। আসামের গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে রানীপুরে আমাদের কমরেডরা একটি নতুন গ্রাম তৈরি করেছিলেন। সারি সারি ঘর, ভলান্টিয়ারদের থাকার বিরাট লম্বা ঘর, হাসপাতাল ইত্যাদি। গ্রামটি বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছিল। উঁচু বাঁশের মাথায় লাল পতাকা উড়ত। এ গ্রামে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকত। পুলিশ ক্যাম্প থেকে এই গ্রাম বেশি দূরে ছিল না। তবু তারা সহজে এই গ্রাম আক্রমণ করার সাহস পায়নি। একদিন কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ গ্রামের দিকে আসছিল। এটা দেখে জনাবিশেক ভলান্টিয়ার তাদের প্রতিরোধ করার জন্য

খোলা মাঠে এগিয়ে গেল। আরেকটি দল অন্যদিক দিয়ে তাদের আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হলো। খোলা মাঠ পেয়ে সশস্ত্র পুলিশ অনবরত গুলি চালাতে লাগল। অন্যদিকে ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে মাত্র একটি বন্দুক। কিন্তু সেটার কার্টিজও ফুটল না। অপর দলও গুলি পরতে পারল না। ফলে আমাদের সাতজন কমরেড—দুবরাজ, অনন্ত, ক্ষিরোদ প্রমুখ এখানেই শহীদ হলেন। গুরুতর আহত হলেন দুজন। আমরা আগেই দুজন এমবি ডাক্তারকে ক্যাম্পে এনে রেখেছিলাম। ওষুধপত্র সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। এঁরা আমাদের কমরেডদের ইনজেকশন দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। মোটের ওপর আমাদের মেডিকেল স্কোয়াডও ছিল। আহতদের মধ্যে একজনকে রানীপুর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হলো। অপরজনকে পাহাড়ের অভ্যন্তরে নিভৃত ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি রানীপুর হতে মাইল দুয়েক দূরে নিরাপদ ক্যাম্পে ছিলাম। আমাকে ঘটনার খবর দেওয়া হলো। তখনই যাব বলে খবর পাঠালাম। এইরূপ মর্মান্তিক খবর পেয়ে আমি খুবই চঞ্চল ও মর্মাহত হলাম। আমাকে কয়েকজন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আমি মনে মনে ভাবলাম, যাঁরা আজ স্বামীহারা হয়েছে তাঁদের কী সান্ত্বনা দেব, যাঁরা আজ পুত্রহারা হয়েছে, তাঁদের অশ্রু থামাবার বা কী করব! আমি কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। ভাবলাম, এতক্ষণ কান্নাকাটি নিশ্চয়ই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিন্তু যখন গ্রামের কাছে উপস্থিত হলাম, তখন কোনো শব্দ শুনলাম না। মনে করলাম, এঁরা সকলে নিশ্চয়ই নিরাপদ স্থানে চিরাখালীতে চলে গিয়েছে। যে ভলান্টিয়ারটি পাহারা দিচ্ছিল সে আমাকে হাসপাতালের দিকে যেতে বলল। সেখানে একজন গুরুতর আহতকে রাখা হয়েছে। আমি সেখানে গেলাম। ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বললেন, "আজ রাত হয়ে যাচ্ছে, এই কমরেডকে এখন এখান থেকে সরানো যাবে না।" কিন্তু এই গ্রামটি আজ রাতে পুলিশ আক্রমণ করতে পারে—এটা আমরা আশঙ্কা করলাম। আমি ভলান্টিয়ারদের বললাম, "যাঁদের স্বামী মারা গিয়েছে তাঁদের কাছে আমাকে নিয়ে চল।" ওইসব স্বামীহারাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তখনই রওয়ানা হলাম।

কিছুদূর যেতেই একজনের সঙ্গে দেখা হলো। আমি আশ্চর্য হলাম যে, সে কাঁদছে না। মুখ গম্ভীর। আমি তাঁকে কয়েকটি কথা বললাম, সে কোনো কথা বলল না। সামনে কতকগুলো বল্লম ছিল, সেদিকে তাকিয়ে রইল। তাঁদের ভাব এই—রক্তের অবশ্যই বদলা নেব। শত্রুদের কঠিন আঘাত হানতে হবে। একটু পরে দেখলাম তাঁর চক্ষু হতে জল ঝরে পড়ছে। যাঁদের কাছে গিয়েছি কেউই উচ্চস্বরে কাঁদেননি। একজন মাকে দেখলাম—গুন গুন করে কাঁদছেন। এঁদের

ধৈর্য দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আজও মারা যায়নি। যদি মরত তবে আমি সেই অবস্থায় কী করতাম জানি না। এইসব নিরক্ষর মেয়ে আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিল। আমরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত আছি—এই স্পর্ধা এই নিরক্ষর মেয়েদের সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের কাছে খান খান হয়ে গেল। কতভাবে এঁরা প্রস্তুত রয়েছে—এটাই ছিল অনুধাবনের বিষয়। সংগ্রামের পূর্বে আমরা দৃঢ় সংকল্প প্রচার করেছিলাম যে, আমাদের অনেকের মৃত্যু হতে পারে, আমাদের ঘরবাড়ি ভাঙা হতে পারে, কিন্তু আমরা সংগ্রামে অটল থাকব। যতদিন পর্যন্ত টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ না হয়, সংগ্রাম চালিয়ে যাব। পিছু হটব না।

এই ঘটনার পর সব ভলান্টিয়ারকে ডেকে মিটিং করলাম। আমার বক্তব্য ছিল, আমাদের কৌশলের ভুল হচ্ছে। আমরা গেরিলা কায়দায় না গিয়ে ফাঁকা মাঠে লড়তে গিয়েছি। কাজেই আমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আমরা শহীদের নামে শপথ করছি—“তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। পিছু হটব না।” পরে নেতাদের ডেকে মিটিং করলাম—এখন করা কী? সকলের ধারণা এই রানীপুর গ্রামে আজ রাতেই পুলিশ আক্রমণ করতে পারে। তাঁদের আমরা ঠেকাতে পারব না। গ্রামসুদ্ধ লোক চেরাখালীতে নিরাপদ জায়গায় এখনই সরিয়ে নিতে হবে। প্রশ্ন উঠল, আহতকে সরানো যাবে না, কাজেই কী করা? পরিস্থিতি নাজুক এবং সংকটপূর্ণ। অবশেষে ঠিক করা হলো, গাছের ওপর পাহারাদার থাকবে। কিন্তু রোগীর কাছে কে থাকবে? এই সময় এক বৃদ্ধ হাজং মহিলা বললেন, “আমি থাকব। আমার তিন কাল চলে গিয়েছে, আমাকে মেরে ফেলে ফেলুক, আমার মরণে ভয়-ডর নেই।” বৃদ্ধার এই সাহস দেখে আমরা চমৎকৃত হলাম। সেইভাবে ব্যবস্থা হলো। ভলান্টিয়াররা পালাক্রমে পাহারা দেবে। পুলিশ আসতে দেখলে সবাইকে সতর্ক করে তাঁরাও সরে পড়বে। শুধু বৃদ্ধা ও আহত থাকবে। সুখের বিষয় পুলিশ সেই রাতে আর গ্রাম আক্রমণ করেনি। পরে পুলিশের আরো শক্তিশালী দল এসে ওই গ্রাম আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়। এরই মধ্যে ডাক্তাররা ওই আহতের পশ্চাৎদিক থেকে গুলি বের করে ফেলেন। সে বেঁচে যায়। পরে সে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারত। অপর আহত কমরেডরাও সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ওই সময়ে সিলেট জেলাও টংক আন্দোলনে যোগ দেয়। তাঁরাও পাহাড়ি অঞ্চলে একটি নিরাপদ ঘাঁটি স্থাপন করে। সিলেট জেলার এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন রবি দাম। তিনি ছিলেন খুব সাহসী ও দুর্ধর্ষ। তিনি এবং অন্যরা মোহনপুরে মজুত ধান বিলি করার জন্য যান। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পঁচিশ-ত্রিশজন পুলিশ ও আনসার এঁদের ঘেরাও করে ফেলে। রবি দাম

পুলিশকে প্রতিরোধ করতে গেলে পুলিশের কয়েকটি গুলি তাঁকে বিদ্ধ করে। তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। রবি দামের মতো নেতাদের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি দৃঢ়চেতা খাঁটি কমিউনিস্ট ছিলেন। অণিমা এই দলে ছিল। তাঁর ছিল অদম্য সাহস। তাঁরা খুবই কষ্ট করে জীবনযাপন করত। দুই বেলা মাত্র টক দিয়ে ভাত খেত।

এখানে দুজন কুরিয়ারের কথা বলা দরকার। একজনের নাম ছিল গণেশ। সে ছিল নিরক্ষর গরিব চাষি, অপরজন ছিলেন মণিকর। তিনি লেখাপড়া জানতেন। গণেশ কুরিয়ারের কাজ করছিল ১৯৪০ সাল থেকে। সে ছিল কৌশলী ও সাহসী। পাহাড়ি অঞ্চলের রাস্তাঘাট ছিল তার নখদর্পণে। সে নৌকাও ভালো বাইতে পারত। গণেশ নিয়মিত চিঠিপত্র নিয়ে নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ যেত। ১৯৪৯ সালে পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবেশ করা ছিল খুবই কঠিন ও বিপজ্জনক। পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াত, কেউ যেন পাহাড়ি অঞ্চলে যেতে না পারে বা পাহাড়ি অঞ্চল থেকে কেউ বাইরে আসতে না পারে। দীর্ঘ এলাকা বলে আমাদের আরেকজন কুরিয়ারের প্রয়োজন হলো। ১৯৪৯ সালে নেত্রকোণার মণিকরকে আমরা কুরিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলাম। একবার তাঁকে কাগজপত্র ও দুইশ টাকা দিয়ে ময়মনসিংহ পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। অত্যন্ত দুঃখের কথা, কে বা কারা তাঁকে পথে মেরে ফেলে। তাঁকে কে বা কারা মেরেছে, তা আজও আমরা সঠিক জানতে পারিনি।

পূর্বেই বলেছি যে, গণেশ ছিল কৌশলী, সাহসী ও পরিশ্রমী। পার্টির প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ আনুগত্য। সে জাতিতে ছিল ধোপা। ধোপার কাজ জানলেও সে ধোপার কাজ করত না। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল গরিব কৃষক। সে বিভিন্ন কঠিন রাস্তা ভেদ করে নিয়মিতভাবে নেত্রকোণা এবং প্রয়োজনে ময়মনসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। আমি পাহাড়ি অঞ্চল থেকে হেঁটে নেত্রকোণা বা ময়মনসিংহ গেলে, সে আমার পথপ্রদর্শক হিসেবে যেত। পার্টির কাজের জন্য একটি ভালো ছইওয়ালা নৌকা ছিল। ওই নৌকার মাঝি হিসেবে ভাটি অঞ্চলে আমাদের পার্টির সভ্য ফজর আলীর ভাতিজাকে মাসিক বেতনে রাখা হয়েছিল। তার নাম ছিল হাসন; সে ছিল খুব জোয়ান, ২৭/২৮ বছরের সুঠাম যুবক।

একদিন দুই ডাক্তারের মধ্যে এক ডাক্তার বললেন যে, অপর ডাক্তারের প্রতিদিন অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে, কিছুটা কাশিও আছে। আমি আশঙ্কা করছি তাঁর টিবি হয়েছে। তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে লোক পাঠানো কঠিন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে আমরা নিম্নরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। ভারতের ভূখণ্ডে গারো পাহাড়ে একটি বড় হাট আছে, নাম ভংবাজার। ওই হাটে কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি কেনার জন্য সোম ও মঙ্গলবার বহু

নৌকা পাকিস্তান থেকে যাতায়াত করত। তখনো কোনো পাসপোর্টের প্রচলন ছিল না। সীমান্তের এপারে ওপারে অবাধে লোকজন যাতায়াত করতে পারত। আমরা গণেশের মাধ্যমে ভংবাজারের হাটের দিন হাসনকে আসার জন্য খবর পাঠালাম। ঠিক হলো হাসন আসার পর সে নৌকার মাঝি হিসেবে গণেশ আর ডাক্তারকে নৌকায় করে নিয়ে যাবে। গণেশ ডাক্তারকে রেলগাড়ির সেকেন্ড ক্লাসের একটি টিকিট কেটে দেবে কলকাতার জন্য। গণেশকে পাঠানোর কারণ ডাক্তারের এই এলাকার কোনো রাস্তাঘাট চেনা ছিল না। পুলিশের কাছেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি গণেশকে সব বুঝিয়ে দিলাম। সে খুব কর্তব্যপরায়ণ ছিল। গণেশকে বলা হলো ডাক্তারকে পৌঁছিয়ে সে যেন আমাদের খবর দেয়।

কিন্তু সময় চলে যায়, গণেশ আর ফেরত আসে না। আমরা খুব উদ্বিগ্ন হলাম। কী হলো? কোনো অঘটন ঘটল না তো! আমরা চিন্তা করে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। ভাবছি খবর নেওয়া দরকার। এই সময় একদিন আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে গণেশ এসে উপস্থিত হলো। আমাকে সে খুব মানত। কিন্তু আমাকেই সে আক্রমণ করে বলল, “আপনি কী রকম নেতা? একটি লোক যদি মরে যায়, তবে কী করতে হবে তার কোনো নির্দেশ আছে?” আমি বললাম, “বাজে কথা বকো না, কী হয়েছে বল।” সে বলল, “হাসনের আগেই বোধ হয় কলেরা হয়েছিল, অর্ধেক রাস্তায় যাওয়ার পর সে মারা গিয়েছে। আমি একা নৌকা বেয়ে গিয়ে ডাক্তারকে টিকিট কিনে দিয়েছি, তিনি চলে গিয়েছেন। আমি নৌকায় ফিরে এসে খুব ভাবলাম—কী করা যায়। মুর্দা কীভাবে পৌঁছানো যায়। পরে মনে করলাম যে, মুর্দা তার নিজ বাড়িতেই পৌঁছে দিতে হবে, নচেৎ পার্টির বদনাম হবে।”

ফজর আলীর বাড়ি নেত্রকোণা থেকে অনেক দূরে ভাটি অঞ্চলের ঝিমটি গ্রামে। গণেশ একা নৌকা বেয়ে ফজর আলীর বাড়িতে মুর্দা নিয়ে গেল। ফজর আলীকে সব বলল। ফজর আলী আফসোস করেও আশ্চর্য হয়ে বলল, “আমার ভাতিজার হায়াত নেই, সে মারা গেছে। কিন্তু তুমি তো আশ্চর্য কর্মী। তুমি কলেরার মুর্দা নিয়ে এত দূর পথ এসেছ? ধন্য তুমি, ধন্য কমিউনিস্ট পার্টি।” গ্রামের মানুষ শুনে অবাক হয়ে গেল! গণেশকে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল! আমি এই কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে শুনতে লাগলাম। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, “তুমি একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট। তুমি মানবতা এবং কর্তব্যের কাছে নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করেছ।” সবাই এই কাহিনী শুনে গণেশকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। সে সময় আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এইরূপ সাচ্চা ও নিষ্ঠাবান কর্মী বের হয়ে এসেছিল। বহু নতুন কর্মী সৃষ্টি হয়েছিল। যেসব কৃষক

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হয়েছিলেন—তাঁরা রাজনীতিসচেতন হয়েছিলেন, সাংগঠনিক দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন অপূর্ব দক্ষ সংগঠক। হাজার দুই কর্মীর সব খরচ-খরচা এই এলাকার কৃষকরাই বহন করতেন। চাল, টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে দিতেন।

এই সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘ দেড় বছর। শত শত কৃষককে জেল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শত জেল-জুলুমের অত্যাচার সত্ত্বেও যাঁরা গোপন আশ্রয়ে থেকে সংগ্রাম করেছেন তাঁদের একজনকেও পুলিশ তখন ধরতে পারেনি। আমাদের তিনজন মহিলা কর্মী অর্শমণি, রাহেলা ও ভদ্র সোমেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় গ্রেপ্তার হয়ে যান। পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে এঁদের ওপর নির্মম ও জঘন্য নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু পুলিশ তাঁদের নিকট থেকে সংগ্রাম সম্বন্ধে কোনো কথা বের করতে পারেনি। পরে তাঁদের ময়মনসিংহ প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। তাঁরা দীর্ঘদিন পরে মুক্তি পান। জেলে তাঁরা লিখতে-পড়তে শেখেন।

বিরাট এলাকাজুড়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছিল। আমাদের লোক মারা পড়ছিল, পুলিশের লোক আহত হচ্ছিল। কোথাও কোথাও পুলিশও মারা পড়ছিল, ওই সংগ্রাম দেখে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার হলো। সরকার ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল পাণ্ডারা বোঝাল, টংক দিতে হয় না, লেভিও দিতে হয় না—এটা তো খুবই ভালো। কিন্তু এই আন্দোলনে পাকিস্তানও ভেঙে যেতে পারে। তাঁরা এই চিন্তায় বিমর্ষ-দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আমাদের কাছে এই খবর এসে পৌঁছাল। আমরা চিন্তিত হলাম। মুসলমান কৃষকরা টংক ধান দিচ্ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁরা হাজংদের মতো জঙ্গি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছিলেন না।

১৯৫০ সালের প্রথমদিকে কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর (কমিনফরম) মুখপত্র ‘ফর এ লাস্টিং পিস অ্যান্ড ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসি’ নামক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি রণনীতি ও রণকৌশলে ভুল করেছে বলে জোরের সঙ্গে লেখা হয়। এটা প্রকাশ হওয়ার পর ভারতের পার্টির মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দেশব্যাপী পার্টির সভ্যরা তখনকার ভারতের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ সম্পাদক রনদিভের ওপর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের দ্বারা গঠিত প্রাদেশিক কমিটির ওপরেও এই বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ‘লাস্টিং পিস’ পড়ে আমরা আলোচনা করে বুঝতে পারি, আমরাও নিদারুণ ভুল করেছি।

এই সময় মুসলিম লীগ সরকার এই জঙ্গি সংগ্রামে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সশস্ত্র পুলিশ আসতে গড়িমসি করত, ভীত সন্ত্রস্ত হতো। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

তখনকার দিনের পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেব সুসং এলাকায় এসে এক জনসভা করলেন ১৯৫০ সালে। জনসভার বক্তব্য ছিল—টংক উঠিয়ে দিচ্ছি; সবাই জমির স্বত্ব পাবে, জমিদারি প্রথাও আইন করে তুলে দিচ্ছি, রাস্তা দিয়েছি, স্কুল দিয়েছি; কাজেই তোমরা এখন আন্দোলন থামিয়ে দাও। 'লাস্টিং পিস' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় বিবেচনায় নিয়ে নুরুল আমিন সাহেবের ওই বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জেলা কমিটির সভা ডেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু নুরুল আমিন সাহেবের মনে মনে যে অন্য মতলব ও সংকল্প ছিল তা তখন আমরা বুঝতে পারিনি।

সংগ্রাম থামিয়ে দেওয়ার পর গ্রামে গ্রামে এমন লুণ্ঠন আর বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি হলো, যা কল্পনা করা যায় না। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা হলো, তাঁদের ধর্ষণ করা হলো, গ্রামের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হলো, ক্ষেত-খামারের ফসল নষ্ট করা হলো। যেখানে যাকে পেল ধরে জেলে পাঠানো হলো। মোটের ওপর সরকার ও টাউটরা এক পৈশাচিক অমানবিক নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করল। মুসলিম লীগ সরকার ঠিক করল—এই বর্ডার এলাকায় এরূপ বিদ্রোহী লোকদের উচ্ছেদ করতে হবে। এঁদের পরিবর্তে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলমান কৃষকদের এখানে এনে বসাতে হবে। হলোও তাই, উচ্ছেদের কাজ পাইকারি হারে শুরু হলো। হাজং কমরেডরা এই নির্মম অত্যাচারের ফলে এখানে টিকতে পারলেন না, ভারতের আসামে চলে যেতে বাধ্য হলেন। হাজংদের সংখ্যা ছিল প্রায় লাখখানেক। তাঁদের অধিকাংশ সীমান্তের অপর পারে চলে গেলেন। তাছাড়া ডালু, বালাই, কোচ, রাজবংশী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা চলে গেলেন। তবে গারো উপজাতি এখনো কিছুসংখ্যক আছে। হাজং উপজাতির সংখ্যা এখন অতি নগণ্য।

অতীব দুঃখের কথা, বামপন্থী হঠকারিতার ফলে ১২ বছরের একটি নিবিড় নিশ্ছিদ্র জমাট বাঁধা জঙ্গি ও সুশৃঙ্খল সংগঠন ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আন্দোলন করা আমাদের ঠিকই ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি না বুঝে সশস্ত্র সংগ্রাম করা ছিল বামপন্থী বিচ্যুতি।

আমাদের সংগ্রাম ছিল সামন্তবাদী টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রাম। ওটা নুরুল আমিন সরকারকে উচ্ছেদের সংগ্রাম ছিল না! এটা মনে রেখে এবং শুধু একটি এলাকায় নয়, সমগ্র দেশবাসীর মনোভাব বিচার করে আমাদের কৌশল নির্ধারণ করা উচিত ছিল। তা না করায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে সরকার। কমিউনিস্টরা পাকিস্তান ভেঙে ফেলতে চায়—এই কথা বলে সরকার দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে পার্টি ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমরা যখন এটা উপলব্ধি করতে

পারলাম, তখন আন্দোলন থামিয়ে দিলাম। এর ফলে যে মারাত্মক দমননীতি নেমে আসে তাতে ক্ষতি হয় ঠিকই, কিন্তু আন্দোলন চালিয়ে গেলে সেই অবস্থায় আরো ক্ষতি হতো। সরকার তখন জমিদারি প্রথা ও টংক প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিল। সেই অবস্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আর যুক্তি ছিল না।

সারা বাংলাদেশে আইনসঙ্গতভাবে ধান কড়ারি খাজনা উঠে গিয়েছে সত্য। কিন্তু যে হাজং উপজাতি বীরত্ব, সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠার সঙ্গে ওই সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের আমরা হারিয়েছি, তাঁরা পিতৃপুরুষের ভিটা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই একদিকে হয়েছে জয়, অন্যদিকে হয়েছে পরাজয়।

এই আন্দোলনের কৌশলে মারাত্মক ভুল হলেও, কমরেডদের বীরত্ব, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাংগঠনিক দক্ষতা, সৃজনী প্রতিভা ও রাজনৈতিক চেতনা চিরদিন অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আন্দোলন

তিরিশের দশকের শেষভাগ এবং চল্লিশের দশকের শুরু থেকে দেশের অন্যান্য জেলায়ও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মধ্যে সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, খুলনা, যশোর, রাজশাহীর নাচোল অঞ্চল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গ ছিল কৃষিপ্রধান। শ্রমিকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অবশ্য যে স্বল্পসংখ্যক শ্রমিক ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও সে সময় শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী, তরুণ লেখক ও শিল্পীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

সিলেটে নানকার আন্দোলন

নানকার প্রথাকে অর্ধদাস প্রথা বা গোলামি প্রথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। নানকার প্রজাদের সামান্য জমি ও বসতবাড়ির পরিবর্তে জমিদার বাড়িতে সারা বছর হদ বা বেগার খাটতে হতো। এঁদের জমি বা বাড়িঘরের কোনো স্বত্ব ছিল না। সারাদিন খাটলেও তাঁদের খাবার বা কোনোরূপ মজুরি দেওয়া হতো না। যখন তখন তাঁদের ডেকে এনে কাজ করানো হতো। এঁদেরকে চাকর এবং খানসামার কাজও করতে হতো। তাছাড়া মারধর, জুতা পেটাসহ অমানুষিক

অত্যাচারের অন্ত ছিল না। লোহার শিক পুড়িয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছ্যাঁকা বা দাগ দেওয়া হতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে ঐতিহাসিক তে-ভাগা আন্দোলনে যখন সারা বাংলাদেশ তোলপাড় হচ্ছিল, তখন ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে, কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে এই নানকার আন্দোলন সংগঠিতভাবে এক গৌরবময় আন্দোলনে উন্নীত হয়।

বাংলাদেশের মধ্যে তে-ভাগা, টংক ও নানকার আন্দোলন কৃষকদের এক একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন। নানকাররা মাথা গুঁজে, মুখ বুজে সব অত্যাচার-অবিচার সহ্য করেননি। তাঁরা মাথা তুলে আন্দোলন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯২২-২৩ সাল থেকে। পরে ১৯৩১-৩২ সাল এবং ১৯৩৮-৩৯ সালেও তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছেন। কিন্তু এসব আন্দোলনে নানকার প্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। নানকার প্রজাদের আন্দোলনের গৌরবময় কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

কোনো এক ক্ষুদে জমিদার নানকার প্রজাকে তুচ্ছ এক কারণে জুতাপেটা করেন। সেই প্রজা লাঞ্ছিত ও আহত হয়ে জমিদার কাছারি থেকে বের হয়ে আসে। এমন ঘটনা জমিদার কাছারিতে প্রতিদিনই ঘটত। তাই এই ঘটনার যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে—এটা কারো ধারণায় ছিল না। নানকার প্রজা মনে মনে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেন। তবে তাঁর সংকল্প সম্পর্কে কাউকেই কিছু বলেন না। জমিদারদের কাজকর্ম, ওঠা-বসা সম্পর্কে তাঁর কিছুই অজানা ছিল না। তিনি জানতেন জমিদার বিকেলবেলা দীঘির পাড়ে আরাম কেদারায় বসে হাওয়া খান; তখন সেখানে লোকজন কেউ থাকে না। কিন্তু হাঁক-ডাকে মুহূর্তে লোকজন ছুটে আসতে পারে। এই সময় কারো পক্ষে কোনো ঘটনা ঘটানোর জন্য অসম্ভব সাহসের দরকার হতো। কিন্তু ওই নানকার প্রজা অপমানের জ্বালায় জ্বলছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময়, তখনো অন্ধকার একেবারে নেমে আসেনি। সেই লাঞ্ছিত নানকার একটি ঘরের আড়াল থেকে ছুটে এসে জমিদারের জুতার দুই পাটি দুই হাতে তুলে দুই গালে পটাপট আঘাত করে বসলেন। ঘটনাটি এমন আকস্মিক ও অকল্পনীয়ভাবে ঘটে গেল যে, জমিদার কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। নাকে-মুখে-মাথায় সজোরে পাদুকাঘাত! আঘাতে আঘাতে জমিদারের নাদুস-নুদুস দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার ওপর পড়ল লাথি, ঘুষি, কিল, চড়। ঘটনাটি এতই দ্রুত ঘটে গেল যে জমিদার লোক ডাকার সময়ই পেলেন না। জমিদারকে ফেলে রেখে নানকার প্রজা ছুটতে লাগলেন। জমিদার যখন ধকল কাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তখন দীঘির পাড়ে সবাই জমায়েত হলো। পরে আততায়ীর পরিচয় পেয়ে পাল্টা প্রতিশোধের জন্য লোকজন ছুটে বের হলো। ফাঁকা মাঠে আততায়ী কোনদিকে পালিয়েছে তা অনুমান করতে না পেরে

দুই মাইল দূরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু আততায়ী সেখানে ছিল না, শুধু আততায়ী নয়, তাঁর কেউই ছিল না, শূন্যঘর। যাতে পাড়া-পড়শি কেউ সন্দেহ না করে এজন্য আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার নাম করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সে আগেই বের হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী-কন্যাদের স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কর্তব্য-কাজ সমাধা করে রেলে চড়ে দেশ ছেড়ে চলে যান। এই কাজ করে এদেশে থাকা সম্ভব নয়, এটা তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই জানা ছিল।

আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করি।

সুখাইড় বিদ্রোহ

এখানকার জমিদাররা ছিল লম্পট। বাপের দেখাদেখি ছেলেও লম্পট। তারা নানকার মেয়েদের এনে লাম্পট্য চরিতার্থ করত। এখানে অতিথি অভ্যাগত কেউ এলেও নানকার মেয়েদের লাম্পট্যের খোরাক জোগাতে হতো। এই সকল ঘটনা সর্বদা ঘটত। গ্রামের এক মহিলার দিকে জমিদারের চোখ পড়েছিল। তাঁর লালসা চরিতার্থ করার জন্য তিনি সেই মহিলাকে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে মেয়েটি না এসে জমিদারের লোকজনকে উল্টা কড়া কথা শুনিয়ে দিল। জমিদার এই কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠলেন। পরে তাঁর বশংবদ লোকজন এসে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যায়; মেয়েটির প্রতিরোধের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। মেয়েটিকে এনে জমিদার আটক করে রাখে। ভাবটা এমন যে, জমিদারের সবার ওপর অধিকার—কি স্ত্রী, কি পুরুষ! তাঁরা প্রজাদের যেকোনো শাস্তি দিতে পারে; এটা তাঁদের চিরকালের অধিকার। এর ওপর কারো কিছু বলার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু সেদিনের এই ঘটনার পর হঠাৎ করে সব পাল্টে গেল। এ ঘটনায় ক্ষেপে গিয়ে গ্রামের নানকাররা একযোগে জমিদার বাড়িতে চড়াও হয়ে বন্দিনী মেয়েটিকে মুক্ত করে আনলেন। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আওয়াজ তুললেন। নানকার প্রজারা জমিদার বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের জমি-বাড়ির ওপর দখল রেখে বসে রইলেন। নানকারদের এই বিদ্রোহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। এই বিদ্রোহ চলল এক বছর। পরে অবশ্য এই বিদ্রোহ অবদমিত হয়। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ব্রজবাসী দাস। তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল—কেউ জানেন না। এরপর কুলাউড়ার বিদ্রোহ হয় ১৯৩১-৩২ সালে। এখানে নানকার পরিবার ছিল পনের ঘর। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায়। যাঁরা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন এমন অনেক পরিবার এখান থেকে চিরদিনের জন্য দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অপর নানকাররা বেগার খাটতে রাজি হওয়ায় জমিদাররা তাদের মাফ করে দেন।

রণিকেলী বিদ্রোহ (১৯৩৮-৩৯)

এই আন্দোলনের কিছুটা বিশেষত্ব আছে। এই আন্দোলন কৃষক সভা কর্তৃক পরিচালিত হয়। কৃষক নেতা করুণাসিন্ধু রায়ের নেতৃত্বে সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীর দাবিতে জেলাব্যাপী তখন সভা-সমাবেশ চলছিল। গোলাপগঞ্জ থানার আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ঢাকা-দক্ষিণ বাজার। এই এলাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে রণিকেলী গ্রামের নানকার প্রজারা প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

অন্য নানকার বিদ্রোহগুলোর সঙ্গে যেমন কোনো না কোনো স্থানীয় ঘটনা জড়িত ছিল, এই বিদ্রোহ কিন্তু তার ব্যতিক্রম। এটা ছিল সংগঠিত বিদ্রোহের পরিকল্পিত প্রকাশ। নানকাররা কেউ আর জমিদার বাড়িতে বেগার খাটতে গেলেন না। নিজেদের জমি-বাড়ির ওপর দখল রেখে বসে রইলেন। জমিদাররা কৃষক সভার কর্মীদের খুন করার ষড়যন্ত্র করল, কিন্তু এসব পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ব্যর্থ হলো। জমিদাররা মন্ত্রী-আমলা-উকিল নানাজনের সঙ্গে পরামর্শ করে, নানকারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করল। আসামি খোঁজার নাম করে পুলিশ ব্যাপক লুটপাট-মারধর শুরু করে দিল। অধিকাংশ নানকারকে অভিযুক্ত করা হলো। জমিদার ও সরকারের মিলিত অত্যাচারে রণিকেলী গ্রামের নানকার পাড়াগুলো তছনছ হয়ে গেল। এক বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি হলো।

জনমতের সাহায্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কৃষক সভা এক অভিনব পথ অবলম্বন করল। লাঞ্ছিতা, অপমানিতা নানকার মহিলারা এক দীর্ঘ মিছিল নিয়ে জেলা সদরে উপস্থিত হলেন। মহিলারা সংখ্যায় ছিলেন শ দুয়েক। তাঁদের প্রতিজনের হাতে জ্বালানো ছিল লণ্ঠন। লণ্ঠন নিয়ে দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করে তাঁরা দিনদুপুরে জেলা প্রশাসকের বাড়ির ফটকে উপস্থিত হলেন। সমগ্র শহরে খবরটি ছড়িয়ে পড়ল। এই অভিনব মিছিল দেখতে সারা শহরের হাজার হাজার মানুষ জেলা প্রশাসকের বাংলোর কাছে জমায়েত হলো। মহিলারা বিশাল জনতার কাছে রণিকেলী গ্রামে পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কথা তুলে ধরলেন। হাতে-পায়ে-মাথায় জখমের চিহ্ন দেখিয়ে সবাইকে অভিভূত করে ফেললেন। এই নির্মম অত্যাচারের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে 'অন্ধ শাসক' বলে উল্লেখ করলেন। এই 'অন্ধ শাসক'কে সত্য ঘটনাটা দেখানোর জন্যই এ রকম বাতির ব্যবস্থা করেছেন বলে তাঁরা জানালেন।

জেলা প্রশাসক এই মিছিলকে এড়াতে পারলেন না। বাংলোর ফটকে এসে মিছিলকারীদের সঙ্গে তাঁকে আলাপ করতে এবং অভিযোগ শুনতে হলো। প্রথম সাক্ষাতে মিছিলকারীরা একসঙ্গে বারবার হাতের লণ্ঠন তুলে তাঁকে 'অন্ধ শাসক' বলে সম্বোধন করলেন। আলাপ-আলোচনা চলল। মিছিলকারীরা তাঁদের অভিযোগ বর্ণনা করে তড়িৎগতিতে প্রতিবিধানের দাবি করলেন, জেলা প্রশাসককে সেই প্রতিশ্রুতিই দিতে হয়। মিছিলটি সারা শহরে এবং পথে পথে মানুষের মনে সহানুভূতির সৃষ্টি করে গ্রামে ফিরে যায়। এই মিছিলের ফল হয় আশাতীত। শুধু সিলেট শহরেই নয়, সারা জেলায় গ্রামে গ্রামে সর্বত্র মিছিলের খবরের সঙ্গে রণিকেলী গ্রামের নানকার প্রজাদের ওপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কাহিনীগুলো অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা জেলায় বিভিন্নভাবে জনমত সৃষ্টি হতে থাকে।

এরপর জেলা প্রশাসকের মধ্যস্থতায় একটি আপসরফা হয়। কিন্তু তাতে নানকার প্রথা উচ্ছেদ হয়নি। অবশেষে স্থির করা হয়, যাঁরা নানকার থাকতে চান না, খাজনা দেওয়ার শর্তে তাঁদের অন্যত্র কিছু জমি-বাড়ির জায়গা দেওয়া হবে। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদেরও মুক্তি দেওয়া হয়। কৃষক সভা এই আপস মেনে নেয়। এই আন্দোলনের স্থানীয় নেতা ছিলেন তকবির আলী। আর কৃষক সভার পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীরেশ মিশ্র, জিতেন ভট্টাচার্য ও মোহাম্মদ বেদার বখত।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। সিলেট ছিল আসামে। সিলেট জেলা ভারতে থাকবে, না পাকিস্তানে যাবে—এটা গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এ সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান নানকার চাষিদের মধ্যে বিভিন্ন মত ছিল। তাই গণভোটের ক্ষেত্রে কৃষক সমিতি নিরপেক্ষ থাকার নীতি গ্রহণ করে। কৃষক সমিতি তার সভ্যদের নিজ নিজ বিচার মতো স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। এর ফলে নানকার চাষিদের মধ্যে বিভেদ এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

গণভোটের পর সিলেট জেলার অধিকাংশ অঞ্চল এবং নানকার আন্দোলনের এলাকাগুলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা নানকারদের দাবি মানেনি, বরং আন্দোলন দমন করার জন্য দমননীতির আশ্রয় নিয়েছিল। কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রভৃতি দায়ের করেছিল। মুসলিম লীগ সরকার কায়েম হওয়ার পর তারা নানকারদের দাবি মানেনি। তারাও দমননীতি ও বিভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু বিভেদনীতি ও দমননীতি চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা সম্ভব হয় না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আন্দোলন আরো ব্যাপকতা লাভ করে। এই সময় তালুকদাররাও নানকার চাষিদের

সমর্থনে এগিয়ে আসেন। জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত বাজার বয়কট করে কৃষকদের বাজার বসানো হয়। পুলিশ এই বাজার ভাঙার জন্য হয়রানি ও নানাভাবে চেষ্টা করে এবং নানকার কৃষকদের পাইকারিভাবে বেধড়ক মারধর করে। কিন্তু বাজার ভাঙা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুসলিম লীগ প্রভাবাধীন নানকার কৃষকরা তাঁদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করার জন্য কৃষক সমিতির আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন। তাঁদের দাবি সমর্থনের জন্য স্থানীয় মুসলিম লীগ কমিটির ওপর জোর চাপ দেওয়া হয়। ফলে, উত্তর শ্রীহট্ট মুসলিম লীগ নানকারদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সমর্থন দিতে বাধ্য হয়।

এমন পরিস্থিতিতে নানকারদের ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি সমন্বয়ে সম্মিলিত কমিটি গঠন করা হয়। এর ফলে আন্দোলনের সপক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। সিলেট জেলায় বিয়ানীবাজার থানার লাউতা ও বাহাদুরপুর এবং বড়লেখা থানার হিন্দু-মুসলমান জমিদার বাড়িতে নানকাররা কাজ করা বন্ধ করে দেন। সমগ্র এলাকায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর ফলে যেসব প্রজা খাজনা দিতেন, তাঁরাও এগিয়ে এলো এবং খাজনা দেওয়া বন্ধ করলেন। এ অবস্থার পটভূমিকায় স্থানীয় মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি মিলিতভাবে তখনকার ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর সঙ্গে একটি ডেপুটেশনে মিলিত হয়। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার একটি 'তদন্ত কমিশন' গঠন করতে বাধ্য হয়। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে নানকার কৃষকদের দাবি স্বীকৃত হয়। তদানীন্তন লীগ সরকার ১৯৪৮ সালে ওই তিন থানার নানকার প্রথা বিলোপ করতে বাধ্য হয় এবং নানকারদের বাড়ি ও অর্ধেক জমির ওপর জোত-স্বত্ব স্বীকার করে নেয়। এর ফলে এক বিরাট জয় সূচিত হয়। পরে ১৯৫০ সালে ভূমি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনে নানকার প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে দীর্ঘদিনের সামন্ততান্ত্রিক এক বর্বর প্রথার চির অবসান ঘটে।

নানকার আন্দোলনের বিজয়ের পরও কৃষক আন্দোলন স্তিমিত হয়নি। ১৯৪৯-৫০ সালে জমিদখল রাখার আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার চলছিল। ফলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য সরকার নানাভাবে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল।

সেই সময় ১৪ আগস্ট কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সুযোগে সরকার সংগ্রামী কৃষকদের ওপর ব্যাপক দমননীতি চালাবার ষড়যন্ত্র করে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি ওইদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। সঙ্গে সঙ্গে সরকার ওইদিন কৃষকদের ওপর গুলি চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই

এলাকার অধিকাংশ কৃষক ছিলেন মুসলমান। তাঁরা কৃষক সমিতির পতাকাতলে সংগঠিত হয়েছিলেন।

১৯৫০ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিয়ানীবাজারের শানেশ্বরে বিকেলে সভা ও শোভাযাত্রার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিকে শোভাযাত্রার ওপর গুলি চালানোর জন্য ম্যাজিস্ট্রেটসহ সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সেখানে আগেই উপস্থিত হয়েছিল। শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্টেট ১৪৪ ধারা জারি করে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু সংগ্রামী কৃষকরা শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করতে অস্বীকার করেন এবং শোভাযাত্রা করার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ় মনোবল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই অবস্থায় ম্যাজিস্টেট শোভাযাত্রার ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। গুলি চালানোর ফলে পাঁচজন সংগ্রামী কৃষক মৃত্যুবরণ করেন। তবু কৃষকরা ছত্রভঙ্গ হননি। গুলি চালানোর সময় কেউ না পালিয়ে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেন। এরপর নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাইকারি হারে কৃষকদের মারধর করা হয়। এখানে পুলিশ ঘাঁটি বসানো হয়। সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়। শত শত কৃষক এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। সংগঠন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আন্দোলনের চাপে নানকারদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেও, মুসলিম লীগ সরকার এই এলাকার কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য সুযোগ খুঁজছিল। এজন্য তারা পাকিস্তান দিবস উদ্‌যাপনের মিছিলের ওপর গুলি চালাতেও দ্বিধা করেনি। শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার জন্য শাসকশ্রেণি যে কতদূর জঘন্য কাজ করতে পারে এটা তারই আরেকটি প্রমাণ।

তবে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, অবস্থা প্রভৃতি সবকিছু বিচার করে ১৪৪ ধারা জারির পর আমাদেরও ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

নাচোল কৃষক বিদ্রোহের কথা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মালদহ জেলার পাঁচটি থানা—নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নাচোল ও গোমস্তাপুর রাজশাহী জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

এই আন্দোলনে সঙ্গে সাঁওতাল, হিন্দু, মুসলমান—এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষ যুক্ত থাকলেও মূল সংগ্রামী শক্তি ছিল সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে। গত শতাব্দীতে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল। সাঁওতাল পরগনায় সাঁওতাল

বিদ্রোহকে ব্রিটিশ সরকার স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন কখনো নিভে যায়নি। উত্তরবঙ্গের মতো এখানেও বিরাট বিরাট জোতদার ছিল, তাঁরা এক একজন দুই-তিন হাজার বিঘা জমির মালিক ছিল। এখানে কৃষকদের নিজস্ব জমি ছিল খুব কম। সব জমিই ছিল জোতদারদের দখলে। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই জোতদার ছিল। উত্তরবঙ্গের ভাগচাষিদের তে-ভাগা আন্দোলন, ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চলে টংক আন্দোলন সমগ্র বাংলাদেশের কৃষক সমাজের ওপর এক ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রভাব এখানকার গরিব ও নির্যাতিত কৃষকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের তে-ভাগা আন্দোলনের কথা শুনে এই অঞ্চলের চিরকালের শোষিত ভাগচাষিরা এক নতুন সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। তাঁরা আন্দোলনে এগিয়ে এলো। এই আন্দোলনে হিন্দু, মুসলমান কৃষক অংশগ্রহণ করলেও, সাঁওতাল কৃষকরাই ছিলেন অগ্রগামী বাহিনী।

অন্যান্য জেলার মতো দেশবিভাগের পূর্বে মালদহ জেলায়ও কৃষক সমিতি ছিল। মালদহ জেলার কৃষক সমিতির সম্পাদক ছিলেন রমেন মিত্র। তিনি নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের এক জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। রমেন মিত্র মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে নাচোল ও নবাবগঞ্জ থানায় কৃষকদের মধ্যে তে-ভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই সময় গণ-আন্দোলনের সামান্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেই সরকার কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে আটক করছিল। যাঁরা কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলেন, তাঁদেরকে আত্মগোপন থেকেই কাজ করতে হতো। এখানে কাজ করার জন্য অন্যান্য এলাকা থেকেও কর্মীরা এসেছিলেন। যেমন : অনিমেষ লাহিড়ী, ফণী, শিবু, কোরামুদ্দীন, বৃন্দাবন সাহা প্রমুখ।

এখানে সাঁওতাল সর্দার মাতলার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রধানত তাঁকেই অবলম্বন করে এই অঞ্চলের আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সাঁওতালদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম পার্টি সভ্য। সাঁওতালদের মধ্যে তাঁর ব্যাপক প্রভাব ছিল। প্রাথমিক প্রচারের পরে সংগঠন গড়ে আন্দোলন শুরু হলো। এই এলাকায় সীমাবদ্ধ স্থানজুড়ে অতর্কিতে এই আন্দোলন জ্বলে উঠল। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তখনো এখানে তত বিস্তৃত হয়নি। এখানে সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলমান ভাগচাষি সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল। ফসল কাটার সময় রমেন মিত্র এবং তাঁদের জমিদারির অন্যান্য হিস্যার মালিকদের ৫০০ বিঘা জমির ওপর লাল ঝাণ্ডা তুলে দেওয়া হলো। তারপর অন্য

জোতদারদের জমিতে তে-ভাগা কায়েম করা হলো। অল্প সময়ের মধ্যে তে-ভাগার নীতি কার্যকর হয়ে গেল।

নাচোলের সংগ্রামে আরেকটি জনপ্রিয় ও স্মরণীয় নাম হচ্ছে ইলা মিত্র। তিনি শুধু রমেন মিত্রের সহধর্মিণীই ছিলেন না, সহকর্মীও বটে। তিনি তখন ছিলেন একটি শিশুপুত্রের জননী। তিনি সব মায়া কাটিয়ে সাঁওতালদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁওতালরা তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তিনি এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তেজস্বিতার সঙ্গে। সাঁওতালদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল শীর্ষে। তাঁকে সবাই 'রাণীমা' বলে ডাকত। তিনি সাঁওতালী ভাষাও শিখেছিলেন। তাঁদের তে-ভাগার দাবি অবশেষে সকলেই মেনে নিয়েছিল। এই সাফল্যে কৃষকরা আশা করেছিলেন, তাঁদের যে সব জমি ইতিপূর্বে হস্তচ্যুত হয়েছিল, সেগুলোর অধিকারও তাঁরা পাবেন। এক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠার ফলেই দরিদ্র-নিপীড়িত কৃষকদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল।

এখানকার এসব ঘটনার খবর সরকারের কাছে গেল। কিন্তু এখানকার অবস্থা, আন্দোলনের ব্যাপকতা সম্পর্কে তারা ভালোভাবে জানতে পারেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাত্র পাঁচজন পুলিশ ও একজন দারোগা পাঠানো হলো। পুলিশের প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল। এদিকে পুলিশের আগমনে কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হলো। বল্লম, তীর-ধনুক প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে কৃষকরাও অগ্রসর হতে লাগল এবং চারদিক থেকে পুলিশকে ঘিরে ফেলল। পুলিশও বেপরোয়া গুলি ছুড়তে লাগল, কিন্তু ফল হলো উল্টো। ওই সংঘর্ষে পাঁচজন পুলিশ ও দারোগা সবাই মারা পড়ল। যখন ওই খবর গিয়ে ওপর মহলে পৌঁছুল, তখন সরকারি কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ ও তৎপর হয়ে উঠলেন। এবার পুলিশ নয়, সশস্ত্র সৈন্য আমদানি করা হলো। শোনা যায়, হাজার দুয়েক সৈন্য আমনুরা রেলস্টেশনে নেমেছিল। স্টেশন থেকে নাচোল আট মাইল। তারা জেনে এসেছে এবং তাদের বোঝানো হয়েছে এখানকার সব নারী-পুরুষ তাদের শত্রু—পাকিস্তানের শত্রু। কাজেই তারা যাকে পেল তাকেই হত্যা করল। দুর্জয় সাহস থাকলেই বর্শা, বল্লম আর তীর-ধনুক নিয়ে সৈন্যদের আধুনিক রাইফেল মেশিনগানের সঙ্গে সংগ্রাম করা যায় না। কৃষকরা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তার জন্য মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। ওইসব পাকিস্তানি পাঞ্জাবি পাঠান হিংস্র সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে যেদিকে পারল পালিয়ে যেতে লাগল।

রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র সেই সময় দুজন দুই স্থানে ছিলেন। কয়েকশ জঙ্গি সাঁওতাল রমেন মিত্র ও মাতলা সর্দারকে নিয়ে সীমান্তের দিকে ছুটলেন।

সীমান্তের নিরাপদ পথঘাট মাতলা সর্দারের জানা ছিল। মাতলা সর্দারের নেতৃত্বে একদল সীমান্তের অপর পারে মালদহে চলে গেল। ওপারে গিয়ে মাতলা সর্দার কপালে করাঘাত করে বিলাপ করতে লাগলেন। অনেকেই মারা পড়েছে। কিন্তু সেটাও মূল কারণ নয়। বিলাপের মধ্যে শোনা গেল—"রাণীমা এখনো এলেন না! মা কি তবে শত্রুর হাতে ধরা পড়লেন?" সকলেই উদ্বিগ্ন, চিন্তায় দিশেহারা। তাঁদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল। ইলা মিত্র ধরা পড়েছিলেন। তিনি চারশ লোক নিয়ে সীমান্ত পার হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথ দেখাবার উপযুক্ত লোক ছিল না। তাঁরা যেতে যেতে রহনপুর রেলস্টেশনের কাছে পৌঁছুলেন। সেই স্থানটি ছিল বিপজ্জনক। তার কাছেই ছিল সৈন্যদের ক্যাম্প। তাঁদের দেখে সৈন্যরা দ্রুত এসে ঘেরাও করে ফেলল। এরই মধ্যে রমেন মিত্র, ইলা মিত্র, মাতলা সর্দারসহ কয়েকজনের নামে হুলিয়া বের হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে সৈন্যরা পেয়ে গেল। ইলা মিত্র সাঁওতাল মেয়ের পোশাক পরে ছিলেন। সাঁওতাল ভাষায় কথা বলছিলেন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়ে গেলেন। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হলো প্রথম থেকেই তাঁদের সকলের ওপর সৈন্যরা পৈশাচিক উল্লাস ও হিংস্রতায় যন্ত্রণা দিয়ে নির্যাতন শুরু করল। সেই নিষ্ঠুর নির্যাতনের কাহিনী ভাষায় অবর্ণনীয়! রক্তে রক্তে তাঁদের দেহ লাল হয়ে গেল। জ্ঞানহারা হলো, তবুও বর্বর সৈন্যরা নিপীড়নে ক্ষান্ত হলো না। ইলা মিত্রকেও তারা নির্মমভাবে অত্যাচার করল। সে অত্যাচারের কৌশল ভয়ঙ্কর, অমানুষিক এবং বর্বর।

তারপর সবাইকে নাচোল আনা হলো। 'হরেক'কে তারা টানতে টানতে নিয়ে এলো। তর্জন গর্জন করে তারা বলল, "বল ইলা মিত্র পুলিশকে মারবার জন্য হুকুম দিয়েছিল।" কিন্তু হরেক একটি কথাও বলল না। তাঁকে বলা হলো, "যদি তুই এ কথা না বলিস, তবে তোকে একেবারে মেরে ফেলব।" এই কথা বলে তারা হরেকের পেট-বুকে সজোরে বুট দিয়ে লাথি মারতে লাগল। হরেকের মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল, কিন্তু হরেকের মুখ দিয়ে তাদের শেখানো একটি কথাও বের করা গেল না। এর ফলে হরেককে শেষ পর্যন্ত মরতে হলো। এভাবে তারা সবাইকে নির্দয়ভাবে প্রহার করেও কারো মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারল না। মামলা সাজানোর জন্য তারা এভাবে কয়েকজনকে মারতে মারতে মেরে ফেলেছে, কিন্তু কারো মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারেনি।

ইলা মিত্রের ওপর যে পৈশাচিক ও বীভৎস অত্যাচার করা হয়েছিল, তা একমাত্র নাৎসি ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁকে কেবল মারপিট করে শয্যাশায়ীই করা হয়নি, তাঁর যৌনাঙ্গে গরম ডিম ও

লোহার ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তাঁকে ধর্ষণ পর্যন্ত করা হয়েছিল। সভ্য জগতে এর তুলনা বিরল। তিনি যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, তাতে এসব কথা স্পষ্টভাবে লিখে আদালতে পেশ করা হয়। ওই সময়ে মামলা পরিচালনার উকিল পাওয়া ছিল দুষ্কর। পুলিশের হয়রানি ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে অনেকেই পিছিয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে এ দেশের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল (প্রয়াত) কামিনী দত্ত ইলা মিত্রের মামলা পরিচালনা করেন। তিনি অনেক রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করেছেন। কোনোদিন পিছপা হননি। ওই মামলা বেশ কিছুদিন চলেছিল। শেষে মামলায় আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আপিলে দণ্ড হ্রাস পেয়ে প্রত্যেকের ১০ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। অতঃপর ১৯৫৪ সালে শের-ই-বাংলা ফজলুল হক মন্ত্রিসভার আমলে চিকিৎসার জন্য বন্দী অবস্থায় ইলা মিত্রকে কলকাতায় পাঠানো হয়। নির্মম অত্যাচারে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

ইলা মিত্র আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তার হুবহু অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হলো :

"কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

বিগত ৭-১-৫০ তারিখে আমি রহনপুরে গ্রেপ্তার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধর করে এবং তারপর আমাকে একটি সেলের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে—এই বলে এসআই আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সব কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে। সেদিন আমাকে কোনো খাদ্য দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সে দিন সন্ধ্যাবেলাতে এসআই-এর উপস্থিতিতে সিপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর কাপড়-চোপড় ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারটায় সময় আমাকে সেল থেকে বের করে সম্ভবত এসআই-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।

যে কামরাটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানা রকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালাল। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটো ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং সে সময় আমার চারধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা বলেছিল যে, আমাকে 'পাকিস্তানি ইনজেকশন' দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময় তারা একটি রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে

দিয়েছিল। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে ফেলেছিল। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল; কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিল না।

সেলের মধ্যে আবার এসআই সিপাইদেরকে গরম সিদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিল এবং বলল, এবার সে কথা বলবে। তারপর চার-পাঁচজন সিপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিত করে শুইয়ে রাখল। একজন আমার যৌনাঙ্গের মধ্যে একটি গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

৯/১/৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো, তখন উপরোক্ত এসআই এবং কয়েকজন সিপাই আমার সেলে এসে তাদের বুট দিয়ে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করল। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে একটি পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময় আধা-সচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এসআই-কে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম, 'আমরা আবার রাতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না কর তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে।' গভীর রাতে এসআই এবং পুলিশরা ফিরে এলো, তারা আমাকে সেই হুমকি দিল। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কাউকে কিছু বলতে রাজি হলাম না, তাদের মধ্যে তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখল এবং একজন সিপাই সত্যি সত্যিই আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করল। এরপরই আমি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

পরদিন ১০/১/৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে, আর আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছে। সেই অবস্থায় আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জের জেলগেটের সিপাইরা জোরে ঘুষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল।

সেই সময় আমি একেবারেই শয্যাশায়ী ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন সিপাই আমাকে একটি সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেল। তখনো আমার রক্তপাত হচ্ছিল এবং খুব বেশি জ্বর উঠেছিল। সম্ভবত নবাবগঞ্জের সরকারি হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রি। যখন তিনি আমার কাছে আমার প্রচণ্ড রক্তপাতের কথা শুনলেন, তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ ও কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো।

১১/১/৫০ তারিখে সরকারি হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার সম্পর্কে কী রিপোর্ট করেছিলেন আমি জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে রক্তমাখা কাপড় ছিল, সেটা পরিবর্তন করে একটি

পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশি জ্বর ছিল; তখনো আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

১৬/১/৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে স্ট্রেচার নিয়ে আসা হলো এবং বলা হলো যে পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশি খারাপ থাকার জন্য আমার নড়াচড়া করা সম্ভব নয়—একথা বলায়, লাঠি দিয়ে আমাকে একটি বাড়ি মারা হলো এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এরপর আমাকে অন্য এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানেও কিছুই বলিনি, কিন্তু সিপাইরা জোর করে একটি সাদা কাগজে আমার সই আদায় করল। তখন আমি আধা-চেতন অবস্থায় খুব বেশি জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল, সে জন্য আমাকে নবাবগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর আমার শরীরের অবস্থা আরো সংকটাপন্ন হলো। তখন ২১/১/৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানে আমাকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

কোনো অবস্থাতেই পুলিশকে আমি কিছুই বলিনি এবং ওপরে যা বলেছি তার বেশি আমার বলার কিছু নেই।"

ইলা মিত্রের ওপর যে পৈশাচিক অত্যাচার হয়েছিল, আর কোনো রাজনৈতিক কর্মী বা নেতার ওপর এরূপ বীভৎস অত্যাচার হয়নি। শুধু ইলা মিত্র নয়, সে সময় যাঁরা ধরা পড়েছিলেন তাঁরা পৈশাচিক নির্যাতনের মুখেও এবং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কোনো স্বীকারোক্তি করেননি। আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সকলের মধ্যে যে বিপ্লবী দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়েছিল এটা তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কিন্তু টংক আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনের কৌশলও ছিল ভুল। সারা দেশের ব্যাপক কৃষক-জনতাকে সংগঠিত না করেই শুধু একটি এলাকার কৃষকের সংগঠিত শক্তির ওপর নির্ভর করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে এরূপ জঙ্গি আন্দোলনের কৌশল নেওয়া ঠিক হয়নি। প্রথম বিজয়ের পরে আন্দোলন বন্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু এই আন্দোলন দমন করার জন্য মুসলিম লীগ সরকার যে বর্বর অত্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিল, তাও তুলনাহীন। মুসলিম লীগ যে শোষক, জোতদার, মহাজন ও ধনিকের সরকার, তাদের স্বার্থরক্ষায় তারা যে নৃশংস হতে পারে তা সেদিন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

শোভনার আন্দোলন

বাংলাদেশের অন্যতম কৃষক নেতা হচ্ছেন বিষ্ণু চ্যাটার্জী। তিনি ছিলেন খুব জনপ্রিয় নেতা। তাঁকে সবাই 'বিষ্ণু ঠাকুর' বলে ডাকত। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে এই তেজস্বী নেতাকে মুসলিম লীগের লোকেরা খুন করে কৃষক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে।

শোভনায় তে-ভাগা, টংক অথবা নানকার আন্দোলন নয়, এখানকার আন্দোলন ছিল বাঁধ নিয়ে।

১৯৪৮ সাল। শৈলেন ঘোষ ও ধীরেন ভট্টাচার্য ছিলেন শোভনার বড় জমিদার। কৃষকদের ঠ্যাঙানোর জন্য এদের লাঠিয়াল মজুদ থাকত। এখানে এক বিরাট এলাকা সমুদ্রের নোনা পানি প্রবেশ করায় অনাবাদি থাকত। নোনা পানি আটকানোর জন্য কৃষকরা নিজেদের পরিশ্রমে বাঁধ দিলে জমিদাররা ওটা ভেঙে ফেলে। জমিদারদের মতলব ছিল—এই সব জমি অনাবাদি থাকলে কৃষকরা খাজনা দিতে অপারগ হবে; কাজেই মামলা করে সব জমি খাসে নিয়ে আসা যাবে। এই চক্রান্তের শিকার হলেন কৃষক সমিতির কর্মী ফয়েজউল্লাহ। তাঁর খাজনা বাকি পড়ায় জমিদার ধীরেন ভট্টাচার্য তাঁর বিরুদ্ধে বাকি খাজনার জন্য মামলা দায়ের করে জমি খাস-দখলে আনার ডিক্রি পেলেন। কৃষক সমিতির নির্দেশে ফয়েজউল্লাহ জমি ছাড়লেন না, দখল রেখে চাষ করতে লাগলেন। এর আগে জমিদারের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে বরাবুনিয়ার বাঁধ নির্মাণের ফলে ওই সব জমির উৎপাদন খুব বেড়েছিল। ফয়েজউল্লাহর জমিতে ধান উৎপাদন হয়েছিল প্রচুর। নিজেদের ডিক্রি পাওয়া জমিতে আবাদ করতে দেখেও জমিদার কিছু করার সাহস করেননি। কিন্তু প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়েছে দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করলেন—রাতের অন্ধকারে তাঁরা লাঠিয়াল নিয়ে ধান কেটে আনবেন।

এই গোপন খবর কৃষক সমিতির একজনের মারফত বিষ্ণু চ্যাটার্জী ও অন্যরা জানতে পারলেন। প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাঁরা গ্রামে গ্রামে লোক পাঠালেন। সঙ্কেত শোনামাত্র তাঁরা যেন ফয়েজউল্লাহর জমির দিকে লাঠি-সড়কি নিয়ে চলে আসেন। সেখানে আমাদের কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অসুবিধা ছিল। সে এলাকায় কোনো শক্তিশালী ভলান্টিয়ার বাহিনী ছিল না। যতদূর সম্ভব তাঁরা কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করলেন। আরেকজনকে পাঠালেন হীরালাল বাইনের কাছে। তিনি ছিলেন লাঠিয়াল। তাঁর একটি লাঠিয়াল বাহিনী ছিল।

অবশ্য হীরালাল বাইনের সঙ্গে কৃষক সমিতির তেমন কোনো যোগ ছিল না। শুধু সোনা নামে একজন কৃষক সমিতির কর্মীর সঙ্গে তার কিছুটা পরিচয় ছিল। এদিকে ঢোলের শব্দে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। গ্রাম থেকে গ্রামে এই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। এরপর দা, সড়কি, যে যা পেল তাই নিয়ে ফয়েজউল্লাহর গ্রামের দিকে ছুটে এলো কয়েক হাজার লোক। জমিদারের বাহিনী অপেক্ষা কৃষকদের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও উপযুক্তভাবে সংগঠিত না হওয়ায় কেউই সাহসী হয়ে শত্রুপক্ষের লাঠিয়ালদের হুঙ্কারের মোকাবেলা করে বাধা দেওয়া অথবা কাটা ধান ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হলো না। জমিদারের নায়েব চটপট ধান কেটে নৌকা বোঝাই করে তাদের খামারের দিকে নৌকা ভাসিয়ে দিল। জমিদারের লোকের হাত থেকে ধান ছিনিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে কৃষকরা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। এই হতচকিত লোকদের সামাল দিতে বিষ্ণু চ্যাটার্জীও পারলেন না। এই সময় এলেন একজন বৃদ্ধ লোক। সকলকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "কুত্তার বাচ্চারা ধান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? ছোট ব্যাটারা ছোট, এই ধান কান ধরে টেনে জোর করে নিয়ে আসতে হবে।" এই কথার পর প্রায় পঙ্গু পা নিয়ে তিনি কাঁধে লাঠি ফেলে শাখা নদীটির পাড় ধরে দৌড়াতে লাগলেন। এই অশিক্ষিত বৃদ্ধ কৃষক এক অভূতপূর্ব নেতৃত্ব দিলেন। সব কৃষক নৌকার দিকে ছুটতে লাগল। বিষ্ণু চ্যাটার্জীও পিছিয়ে রইলেন না। তিনিও ছুটতে লাগলেন। ধান কেড়ে আনতেই হবে।

এই অবস্থায় দৌড়াতে দৌড়াতে খুব কাছাকাছি এসে পড়লেও একটি আশঙ্কার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে সবাই হতাশ হয়ে পগলেন। জমিদারের নৌকা বড় নদীতে পড়লে তাঁকে আর কিছুতেই ধরা সম্ভব হবে না। এমন সময় দেখা গেল যে, জমিদারের নৌকা হঠাৎ স্থির দাঁড়িয়ে গেল। কৃষকরা আবার দৌড়াতে শুরু করল। নৌকাগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার কারণ হলো, পাশের এক খাল থেকে গোটাদশেক নৌকা তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। এই নৌকাগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে চার-পাঁচজন লোক; প্রত্যেকের হাতে রামদা, ঢাল, সড়কি ইত্যাদি। যখন এই অবস্থায় সবাই হতভম্ব, তখন দেখা গেল সোনা নামের কৃষক সমিতির কর্মীটি একটি নৌকার মধ্যে। কৃষকরা বুঝলেন, হীরালাল বাইনের দল জমিদারের নৌকা আটক করেছে। এভাবে ঘেরাও হয়ে জমিদারের নায়েব কাঁপতে কাঁপতে কৃষকদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। জমিদারের লাঠিয়ালদের সব লাঠি, সড়কি কৃষকরা কেড়ে নিল। যারা ফয়েজউল্লাহর ধান জোর-জুলুম করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা নিজেরাই সেই ধান ফয়েজউল্লাহর বাড়িতে পৌঁছে দিল।

এরপর হীরালাল বাইন কৃষক সমিতির সভ্য এবং কর্মীতে পরিণত হলেন। এমন কি জমিদারের অনেক লাঠিয়ালও কৃষক সমিতির কর্মীতে পরিণত হলেন। এর কিছুকাল পরে পুলিশ হীরালাল বাইনের গ্রাম ঘেরাও করায় পরস্পর আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলার ফলে হীরালাল বাইনের ছেলে রামকান্ত ও ভাই সতীশ বাইন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এটা ছিল ১৯৪৯ সাল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পরও হীরালাল বাইন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আন্দোলনের ওপর পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন, "ওরা এক ছেলেকে মেরে ফেলেছে, সেজন্য হীরালাল বাইন দমে যাবে না। আমার এক ছেলে গেছে, আরো ছেলে আছে। আর আমার সব ছেলেই যদি যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলে থাকবে। ওরা তাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে না।"

হীরালাল বাইন এরপর বেশ কিছুকাল রাজশাহী জেলে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এই ধরনের তেজস্বী বীর কৃষক আন্দোলনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলন

দেশ বিভাগের আগে এবং পরেও, ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে শিল্প-কারখানা ছিল যৎসামান্য, সংখ্যাও ছিল নগণ্য। যেটুকু শিল্প বিকাশ ওই সময়ে ঘটেছিল তার সব ইউনিয়নই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত। তখনকার কারখানা ও মিলগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের কয়েকটি সুতাকল, কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল, ঢাকার পোস্তগোলায় ঢাকা কটন মিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নারায়ণগঞ্জে কতকগুলো ছোট-বড় হোসিয়ারি ফ্যাক্টরি ছিল। ঢাকেশ্বরী ১নং মিল, ঢাকেশ্বরী ২নং মিল, চিত্তরঞ্জন মিল, লক্ষ্মীনারায়ণ মিল, পোস্তগোলায় ঢাকা কটন মিল—এই কয়েকটি ছিল নারায়ণগঞ্জ এলাকার সুতাকল। কয়েক বছরের চেষ্টায় এখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠিত হয়। তাছাড়া রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে প্রদেশব্যাপী শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে। হোসিয়ারি ফ্যাক্টরিতে শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠিত হয়। এই সব শ্রমিক ছিলেন খুবই জঙ্গি। অনেক শ্রমিক কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। অনেক উল্লেখযোগ্য জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনও হয়। একটি আন্দোলনের কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১৯৪৬ সালের আন্দোলন

১৯৪৬ সালের নির্বাচনী প্রচারের জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী নারায়ণগঞ্জ আসেন। তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য শ্রমিকরা ছুটি দাবি করেন। কিন্তু মিল মালিক ওই দাবি অগ্রাহ্য করেন। ছুটি না দেওয়ায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করে পি সি যোশীকে সংবর্ধনা দেন। শ্রমিকদের যুক্তি ছিল—সুভাষ বাবু বা সোহরাওয়ার্দী সাহেব এলে ছুটি দেওয়া হয়, তাহলে কমিউনিস্ট নেতা এলে ছুটি দেওয়া হবে না কেন? এই ধর্মঘটে পার্টির ইতস্তত ভাব ছিল। কিন্তু শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব দেখে পার্টি ধর্মঘট করার স্বপক্ষে মত দেয়। এক বিরাট জনসভায় যোশী ভাষণ দেন। এই ধর্মঘটের ফলে বিভিন্ন মিলের ২২ শ্রমিক নেতাকে মালিকরা বরখাস্ত করেন।

প্রধানত, এর প্রতিবাদ ও মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের সরবরাহকরা চালের দাম মণপ্রতি ১০ টাকার স্থলে ১৪ টাকা করার বিরোধিতা করে ১৯৪৬ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করেন। শ্রমিকরা এটাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হিসেবে গ্রহণ করেন। এই ধর্মঘট চলে ৭ মে পর্যন্ত। এই ধর্মঘটে জড়িত ছিলেন ৬০ হাজার শ্রমিক। ধর্মঘট চলে আশি দিন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য সহানুভূতিশীল জনসাধারণের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হতো। এই ধর্মঘটের সময় ২৫ মার্চ ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস-এর ৪০/৫০ জন গুর্খা পুলিশের সঙ্গে এক সংঘর্ষে চারজন শ্রমিক কমরেড মারা যান এবং ৭০ জন গুলিবিদ্ধ হন। একজন গুর্খা পুলিশ এই সংঘর্ষে মারা যায়। কমরেড ডাক্তার অঞ্জলি এই ৭০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও ব্যান্ডেজ করে দিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং শ্রমিক সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। এই নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক পরিচর্যা হাসপাতালের অন্যান্য ডাক্তারের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করে।

ঢাকেশ্বরী মিলে গুলি চালনা প্রদেশব্যাপী যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। গুলি চালনার পরের দিন হরতাল ও বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। জেলা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে এই হরতালের সমর্থনে টেনে আনা সম্ভব হয়। হরতালের সমর্থনে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। মিলে কারখানায় ধর্মঘট পুর্নোদ্যমে চলতে থাকে এবং ধর্মঘট বানচাল করার সকল হীন চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ২২ জন ছাঁটাইকৃত শ্রমিককে মালিকপক্ষ পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের মূল দাবিগুলোও মালিকপক্ষ মেনে নেয়। নিহত ও আহতদের

পরিবারের সাহায্যের জন্য মালিকপক্ষকে কয়েক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণও দিতে হয়। এই হরতাল অভূতপূর্বভাবে সাফল্য লাভ করে।

ওই সময় ঢাকার শ্রমিক আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন— নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জী, মৃণাল চক্রবর্তী, ননী চৌধুরী, ধরণী রায়, প্রফুল্ল মজুমদার, সমর ঘোষ, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, অমর গাঙ্গুলী, সুনীল রায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে মৃণাল চক্রবর্তী, ননী চৌধুরী, ধরণী রায়, সুনীল রায় ছিলেন শ্রমিক। আন্দোলনের কারণে তাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছিল, পরে তাঁরা সর্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে শ্রমিকদের আন্দোলনের ও পার্টির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধু তাঁরাই নন, আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আরো অনেক শ্রমিক রাজনৈতিভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তবে এই আন্দোলন মূলত নেপাল নাগ ও অনিল মুখার্জীর উদ্যোগেই গড়ে ওঠে। নেপাল নাগ ছিলেন জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা, সুবক্তা। অনিল মুখার্জী ছিলেন দক্ষ সংগঠক, তাত্ত্বিক। এই এলাকায় শ্রমিকদের রাজনীতি সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। দুঃখের বিষয় দুজনের কেউ আজ জীবিত নেই।

সে সময় সারা ভারতে যে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিস্টরা শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালনা করতেন, তার নাম ছিল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখানে আলাদা সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই কারণে ইস্ট পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয়। ডা. মালিককে সভাপতি, নেপাল নাগ, মোহাম্মদ ইসমাইল ও মোহন জমাদারকে সহ-সভাপতি, ফয়েজ আহমদকে সম্পাদক এবং অনিল মুখার্জী ও গৌর বর্মণকে সহ-সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়। দীনেন সেনও এই কমিটির অন্যতম সদস্য ও নেতা ছিলেন।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস হতেই সারা দেশে গণসংগ্রামের এক জোয়ার শুরু হয়ে যায়। কলকাতায় পুলিশের গুলিতে রামেশ্বর হত্যা, আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস, রশীদ আলী দিবসের প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ হতে শুরু করে শ্রমিক ধর্মঘট, পুলিশ ধর্মঘট, নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ প্রভৃতি হতে প্রতীয়মান হয় যে মানুষ স্বাধীনতার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

১৯৪৬ সালে ভারতে পোস্টাল কর্মচারীরা ধর্মঘট করে। ব্রিটিশ আমলে সরকারি কর্মচারীদের এত বড় ধর্মঘট ইতিপূর্বে আর হয়নি। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২৩ জুলাই (১৯৪৬) সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। এই সাধারণ ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে।

ভারতব্যাপী এরূপ একটি ঐক্যবদ্ধ সফল আন্দোলনের পর ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে পারে, কেউ তা চিন্তাও করতে পারেননি। এটা সম্ভব হয়েছিল কংগ্রেসের আপসকামী রাজনীতি এবং মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির কারণে। দুটি প্রধান সংগঠনের এই জাতীয় নীতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার। তাছাড়া একদিকে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিভেদাত্মক নীতির প্রতি ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে সমর্থন জানিয়ে যেতে থাকে। আপসকামী রাজনীতির জন্য কংগ্রেসের পক্ষে তা বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষজুড়ে সাম্প্রদায়িকতা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান জনগণের ঐক্য গড়ে ওঠার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিস্ময়করভাবে তিরোহিত হয়ে যায়। ঐক্যের ও সমঝোতার মূলে কুঠারাঘাতের ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কংগ্রেস নেতৃত্ব এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়।

মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট এক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস আহ্বান করে। এই দিবসে মুসলিম লীগ সব মুসলিমকে সরকারি খেতাব বর্জনের আহ্বান জানায়। কলকাতায় মুসলিম লীগের বহু মিছিল বের হয়। এই মিছিলগুলো হিন্দুদের দোকানপাট লুট করে। অপরদিকে হিন্দু এলাকায় মুসলমানদের দোকানপাট লুট হয়। হাজার হাজার নিরীহ হিন্দু-মুসলমান নর-নারী-বৃদ্ধা-যুবক-শিশুর রক্তে কলকাতা শহর লালে লাল হয়ে যায়। নিষ্ঠুর আক্রোশে হিন্দু এলাকায় মুসলমান নিধন, আর মুসলমান এলাকায় হিন্দু নিধন করা হয়! কয়েকদিন যাবত এই ভয়াবহ ও বীভৎস দাঙ্গা চলতে থাকে। তবে এই ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্যেও সজ্জন হিন্দুরা মুসলমানদের এবং সজ্জন মুসলমানরা হিন্দুদের রক্ষা করেছেন—এমন দৃষ্টান্তও বহু আছে। পরে ঢাকায় এই দাঙ্গা প্রায় চার মাস ধরে চলে। এখানে আমাদের একজন রেলওয়ে কমরেড জহিরউদ্দীন হিন্দুদের জীবন রক্ষার জন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হন। এই সময় নারায়ণগঞ্জ সুতাকল অঞ্চলে দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু আমাদের কমরেডদের তৎপরতা ও সাহসিকতার ফলে এখানে দাঙ্গা বাধতে পারেনি। ঢাকার রহিমাবাদে আমাদের প্রায় ৩০০ ভলান্টিয়ার সদা-সতর্ক পাহারা দেওয়ায় সেখানে দাঙ্গা হতে পারেনি। সুবিধা ছিল যে ঢাকা পার্টিতে অনেক মুসলমান কমরেড তখন ছিলেন।

কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার পর দাঙ্গা শুরু হয় বিহারে। বিহারের পর দাঙ্গা শুরু হয় নোয়াখালীতে। একের পর এক সংঘটিত এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মহাত্মা গান্ধী প্রথম থেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিলেন। নোয়াখালীতে দাঙ্গার সময় তিনি সেখানে গিয়ে দাঙ্গাবিরোধী প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই দাঙ্গার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল। যেখানে পার্টির শক্তি বেশি ছিল, সেখানে তারা দাঙ্গা হতে দেয়নি। এইরূপ একটি ঘটনা ঘটে কুমিল্লার হাসনাবাদে।

কুমিল্লার হাসনাবাদ কৃষক আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। ১৯২৮ সালে এখানে মোখলেসুর রহমানের নেতৃত্বে মহাজনবিরোধী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিল। এই অঞ্চল নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার সীমানায়। মাঝে একটি নদী। দাঙ্গাকারীরা ওই নদী পার হয়ে বারবার কুমিল্লায় দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির ভলান্টিয়ারদের সতর্কতার জন্য তারা কোনো সময়ই নদী পার হতে পারেনি। আর এজন্য কুমিল্লা জেলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়া সম্ভব হয়নি। ঢাকা শহরেও কমিউনিস্টরা দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

শুধু হাসনাবাদ ও ঢাকা নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্টরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছেন। এজন্য কমিউনিস্ট কর্মীরা হিন্দুদের কাছে মুসলমানের দালাল এবং মুসলমানদের কাছে হিন্দুর দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে কমিউনিস্টরা পার্টির জন্ম থেকেই সব প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

দাঙ্গা চলার সময় ঢাকা জেল থেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বন্দীসহ আন্দামান প্রত্যাগত চব্বিশজন দীর্ঘমেয়াদি বন্দী মুক্তি পান। এঁরা সাতদিন ঢাকা পার্টি অফিসে থাকেন। ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও দাঙ্গার সময়েও সাতটি জায়গায় তাঁদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক মুসলিম পার্টি অফিসে এসে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে যান। জগন্নাথ হল মিলনায়তনে তাঁদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। বহু হিন্দু-মুসলমান ছাত্র তাঁদের সংবর্ধনা দিতে আসেন। ফজলুল হক হলের তৎকালীন প্রভোস্ট মাজহারুল হক ওই সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন

এদেশে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই নতুন ধারায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেন। সাম্যবাদ শুধু মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিই নিশ্চিত করে না, পুরনো শোষণভিত্তিক সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তে মানুষকে শোষণহীন সমাজ

গড়ে তোলার কর্মীতে রূপান্তরের ভেতর দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সৃজনীশক্তি বিকাশের পথও উন্মুক্ত করে দেয় এবং সৃষ্টি করে নতুন যুগের নতুন মানুষ। কমিউনিজম এজন্যই সবদিক থেকে মানব মুক্তির এবং মানস মুক্তির মতবাদ। মানুষের চিন্তাজগতের এই পরিবর্তন বা মুক্তবুদ্ধি ও মুক্ত জীবন-ভাবনা অবশ্য সহজ-সরল পথে আপনা থেকে গঠিত হয় না। সেজন্য প্রয়োজন পুরনো, পশ্চাৎপদ, রক্ষণশীল, সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম।

কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা এই সংগ্রামে তৎকালীন বাংলাদেশে প্রথম থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বামপন্থী এই নবতরঙ্গের সাহিত্য প্রচেষ্টা 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তিরিশের দশকের শেষভাগে শুরু হয়। খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদী পণ্ডিত গোপাল হালদার, হীরেন মুখার্জী প্রমুখ এ ব্যাপারে সযত্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

হিটলারের নাৎসি বাহিনী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পর সারা বাংলাদেশে ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ গঠিত হয়। এই সংগঠনের সঙ্গে তখন খ্যাতনামা কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ছাড়াও সুপণ্ডিত আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ অকমিউনিস্ট খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীও যুক্ত ছিলেন।

সে সময় ঢাকায়ও ফ্যাসিবিরোধী লেখকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সংস্থার স্থানীয় শাখার সম্পাদক ছিলেন সোমেন চন্দ। সোমেন চন্দ ছিলেন ১৯ বছরের যুবক। এই বয়সেই তিনি কতকগুলো অদ্ভুত সুন্দর গল্প লিখে সারাদেশের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সোমেন ছিলেন একজন প্রকৃত মার্কসবাদী সাহিত্যিক। নিজে ছিলেন স্থানীয় রেলওয়ে শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদক। রেল শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ভেতর দিয়ে তিনি মেহনতি মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন।

এই সময় পার্টি সারাদেশে ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলবার জন্য ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয়। সারা বাংলাদেশে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি কমিউনিস্টদের এই প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করে। কমিউনিস্টদের ওপর হামলা চালায়, এমন কি তাঁদের খুন করতেও ইতস্তত করে না। তাঁদের যুক্তি ছিল আমাদের সংগ্রাম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। হিটলার-মুসোলিনি-তোজো ফ্যাসিস্টরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, কাজেই ফ্যাসিস্টরা আমাদের মিত্র। তার ওপর তখন সুভাষ বসু জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন। কাজেই তাঁদের এই বিভ্রান্তি আরো দৃঢ়মূল হয়েছিল। অথচ তাঁদের এই যুক্তি ছিল মারাত্মক ভুল। ফ্যাসিস্টরা যদি

সেদিন জয়লাভ করত, তাহলে সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপ—ফ্যাসিবাদী চণ্ড শাসন ও শোষণ আরো দৃঢ়মূল হয়ে বসত। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের আজ যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে তা সম্ভব হতো না।

ঢাকার সূত্রাপুরে ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন হওয়ার কথা। সোমেন চন্দ সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য রেলওয়ে কলোনি থেকে একটি মিছিল নিয়ে আসছিলেন। সে সময় ফ্যাসিবাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা লক্ষ্মীবাজারের কাছাকাছি সোমেন চন্দের মিছিলটির ওপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করে এবং প্রকাশ্যে নিষ্ঠুরভাবে ছুরি ও শাবলের আঘাতে সোমেন চন্দকে হত্যা করে। আক্রমণের আকস্মিকতায় মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তারা সূত্রাপুর সম্মেলনও আক্রমণ করে। কিন্তু কমরেডদের জঙ্গি প্রতিরোধের জন্য তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সম্মেলনের বাইরে রাজপথে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পুলিশের গুলিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন কর্মীও নিহত হন। নেত্রকোণায়ও ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে বঙ্কিম মুখার্জী, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেছিলেন।

শুধু ঢাকা নয়, পূর্ববাংলার বিভিন্ন জায়গায় সে সময় উগ্রনীতির কারণে ফ্যাসিবাদীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দ্বারা আমাদের বহু কমরেড নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন। ময়মনসিংহে নিহত হয়েছিলেন উদীয়মান কর্মী ফণী চক্রবর্তী, ভানু মজুমদার ও গোপাল নাগ। এটা ঘটেছিল ১৯৪২ ও ১৯৪৩-এ। আমাদের বিরাট প্রতিবাদ মিছিলের পরে আর হত্যাকাণ্ড ঘটাতে কেউ সাহসী হয়নি।

এরূপ প্রতিকূলতার মুখেও কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব প্রচার করতে থাকেন। তাতে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের মতো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিকরাও সে সময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এরপরে সারা বাংলায় ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দেয়। মন্বন্তরে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরাও ত্রাণকার্য সংগঠনে পার্টির অন্য কমরেডদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে আসেন। ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব প্রসার ও মন্বন্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই সময় গঠিত গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে মঞ্চায়িত কয়েকটি নাটক সারা বাংলাদেশে আলোড়ন তোলে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', 'জবানবন্দি' সে সময় শিশির ভাদুড়ীর মতো অভিনেতার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। প্রখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী গণনাট্য আন্দোলনে যোগ দেন।

লেখক-শিল্পীদের সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সে সময় শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ঢাকায়ও তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে চল্লিশের দশকে গঠিত হয়েছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশংকর রায়ের মতো খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী। এঁদের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেন ছিলেন পার্টি সভ্য। পরবর্তীকালে সাহিত্যের বিখ্যাত তাত্ত্বিক হিসেবে রণেশ দাশগুপ্ত এবং বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হিসেবে সত্যেন সেন সারা বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী, লেখক, নাট্যকার ও কবি, যথা—সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ নূরউদ্দীন, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক প্রমুখ সে সময় এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ঢাকা থেকে সে সময় এই আন্দোলনের মুখপত্ররূপে ‘প্রতিরোধ’ নামে একটি প্রথম শ্রেণির সাহিত্য পত্রিকা বের হতো।

শুধু কলকাতায় বা ঢাকায় নয়, সে সময় পার্টির সচেতন প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জেলায় লোককবি-সাহিত্যিকরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় চট্টগ্রামের রমেশ শীলের। রমেশ শীলের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পার্টির সঙ্গে যুক্ত হবার আগে তিনি ছিলেন অন্য অনেক কবিয়ালের মতো একজন। কিন্তু পার্টির সঙ্গে যুক্ত হবার পর তাঁর রচনার বিষয়বস্তু পাল্টে যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি নিয়ে তাঁর বাঁধা গান—কবিগানের মাঝে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত করে। এটা আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক মহৎ ঐতিহ্য এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই মহৎ ঐতিহ্য সৃষ্টির পটভূমি রচনা করার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। আজ অনেকেই রমেশ শীলের প্রতিভার স্বীকৃতি দেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার নবায়নের পেছনে, তাঁর সমাজসচেতনার পেছনে পার্টির ভূমিকার কথা বেমালুম চেপে যান।

রমেশ শীলের পাশাপাশি আরেকটি নাম এখানে উল্লেখ করতে হয়। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের নিবারণ পণ্ডিতের কথা বলছি। তাঁর জারিগান এবং পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর কবিতা সেদিন বাংলার সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অথচ তিনি ছিলেন অর্ধ-শিক্ষিত স্বভাব কবি।

সে সময় পার্টির উদ্যোগে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে অনেক পল্লী গায়ক পার্টির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অনেক জেলায় গানের দল গড়ে উঠেছিল। নির্মলেন্দু চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস যুক্ত ছিলেন সিলেটের গণনাট্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। পরবর্তীতে তাঁরা দুজনেই প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রংপুরের বিনয় সে সময় সারা বাংলাদেশের গণনাট্য আন্দোলনের

অন্যতম সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালের খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরীও এই সময়ের এই আন্দোলনের সৃষ্টি।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের উদ্যোগ সেই সময় শুধু সাংস্কৃতিক সংগঠন বা গানের দল গড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের জন্যও পার্টি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি', ঢাকায় ছিল 'প্রতিরোধ পাবলিশার্স'-এর বইয়ের দোকান। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং আরো অন্যান্য জেলায় বইয়ের দোকান ছিল। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগ সরকারের কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশের সর্বত্র বইয়ের দোকানগুলো হয় গুণ্ডাবাহিনী দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, নতুবা সরকারি হস্তক্ষেপে বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়।

আরেকজনের কথা না বললে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অবদানের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা বলছি। বাংলা কবিতার জগতে নতুন সমাজসচেতন ধারার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র সুকান্ত। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টদের উদ্যোগে পরিচালিত 'কিশোর বাহিনী'র নেতা। পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কিশোর পাতাটির তিনি ছিলেন সম্পাদক। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

আরো দুজনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। তাঁরা হলেন—কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জনযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। তাঁরা উভয়েই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুটি নামই উল্লেখযোগ্য।

এভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সেদিন বাংলার খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করে এ দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে নবতরঙ্গ সৃষ্টি ও বিশেষ নতুন অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিতের মতো লেখক-কবিদের নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে এ দেশের লোক-সংস্কৃতির ভাণ্ডারেও নতুন অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

১৯৫০ সালের দাঙ্গা

দেশ বিভাগের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। অবশ্য দেশে থাকার জন্য আমরা আমাদের কমরেড ও সহানুভূতিশীলদের মধ্যে প্রচার করি। তাতে প্রথমে সহানুভূতিশীলরা কিছু কিছু দেশে থেকে যান, কিন্তু ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর ব্যাপকভাবে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে থাকেন। এই দাঙ্গার সূত্রপাত হয় খুলনা জেলার একটি ঘটনা থেকে। খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামে একজন গোপন কমিউনিস্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুলিশ ও আনসার একটি মেয়েকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে পুলিশ ও আনসার ওই এলাকায় সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে দাঙ্গা শুরু করায়। খুলনার দাঙ্গার খবর কলকাতায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। পরিণতিতে দুই বাংলায় এক বীভৎস ও ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গে এই দাঙ্গা যে সরকারি মদদেই সম্প্রসারিত হয়েছিল তার বহু অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

এর ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাপক সংখ্যক ব্যক্তি দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। অপরদিকে পশ্চিমবাংলা ও বিহার থেকে বহু মুসলমানও সে সময় পূর্ববাংলায় আসেন। তাঁরাও ছিলেন দাঙ্গাপীড়িত। দেশ বিভাগের পর সরকারের যে সব হিন্দু কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ভারতে অপশন দিয়ে চলে যান। তেমনি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মচারীরাও পাকিস্তান অপশন দিয়ে চলে আসেন।

ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চলে সে সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ওই এলাকার স্থানীয় মুসলমানরা এই দাঙ্গার বিরোধিতা করায় সেখানে দাঙ্গা বাধানো সম্ভব হয়নি। অবশ্য তখন আমাদের ভলান্টিয়ার বাহিনীও অতি সচেতন, সদা প্রস্তুত ছিল। কমলাকান্দা থানায় একদল দাঙ্গাকারী লোক বের হয়েছিল। আমাদের কমরেডরা বন্দুকের আওয়াজ করে তাদের তাড়িয়ে দেন। ওই সময় জামালপুর দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ায় শত শত হিন্দু পাহাড়ি অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। কিন্তু আমাদের ভলান্টিয়াররা তাঁদের এই বলে বাধা দেন যে, তাঁদের পাকিস্তানেই থাকতে হবে, ভারতে যাওয়া চলবে না। যাঁরা প্রাণের ভয়ে চলে আসছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু অল্প শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁরা আমাদের ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে আমাদের পার্টির কাছে চিঠি পাঠাতে চান।

ভলান্টিয়াররা বলেন, "নিশ্চয়ই চিঠি পৌঁছে দেব।" আমরা ওই স্থান থেকে সাত মাইল দূরে ছিলাম। আমাদের কাছে এই মর্মে চিঠি এলো যে, "জামালপুরে আমাদের গ্রামে দাঙ্গা হয়েছে। আমরা সেখানে থাকতে পারছি না, অথচ ভলান্টিয়াররা আমাদের আসতে দিচ্ছে না। আমরা মনে করি ভলান্টিয়াররা আমাদের ভুল বুঝে আটকাচ্ছে। এর একটি বিহিত করার জন্য আমরা আকুল আবেদন জানাচ্ছি।" ওই চিঠি পেয়ে আমরা নেতাদের নিয়ে আলোচনা করলাম এবং অবিলম্বে তাঁদের বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ভলান্টিয়াররা ওই নির্দেশ পেয়ে তাঁদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন, তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করলেন।

বামপন্থী বিচ্যুতির পরিশেষ

'লাস্টিং পিসের' সম্পাদকীয়তে ভারতের পার্টির লাইনের ভুলের কথা প্রকাশিত হওয়ার পর, ভারতের পার্টির মধ্যে বিরাট আলোড়ন ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এর তীব্রতা ও তিক্ততা ভারতীয় পার্টিকে দ্বিধাবিভক্তির দিকে নিয়ে যায়। রনদিভের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর বিক্ষোভ প্রবল আকারে দেখা দেয়। সে সময় অনেক শিশুসুলভ বামপন্থী হঠকারী কাজ করার ফলে উভয় দেশের পার্টিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে দীর্ঘ আন্তঃপার্টি সংগ্রাম, তীব্র বিতর্ক, বিশেষত নেতৃবৃন্দের সহায়তায় সঠিক নীতির ভিত্তিতে প্রণীত দলিলের মাধ্যমে ভারতের পার্টি ক্রমে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

আমরাও আমাদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে দেখতে শুরু করি। ১৯৫১ সালে আমরা জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গোপন সম্মেলন ডাকি। এই প্রতিনিধি সভার আগে নেতারা কেউই প্রাদেশিক কমিটির সভ্য হতে চাননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল—"আমরা কমবেশি সবাই বামপন্থী বিচ্যুতি করেছি, কাজেই আমরা নেতৃত্বে যেতে পারি না।" প্রতিনিধিরা বলেন, "আমরাও কমবেশি বামপন্থী বিচ্যুতি করেছি, কারণ আমরা কেউই জোরেশোরে এর প্রতিবাদ করিনি।"

বামপন্থী বিচ্যুতির সময় প্রতিবাদ করলে প্রায়ই ভীরু বলে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হতো। কাজেই অনেকের প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকলেও তা করতে সাহসী হতেন না। সে সময় পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে খণ্ডিত ও খর্ব করা হয়েছিল। তাছাড়া উপযুক্ততা ও যোগ্যতা না থাকলেও যান্ত্রিকভাবে শ্রমিক-কৃষক কমরেডদের পার্টি নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করা ছিল বামপন্থী বিচ্যুতির সময়কার আরেকটি সাংগঠনিক বিচ্যুতি। পার্টিতে শ্রমিক নেতৃত্ব কোনো

সময়েই যান্ত্রিকভাবে কায়েম করা সম্ভব নয়। শ্রমিক-কৃষক কমরেডদের উপযুক্ত করেই এটা করা সম্ভব, আর সেটাই করা উচিত। অথচ তখন অনেক জেলায় শুধু শ্রমিক বা কৃষক বলেই অনেককে জেলা নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এরূপ একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল রংপুরে। কাজ চালানোর মতো কোনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কমিটিতে ছিলেন না। এর ফলে পার্টি ওই সময়ে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

যা হোক, প্রতিনিধিরা বললেন, "এখন গোপন অবস্থায় পার্টিকে ভেঙে দেওয়া যায় না। এর মধ্যেই পার্টিকে সঠিক পথে গড়ে তুলতে হবে।" প্রতিনিধিরা আরো বললেন, "কতজনের প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হবে, তা ঠিক করা হোক। তারপর আমরা ব্যালটে ভোট দেব। যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরা কেউই দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না।" ওই সম্মেলনে কোনো প্যানেল উপস্থিত করা হয়নি। স্থির হয়, নয়জনকে নিয়ে সাংগঠনিক প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হবে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, অনিল মুখার্জী প্রমুখ অনেক নেতা জেলে ছিলেন।

ভোট গণনার পর দেখা যায়—নেপাল নাগ, সুখেন্দু দস্তিদার, বারীণ দত্ত, শেখ রওশন আলী, মীর্জা আবদুস সামাদ, মণ্টু মজুমদার, শহীদুল্লাহ, মণি সিংহ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। পরে খুলনার শচীন বোসকে প্রাদেশিক কমিটিতে নেওয়া হয়। মণি সিংহ কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হন নেপাল নাগ, বারীণ দত্ত, সুখেন্দু দস্তিদার, মণি সিংহ।

এই সম্মেলনে পার্টি যে মারাত্মক বামপন্থী বিচ্যুতি করেছে তা স্বীকার করা হয়। এই ভুল সম্পর্কে পার্টির মধ্যে আলোচনা করারও সিদ্ধান্ত হয়। প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল রচনা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে প্রাদেশিক কমিটির উদ্যোগে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল রচনা করে ছাপিয়ে পার্টির মধ্যে ও সমর্থকদের মধ্যে বিলি করা হয়। পাকিস্তান আমলে সন্ত্রাসের মুখে গোপন দলিল ছাপিয়ে প্রকাশ করা সেদিন ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। দলিলে মূল কথা ছিল—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ হচ্ছে মূল শত্রু। এখানে বর্তমানে সশস্ত্র সংগ্রামের কোনো বাস্তব অবস্থাই নেই। আরো বলা হয়, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের মধ্যে কাজ করে অগ্রসর হতে হবে। আরো বলা হয়, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রামের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

এই সময় প্রদেশব্যাপী আমাদের পার্টি খুবই দুর্বল ও সঙ্কুচিত হয়ে যায়। বিশেষত ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর পার্টির অনেক হিন্দু পিতা-মাতার সন্তান ও

কমরেড দেশত্যাগ করে চলে যান। বিভিন্ন জেলায় খুব অল্পসংখ্যক কমরেড থেকে যান। তাছাড়া জেলেও বন্দী ছিলেন বহু নেতৃস্থানীয় কমরেড। এভাবে পার্টি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার ওপর দমননীতির জন্য পার্টি নেতৃত্ব আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হচ্ছিল। সে সময় আত্মগোপনে টিকে থাকাই ছিল কঠিন। কিন্তু সব প্রতিকূলতার মধ্যে সে সময় আন্দোলন পার্টি নেতৃত্বে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

জেলে নির্যাতন ও জেলের মধ্যে অন্যান্য ঘটনা

ব্রিটিশ আমলে সরকার কারাগারে রাজবন্দীদের বিশেষ মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছিল। বহু সংগ্রাম করে রাজবন্দীরা এই মর্যাদা আদায় করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক বন্দীদের রাজনৈতিক মর্যাদা তুলে নেওয়া হলো। আইনত তাঁরা তৃতীয় শ্রেণির বন্দী না হলেও—তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদির চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হতো। তাঁদের খাদ্য দেওয়া হতো তৃতীয় শ্রেণির চোর-ডাকাতদের মতো। একটি আইনের বলে রাজবন্দীদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা হতো। ১৯৪০ সালে যে "সিকিউরিটি প্রিজনার্স রুলস" ছিল, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা বাতিল করে দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। যখন বিদেশি শাসন ছিল তখন যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের দেশপ্রেমিক হিসেবে বিবেচনা করার যুক্তি ছিল। এখন আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছি, স্বাধীন হয়েছি, কাজেই এখন যাঁরা রাজবন্দী তাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে স্বাধীনতা বিপন্ন করতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের দেশপ্রেমিক হিসেবে বিবেচনা করার কোনো কারণ নেই। তাঁদের বিবেচনা করা হয় রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে! কাজেই বিদেশি শাসনামলে তাঁরা যে সুযোগ-সুবিধা পেতেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁরা সেগুলো পাওয়ার উপযুক্ত নন এবং তা তাঁরা আশাও করতে পারেন না। তাই রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে তাঁদের কোনো সুযোগ-সুবিধাই দেওয়া হতো না।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করার পরিকল্পনা করেন। তাঁরা সব জেলের বদলি হওয়া বন্দীদের মারফত যোগাযোগ করেন। যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম অনশন ধর্মঘট শুরু হয় ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ। ওই সময় জেল কর্মচারী ও সরকারি কর্তৃপক্ষ অনশন ধর্মঘটীদের সঙ্গে আলোচনা করে মৌখিক আশ্বাস দেয় যে, তাঁদের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়া হবে।

এই প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের ফলে ১৫ মার্চ বন্দীরা অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করলে রাজবন্দীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজবন্দীদের একত্রে রাখার পরিবর্তে তাঁদের পৃথকভাবে সেলে রাখার ব্যবস্থা হয়। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে এই সময় ধর্মঘট বেশিদিন স্থায়ী হয়েছিল। সেখানে ৩৮ দিন ধর্মঘটের পর কোনো রফা ছাড়াই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছিল। পরে সেখানেও ঢাকার মতো আরো বেশি নির্যাতন চালানো হয়। অন্যান্য জেলেও ঢাকা অপেক্ষা বেশিদিন অনশন চললেও সেসব স্থানে মীমাংসা ছাড়াই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

প্রথম ধর্মঘট কার্যকর না হওয়ায়, ১৯৪৯ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বার ধর্মঘট শুরু হয়। এবার শৃঙ্খলার ব্যাপারে কড়াকড়ি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ঠিক হয় পার্টির সিদ্ধান্ত ছাড়া কেউ যদি অনশন ভঙ্গ করেন, তবে তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে। ৪০ দিন এই ধর্মঘট চলার পর জেলমন্ত্রী মফিজউদ্দীন আহমদ, মুসলিম লীগ এমএনএ ফকির আবদুল মান্নান ও কংগ্রেস দলীয় এমএনএ মনোরঞ্জন ধর কারাগারে গিয়ে রাজবন্দীদের অনশন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। তাঁরা বলেন, রাজবন্দীদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর ভিত্তিতে রাজবন্দীরা অনশন ভঙ্গ করেন। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে দ্বিতীয় অনশন শেষ হয় ৪১ দিনে। পরে রাজশাহীতে অনশন ধর্মঘটীদের আত্মহত্যার প্রচেষ্টার দায়ে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সরকার এই রাজবন্দীদের ধর্মঘট সম্পর্কে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'রাজনৈতিক পঞ্চম বাহিনীর দল' পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার মানসে তৎপর হয়ে উঠেছে। সুতরাং সরকার তাঁদের 'রাজদ্রোহী' বলে মনে করে। অতএব সরকারের মতে বর্তমানের রাজনৈতিক বন্দীরা কোনো বিশেষ পদমর্যাদা বা অন্য প্রকার সুবিধা লাভ করতে পারেন না।

দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘট শেষ হবার পর নাদেরা বেগম গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। এরপর রাজবন্দীরা শুরু করেন তৃতীয়বারের অনশন ধর্মঘট। তৃতীয় ধর্মঘট ঢাকায় চলে ৪০ দিন, রাজশাহীতে ৪৫ দিন। কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের ভিত্তিতে এবারও ধর্মঘট শেষ হয়। তৃতীয় ধর্মঘটের পর রণেশ দাশগুপ্ত, ব্রজেন দাস, দেবেশ ভট্টাচার্য ও নারায়ণ বিশ্বাসসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয় এবং জেলে বিচার শুরু হয়। রাজবন্দীরা উকিলের পরামর্শ মতো মামলায় হাজির হতে অপরাগতা জ্ঞাপন করেন। এর ফলে তাঁদের সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু নাদেরা বেগমের বিরুদ্ধে জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি অভিযোগ এনে ১৯৪৯ সালে ৩০ নভেম্বর জেল গেটে একজন সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে

তাঁকে বিচারের জন্য আনা হয়। এই বিচারের সময় নাদেরা বেগম কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন এবং সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজের জুতা খুলে মারেন। এই ঘটনার পর নাদেরা বেগমকে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে মহিলা ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে মহিলা ওয়ার্ডে ফেরত নিয়ে যাওয়ার সময় ওয়ার্ডের ভেতরে অন্য মহিলা কয়েদিরা বোতল, কাচের গ্লাস ইত্যাদি ছুড়ে মারতে থাকেন। মারার অবশ্য অন্য উপযুক্ত কারণও ছিল।

জেলের নিয়ম অনুসারে মহিলা ওয়ার্ডে মেয়ে ওয়ার্ডার ছাড়া কেবল জমাদার জেলাররাই ঢুকতে পারেন। যখন সাধারণ ওয়ার্ডাররা নাদেরা বেগমকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে মহিলা ওয়ার্ডে ঢোকায়, তখন মহিলা কয়েদিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওয়ার্ডারদের আক্রমণ করেন এবং এর প্রতিবাদে স্লোগান দিতে থাকেন। তখন রাজবন্দীরা অনেকেই খেলার মাঠে ছিলেন। স্লোগানের আওয়াজ শুনে পুরুষ রাজবন্দীরাও স্লোগান দিতে থাকেন। এরই মধ্যে পাগলা ঘণ্টি দেওয়া হয়। রাজবন্দীদের ওপর লাঠিচার্জ করে তাঁদের ওয়ার্ডের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের বলা হয়, বেশি গণ্ডগোল করলে গুলি চালানো হবে। অতিরিক্ত জেলারের প্রচেষ্টায় গুলি চালানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। এরপর সরকারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করা হয়। রাজবন্দীরা জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের দাবি পূরণ না হলে তাঁরা কিছুতেই অনশন প্রত্যাহার করবেন না।

দাবিগুলো ছিল :

সব নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বন্দীর বিনাশর্তে মুক্তিদান, অন্যথায় মুক্তিসাপেক্ষে,

১. খাদ্যের জন্য জনপ্রতি তিন-চার টাকা বরাদ্দ করা।
২. খাট, তোশক, হাঁড়ি-বাসন, আসবাবপত্র ছাড়াও, দুইশ পঞ্চাশ টাকা প্রাথমিক ভাতা দান।
৩. মাসিক পঞ্চাশ টাকা ব্যক্তিগত ভাতা দান।
৪. বিচার না হওয়া পর্যন্ত গ্রেপ্তারের তারিখ থেকে প্রতি মাসে একশ টাকা পারিবারিক ভাতা দান।
৫. প্রতি সপ্তাহে চারটি চিঠি পাঠানো, দুই সপ্তাহ অন্তর সাক্ষাৎকার, থাকার উপযুক্ত জায়গা, খেলাধুলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
৬. হাজং এবং অন্যান্য বিচারাধীন বন্দীদের প্রথম ডিভিশনের নিচে না রাখা।
৭. সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য দ্বিতীয় ডিভিশনের ব্যবস্থা করা।

৮. কয়েদিদের জন্য উন্নততর খাদ্য সরবরাহ ও উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা, দৈনিক খবরের কাগজ সরবরাহ, পারিশ্রমিক ব্যবস্থা চালু, উন্নততর জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান এবং সরকারি খরচে ধূমপানের ব্যবস্থা করা। ওয়ার্ডে রেডিও বসানো এবং সব খবরের কাগজ ও পত্র-পত্রিকা সেন্সর না করে দেওয়া এবং সেলে রেডিও বসানো।

এই দাবিগুলো সম্পর্কে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেব পরিষদে জানান যে, তাঁদের মতে অনশনরত রাজবন্দীরা দেশের শত্রু। কাজেই তাঁদের এসব দাবি সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এদিকে অনশন শুরু করার পর বন্দীদের সেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। রাজবন্দীরা বললেন যে, তাঁরা ওয়ার্ড হতে সেলে যাবেন না। পর পর ধর্মঘটের কারণে তাঁদের সবারই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। কাজেই অনশনের পঞ্চম দিনেই তাঁরা খুব কাহিল হয়ে পড়েন। এই দুর্বল অবস্থায় জোর করে তাদের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ৬ নম্বর সেলে ডা. মারুফ হোসেন, সত্য মৈত্র, সিরাজুর রহমান এবং শিবেন রায়কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেলের মধ্যে দাঁতের মাজন, বিছানাপত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও নিতে দেওয়া হয়নি।

অনশনের ষষ্ঠ দিবসে অর্থাৎ সেলে পাঠানোর পরই ওয়ার্ডার দিয়ে জোর করে খাওয়ানো শুরু হয়। এই খাওয়ানোর সময় ওয়ার্ডাররা বুকের ওপর চড়ে নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে জোর করে খাবার দিত। এভাবে খাওয়ানোর সময় ডাক্তার থাকার নিয়ম, কিন্তু ডাক্তার থাকত না। জোর করে এভাবে খাওয়ানোর ফলে শিবেন রায়ের ফুসফুসে নল ঢুকে যায় এবং তিনি রক্তবমি করতে থাকেন। তিনি ছিলেন ৬ নম্বর সেলে। এই সেলের সঙ্গে অন্য সেলের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ফুসফুস ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় শিবেন রায় দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিৎকার করে কাউকে ডাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৪৯ সালের ৮ ডিসেম্বর শিবেন রায়ের মৃত্যু ঘটে। শিবেন রায় এভাবে সেলের ভেতর শহীদ হলেন।

৯ ডিসেম্বর খুব ভোরে জেলের লোকজন এসে শিবেন রায়ের মৃতদেহ নিয়ে যায়। তখন মারুফ হোসেন, সত্য মৈত্র, সিরাজুর রহমান বিষয়টি জানতে পেরে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের স্লোগানে অন্য সবাই জেগে ওঠেন। বিষয়টি জেনে সকলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় জেলের কর্তৃপক্ষ—স্থানীয় কেউই সেলে আসতে সাহস করেননি। আগে ডিসেম্বরের প্রবল শীতেও সেলের ঠাণ্ডা মেঝেতে রাজবন্দীদের শুইয়ে রাখা হচ্ছিল। শিবেন রায়ের মৃত্যুর পর সেলের দরজার সামনে তোশক, কম্বল ইত্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শিবেন রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বিবৃতিতে বলেন, "শিবেন রায় ১৯৪৯ সালের ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়

অনশন ধর্মঘট শুরু করেন এবং ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৯ রাতে মারা যান। তিনি চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করেন। তাঁকে জবরদস্তি করে খাওয়ানো হয়। পোস্টমর্টেমের পর ডাক্তার জানিয়েছেন যে, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগঘটিত স্বাভাবিক কারণেই তিনি মারা গেছেন। এর পরদিন যথারীতি স্থানীয় হিন্দু সংস্কার সমিতি দ্বারা ওই নিরাপত্তা বন্দীর মৃতদেহের সৎকার করা হয়। তারযোগে বন্দীর পিতাকে এই কথা জানানো হয়েছে।"

বিরোধী দলের নেতা বসন্ত দাস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান যে, মৃত্যুর আগে শিবেন রায়ের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া ধরা পড়েনি কেন? অনশন শুরু হয়েছিল ২ ডিসেম্বর আর তিনি মারা গেলেন ৮ ডিসেম্বর। এই জন্য বসন্ত দাস ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ার ব্যাপারটি খুব অদ্ভূত ও রহস্যজনক বলে বর্ণনা করেন। উত্তরে নুরুল আমিন বলেন, "এঁরা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক, ডাক্তাররা তাঁদের চিকিৎসা করতে পারেন না। স্টেথস্কোপ ব্যবহার করতে দিতে চান না। কাজেই তাঁদের চিকিৎসা করা যায় না।" পোস্টমর্টেমের কথাটি সত্য কিনা সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ নুরুল আমিন সংসদে উপস্থিত করতে পারেননি। মিথ্যা ভাষণ ও পাষণ্ড বর্বরতা আর কাকে বলে!

অবশ্য নুরুল আমিনের এই মিথ্যা ভাষণ কেউই বিশ্বাস করেনি। সত্য ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নুরুল আমিন নির্জলা মিথ্যা বানিয়ে বলেছেন। অনশনের আগে শিবেন রায়ের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তিনি অন্য রাজবন্দীদের মতো সুস্থ ছিলেন। এই ঘটনায় লীগ সরকারের ও নুরুল আমিনের জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নগ্নভাবে ফুটে ওঠে। এই অনশন ধর্মঘট ৫৮ দিন স্থায়ী হয়। এরই মধ্যে নুরুল আমিন সরকারদলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ক্ষমতার লড়াই ও অন্যান্য কারণে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই বাধ্য হয়ে তিনি বন্দীদের কিছু কিছু দাবি-দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বন্দীদের দুই ভাগে ভাগ করায় অসুবিধা দেখা দিল। যাঁরা ছিলেন কৃষক তাঁরা হলেন 'খ' শ্রেণি, আর যাঁরা মধ্যবিত্ত ছিলেন তাঁরা হলেন 'ক' শ্রেণির। এই বিভাগের জন্য অসুবিধা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত এই শর্ত তাঁদের মেনে নিতে হয়। দীর্ঘ ৫৮ দিন অনশন করার পর কারো আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই এই পর্যায়ে সবাই একত্র হয়ে অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নারী বন্দীরা অনশন প্রত্যাহারে প্রথমে রাজি ছিলেন না। পরে সব পুরুষের অনশন ভঙ্গ করার খবর পেয়ে তাঁরাও অনশন ভঙ্গ করেন। রাজশাহীতে তৃতীয় ধর্মঘট স্থায়ী হয় ৬৪ দিন।

এই সময় খুলনা জেলে বিষ্ণু বৈরাগীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এটাকে বে-আইনি প্রকাশ্য খুন ছাড়া কী নামে অভিহিত করা যায়।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলি

রাজশাহী জেলে রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদিরা একসঙ্গে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। কারাগারের ইন্সপেক্টর জেনারেল কারাগারে রাজবন্দীদের অনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। কিন্তু দাবি না মানলে অনশন প্রত্যাহার করা হবে না বলে তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন রাজবন্দীরা। আইজি আমির হোসেন সাহেব জেল সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবকে নির্দেশ দেন যে, পনের-ষোলজনকে যেন বিচ্ছিন্ন করে চৌদ্দ নম্বর—অর্থাৎ মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

তখন কারাগারে মানুষ দিয়ে তেলের ঘানি টানানো হতো। অনশনকারীরা এই প্রথা বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাছাড়া সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের সরকারি খরচে বিড়ি সরবরাহ করার দাবিও অনশনকারীরা করছিলেন—এটা পূর্বেই বলা হয়েছে।

১৪ এপ্রিল আইজি রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদিদের প্রতিনিধিদের ডেকে নিয়ে বলেন, "আমরা দাবি মেনে নিচ্ছি। মানুষ দিয়ে আর ঘানি টানানো হবে না। সরকারি পয়সায় তামাক বা বিড়ি দেওয়া সম্ভব হবে না, তবে যাঁরা নিজের পয়সায় তামাক বা বিড়ি কিনতে চায় তাঁদের তামাক খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়া মারধর বন্ধ হবে।" অবশেষে এই ব্যবস্থার পরে অনশন প্রত্যাহার করা হয়।

১৪ এপ্রিলের পর এলো ২৪ এপ্রিল। ওইদিন সকাল নয়টায় জেল সুপার মি. বিল তাঁর সাপ্তাহিক পরিদর্শনে আসেন। সুপারের সঙ্গে জেলের ডাক্তার, দুজন ডেপুটি জেলার, হেড ওয়ার্ডার ও আরো অনেক সিপাহি ছিলেন। রাজবন্দীরা যেখানে থাকতেন সেই খাপড়া ওয়ার্ডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুপার রাজবন্দীদের সঙ্গে আলাপ শুরু করেন। তখন রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তাঁরা দুইবেলা শুধু কুমড়ার ঘ্যাট আর খেতে পারবেন না। কাজেই তাঁদের খাদ্য তালিকা পরিবর্তন করতে হবে।

সুপার বললেন, তাঁরা ক্রিমিনাল। তাঁদের যা দেওয়া হচ্ছে তাই যথেষ্ট। আর বেশি কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। কনডেমনড সেলে যাওয়া সম্পর্কে রাজবন্দীরা বলেন, সেখানে যাওয়ায় তাঁদের আপত্তি রয়েছে। এভাবে কথা কাটাকাটি হতে থাকলে বিল তাঁর হাতের ছড়ি তুলে একজনকে মারতে উদ্যত হলেন। রাজবন্দীদের একজন বিলের ছড়িসমেত হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।

এই সময় দুজন ডেপুটি জেলার ঘরের মধ্যে ছিলেন। যা হোক, বিলকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ানো জেলার মান্নান সাহেব হুইসেল বাজিয়ে দেন। ঘরের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে বিল বন্দীদের হাত ছাড়িয়ে ঘরের বাইরে চলে আসেন। একজন ডাক্তার ও একজন ডেপুটি জেলার ঘরের মধ্যে আটকে পড়েন। বাইরে থেকে ঘরটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। জেলারের হুইসেল শুনে পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এক নারকীয় কাণ্ড ঘটে যায়। সিপাইরা জানালার ফাঁক দিয়ে বন্দুক হতে ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। রাজবন্দীরা চৌকি, নারিকেলের ছোবড়ার গদি ইত্যাদি খাড়া করে নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। গুলির আঘাতে সেগুলো ক্রমে এদিক-ওদিন ছিটকে পড়ে। কাজেই ঘরের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই গুলিবিদ্ধ হন। তবে শফিউদ্দিন প্রস্রাবের একটি ড্রাম উল্টিয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নেওয়ায় গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। খাপড়া ওয়ার্ডে যে ডেপুটি জেলার আটকে পড়েছিলেন তিনিও গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবর্ষণ শেষ হওয়ার পর সিপাইরা দুবার লাঠিচার্জ করে। আহত-নিহত রাজবন্দীদের তাজা রক্তে খাপড়া ওয়ার্ড লাল হয়ে পিচ্ছিল হয়ে গেল।

খাপড়া ওয়ার্ডের ঘটনায় যাঁরা শহীদ হন তাঁরা হলেন—

১. হানিফ শেখ, ২. আনোয়ার হোসেন, ৩. সুখেন ভট্টাচার্য, ৪. দেলোয়ার, ৫. সুধীর ধর, ৬. কম্পরাম সিং, ৭. বিজন সেন।

আহত হন ৩১ জন রাজবন্দী। যাঁরা আহত হন তাঁদের কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। বিজন সেন ও কম্পরাম সিং প্রথমেই মারা যাননি। তাঁরা চিকিৎসার অভাবে পরে হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তে-ভাগা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা কম্পরাম সিং আহত কমরেডদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যারা বেঁচে থাকবেন তাঁরা বলবেন—লাল ঝাণ্ডার সম্মান রেখেই আমরা গেলাম।"

পুলিশ সুপারকে জেলার ফোন করে জানান যে, রাজবন্দীরা কয়েদিদের সঙ্গে নিয়ে জেলগেট ভেঙে বের হওয়ার চেষ্টা করছে। অবিলম্বে সশস্ত্র পুলিশের সাহায্য প্রয়োজন। পুলিশ সুপার এসে খাপড়া ওয়ার্ডের বীভৎস ও ভয়াবহ রক্তের বন্যা দেখে হতবাক হয়ে যান। জেলার ও জেল সুপারের মিথ্যা রিপোর্টের জন্য তাঁদের তীব্র ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। তাদের গ্রেপ্তার করা হবে বলেও হুমকি দেন। অবশ্য পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। পরে জানা যায়, এই সুপারের বাড়ি ছিল ভারতের হায়দ্রাবাদে।

আঘাতপ্রাপ্তদের চিকিৎসা না হওয়ার ফলে নুরুন্নবী চৌধুরীর গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়, তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। জেল হাসপাতালে চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর আহত রাজবন্দীদের ১৪ নম্বর কনডেমন্ড সেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের মানুষ নামধারী

জল্লাদরা একবারে ঠাণ্ডা মাথায় জেলখানায় নারকীয় ও পৈশাচিক নিপীড়ন এবং আক্রমণ চালিয়ে সাতজন দেশপ্রেমিক অকুতোভয় বিপ্লবীকে খুন করে। এই ফ্যাসিস্ট ও নাজিসুলভ বর্বর অত্যাচারের নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করার কি কোনো ভাষা আছে?

যুব লীগ গঠন

১৯৫১ সালে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছিল অতি উৎকটভাবে প্রবল। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কাটিয়ে ক্রমে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারের জন্য একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

আমাদের পার্টি সভ্য, সমর্থক ও অন্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে একটি যুব সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। পার্টি পরিকল্পনা করে এই সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে যুব লীগ গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদ্যোক্তারা বার লাইব্রেরি হলে এসে দেখলেন যে, সশস্ত্র পুলিশ বার লাইব্রেরি দখল করে বসে আছে। তখন উদ্যোক্তারা সদরঘাটে গিয়ে একটি বড় নৌকা ভাড়া করলেন। বুড়িগঙ্গার বুকে ওই নৌকার মধ্যে সংগ্রামী যুবকরা পুলিশের বাধা অতিক্রম করে সভা করেন এবং যুব লীগ গঠন করেন। বুড়িগঙ্গার বুকেই সংগ্রামী যুব লীগ গঠিত হয়। সভাপতি হলেন মাহমুদ আলী, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা, সম্পাদক অলি আহাদ, যুগ্ম-সম্পাদক ইমাদুল্লাহ। আবদুস সামাদ, আবদুল মতিন, কামরুজ্জামান প্রমুখ কার্যকরী কমিটির সভ্য হলেন। দেওয়ান মাহবুব আলী হলেন কোষাধ্যক্ষ। ১৯৫৫ সালে যুব লীগের সভাপতি হলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, সহ-সভাপতি হলেন অলি আহাদ, সম্পাদক ইমাদুল্লাহ। ইমাদুল্লাহ ছিলেন একজন ত্যাগী একনিষ্ঠ করিতকর্মা পার্টি কর্মী। ১৯৫৬ সালে বসন্ত রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে প্রগতিশীল আন্দোলনের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়।

এই সময় যুব লীগের অন্য সভ্যরা ছিলেন আবদুর রহমান (টাঙ্গাইল), নূরুর রহমান (সিলেট), খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, খন্দকার গোলাম মুস্তফা, গাজীউল হক, আখলাকুর রহমান, সরদার আবদুল হালিম, আবদুস সামাদ আজাদ (পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগে), মতিউর রহমান, খাজা আহমদ (ফেনী), মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী, আজিজুল ইসলাম খান, মৃণাল বারুড়ী প্রমুখ। এই সময়ে প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনে যুব লীগ এক বলিষ্ঠ

ভূমিকা গ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলনে যুব লীগের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আওয়াজ জোরেশোরে তুলে ধরা হয়। 'সিয়াটো', 'সেন্টা'র বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচার ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা হয়ে ওঠে একটি প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক পার্টির মতো। সারাদেশেই যুব লীগ গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় তাঁদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। এই প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে বহু যুবক এসে যোগদান করেন। যুব লীগ একটি শক্তিশালী যুব সংগঠনে পরিণত হয়। প্রকাশ্যে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে এই সংগঠনের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন অগ্রসর করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সে সময় এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। মার্শাল ল প্রবর্তনের পর ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে এই সংগঠন বে-আইনি ঘোষিত হয়ে যায়।

১৯৫০ সালের মূলনীতি ঘোষণা

১৯৫০ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল না। আরো বলা হয়েছিল যে, উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই মূলনীতি প্রকাশ হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদে এক বিরাট মিছিল বের হয়। মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান তখন গ্রেপ্তার হন। কিন্তু তাতে আন্দোলন থেমে থাকে না। ১৯৫০ সালে ঘোষিত মূলনীতির প্রতিবাদে এক বিরাট জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। আতাউর রহমান খানের ওই সম্মেলনের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি সভাপতিত্ব করতে পারেননি।

ওই সম্মেলনের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। আরো দাবি করা হয়, বাংলা হবে উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। বলা হয়, বৈদেশিক নীতি ও দেশরক্ষা ছাড়া আর সব ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সারা প্রদেশব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদের মুখে পরে সরকার ওই মূলনীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

আমরা তখন আত্মগোপনে। পার্টির বহু কর্মী জেলে। তবু এ অবস্থায়ও পার্টি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয়। পার্টির কর্মীদের ভূমিকা এই আন্দোলনে ছিল উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে পার্টি ওই সময়ই এগিয়ে এসেছে। এটাই পার্টির ইতিহাস।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন

পাকিস্তান-উত্তর ঘটনাবলিতে মুসলিম লীগের গণতন্ত্রমনা কর্মীরা মুসলিম লীগকে ক্রমে অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন মনে করতে শুরু করেন। তাঁরা মুসলিম লীগের পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এর ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার পূর্বে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সেটি হচ্ছে টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচন। মাওলানা ভাসানী আসাম থেকে দেশে ফিরবার পর টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) কেন্দ্র হতে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর করোটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী নির্বাচন অবৈধ ঘোষণার জন্য আবেদন জানান। সেই আবেদনের ভিত্তিতে গভর্নর নির্বাচন বাতিল করে দেন। তাছাড়া নির্বাচনের হিসেব দাখিল না করার জন্য মাওলানা ভাসানী ও খুররম খান পন্নী ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না—এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়। ফলে এই আসনটি খালি হওয়ায় ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রাদেশিক সরকার নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এই খবর শোনার পর মুসলিম লীগের গণতন্ত্রমনা কর্মীরা শামসুল হককে মুসলিম লীগবিরোধী প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে খুররম খান পন্নীকে প্রার্থী করার অসুবিধা দূর করার জন্য গভর্নর বিশেষ ক্ষমতাবলে খুররম খান পন্নীর বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নেন। অথচ অন্য তিনজনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে।

নুরুল আমিনের এরূপ চরম অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে সারা প্রদেশের গণতন্ত্রমনা কর্মীদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। শামসুল হক ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। টাকা-পয়সার প্রচণ্ড অভাব ছিল। অন্যদিকে নুরুল আমিনসহ বড় বড় নেতা পন্নীর সমর্থনে প্রচার চালান এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। নির্বাচনে খুররম খানের স্ত্রী শামসুল হককে সাহায্য করতে চান, কিন্তু তাঁর সাহায্য তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু পন্নীর স্ত্রী পন্নীর ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর দোষারোপ করে ইশতেহার দেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরাটভাবে প্রচার করলেও তারা পরাজিত হয়। শামসুল হক প্রচুর ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

মুসলিম লীগের এই পরাজয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতে নুরুল আমিনও খুবই ভীত হয় পড়েন। ফলে তিনি আর উপ-নির্বাচন দিতে সাহসী হন না। এদিকে

শামসুল হকের আসনটি বাতিল হয়ে যায় এক বছর পরে। এই আসনটি বাতিল হবার কারণ হচ্ছে যে, মাওলানা ভাসানীর আসনটি বাতিল হবার পর তিনি ধুবড়ী চলে যান। ধুবড়ী উপস্থিত হলে আসাম সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। দ্বিতীয় নির্বাচনের সময় তিনি ধুবড়ী জেলে আটক ছিলেন। শামসুল হকের একজন সমর্থক কর্মী ধুবড়ী জেলে গিয়ে মাওলানার সঙ্গে দেখা করে শামসুল হকের সমর্থনে একটি ইশতেহারে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে আসেন। নির্বাচন চলার সময় ভাসানীর স্বাক্ষরযুক্ত সেই ইশতেহার বিলি করা হয়। কিন্তু এটা জানতে পেরে শামসুল হকের পক্ষের নেতারা তা বন্ধ করে দেন ও ছাপানো ইশতেহার নষ্ট করে ফেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু ইশতেহার বিলি হয়ে যায়। ইশতেহারটিতে মাওলানা ভাসানীর স্বাক্ষরের প্রতিলিপি ব্লক করে দেওয়া হয়েছিল।

নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পর ওই ইশতেহারকে কেন্দ্র করে শামসুল হকের আসনটি বাতিলের আবেদন জানানো হয়। বলা হয় যে, মাওলানা ভাসানীর স্বাক্ষর জাল করে জয়লাভের উদ্দেশ্যে অসৎ উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। ইশতেহারে মাওলানা ভাসানীর স্বাক্ষর জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। কাজেই এটা আসলেই জাল স্বাক্ষর। এই নিয়ে ট্রাইব্যুনালে মামলা চলে এক বছর। সোহরাওয়ার্দী ট্রাইব্যুনালে শামসুল হকের পক্ষে ওকালতির জন্য ঢাকায় আসেন। ১৯৫০ সালে ২১ জুলাই সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে প্রাদেশিক সরকার জানায় যে, তার কার্যাবলি ইলেকশন ট্রাইব্যুনালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তিনি কোথাও জনসভায় বক্তৃতা করতে পারবেন না। ট্রাইব্যুনালের কাজ শেষ হলে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁর ঢাকা ত্যাগ করতে হবে। এই অবস্থার ব্যতিক্রম হলে তাঁকে গ্রেপ্তারের প্রয়োজন হতে পারে। বছর খানেক নির্বাচনের মামলা চলার পর শামসুল হকের নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের তারিখ

২৩ ও ২৪ জুন ১৯৪৯ তারিখে সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য গণতন্ত্রমনা মুসলিম লীগ কর্মীদের এক সভা আহ্বান করা হয়। মাওলানা ভাসানী অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অভ্যর্থনা কমিটির মুসলিম লীগ কর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে। কাজী বশীরের আমন্ত্রণে তাঁর স্বামীবাগের বাসভবন রোজ গার্ডেনে সম্মেলন হবে বলে স্থির হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন রোজ গার্ডেনে সম্মেলনে শুরু হয়। তাতে দুইশ পঞ্চাশ থেকে তিনশ কর্মী

উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন সংগঠন গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী-পুরুষ লীগের সভ্য হিসেবে গণ্য হবে। তার জন্য তাঁদের কোনো চাঁদা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। শুধু ক্রিড (creed)-এ স্বাক্ষর দিলেই তাঁরা নতুন প্রতিষ্ঠানের সভ্যরূপে গণ্য হবেন।

বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীগণ কতকগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হচ্ছে :

১. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটারাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন।
৩. মন্ত্রিমণ্ডলীর বিবিধ কার্যকলাপের তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা।
৪. কারারুদ্ধ ছাত্রনেতাদের মুক্তি।
৫. ছাত্রদের ওপর থেকে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার।
৬. অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।
৭. বিক্রয় কর প্রত্যাহার।
৮. সরকারি উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান।
৯. লেভি সম্পর্কে যেসব সরকারি অন্যায় ও অত্যাচার হচ্ছিল, সেগুলো প্রতিকারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

চল্লিশজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতে মাওলানা ভাসানী সভাপতি, শামসুল হক সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের ইতিহাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। গণতান্ত্রিক আন্দোলন অগ্রসর করে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই সংগঠন স্বাধীনতার আগে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আমাদের পার্টি গোড়া থেকেই এই সংগঠনের প্রতি বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। গোড়া থেকেই পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল কয়েকজন কর্মী এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্য নেতাদের সঙ্গেও পার্টি বন্ধুসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

কয়েক বছর পর অনেক আলোচনার ফলশ্রুতিতে আওয়ামী মুসলিম লীগকে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ভাষা আন্দোলন : সূচনাকাল

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে দাবি করেন যে, উর্দু ও ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও মন্ত্রী গজনফর আলী বলেন, "উর্দু কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, উর্দু হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির প্রতীক।" পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরা একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে; কাজেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে অন্যতম ভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ পেয়ে ছাত্র, রাজনৈতিক মহল ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খাজা নাজিমউদ্দীনের বক্তব্য সবাই ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক বলে মনে করতে থাকেন। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, মুসলিম লীগের বাঙালি সদস্যরা কোন যুক্তিতে বাংলা ভাষাকে পরিষদের অন্যতম ভাষার মর্যাদা দেওয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় এর প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করেন। ছাত্ররা ওইদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিকেলের দিকে এক সভা করেন। সেই সভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানানো হয়। কয়েকটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।

কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধি, গণতান্ত্রিক যুব লীগ, তমদ্দুন মজলিস প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ওই সভা ১১ মার্চ সব পূর্ব পাকিস্তানে একটি সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১১ মার্চের সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য ছাত্ররা পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করেন। হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। হাইকোর্টের সামনে ছাত্ররা যখন পিকেটিং করছিলেন, ওই সময়ে ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করায় উকিলরা তার প্রতিবাদে সেদিনের জন্য হাইকোর্ট বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন। পুলিশ বিভিন্ন স্থানে লাঠিচার্জ করে এবং ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। নঈমউদ্দীন ছিলেন সংগ্রাম কমিটির নেতা। তিনি এক বিবৃতিতে ১১ মার্চের ধর্মঘটের বিভিন্ন ঘটনায় আহত

ও পুলিশ দ্বারা ধৃতদের একটি হিসাব প্রদান করেন। তাঁর হিসাবে দেখা যায় যে, আহত দুইশ জন, গুরুতর আহত আঠারোজন, ধৃত নয়শ। এঁদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। জেলে থাকেন ঊনসত্তরজন। ১১ মার্চের হরতাল ও ধর্মঘট সফল হয়। সেক্রেটারিয়েট ও রেল কর্মচারীরাও ধর্মঘটে যোগ দেন। আংশিকভাবে রেল ধর্মঘটও হয়। যশোরসহ বিভিন্ন জেলাতেও এই ধর্মঘট হয়। ১১ মার্চের পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ১৩ মার্চ পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ১৫ মার্চ পর্যন্ত হরতাল চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ ওইদিন ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন। ১৪ ও ১৫ মার্চ ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুরে ধর্মঘট পালিত হয়।

১৫ মার্চ মোহাম্মদ আলী ও খাজা নসরুল্লাহ্ কামরুদ্দীন সাহেবের বাসায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলেন যে, নাজিমউদ্দীন আজই সাড়ে এগারটার সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ভাষা প্রশ্নে আলোচনা করতে চাচ্ছেন। এই খবর জানার পর ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। ওই বৈঠকে নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করার ব্যাপারে একমত হন। আলোচনার জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব কামরুদ্দীন সাহেব প্রস্তুত করেন। সেটাও ওই সভায় আলোচিত হয়। পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্ধমান হাউসে নাজিমউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। যাঁরা এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন—কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমউদ্দীন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, আজিজ আহমেদ, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। নাজিমউদ্দীন প্রস্তাব করেন যে, প্রাদেশিক সরকারের চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহম্মদ এই আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা তাতে সম্মত না হওয়ায় আজিজ আহম্মদকে বাদ দিয়েই আলোচনা করার কথা হয়। সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে নাজিমউদ্দীনের তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। নাজিমউদ্দীন ছিলেন খুব শঙ্কিত। কেননা ১৯ মার্চ ছিল জিন্নাহ্ সাহেবের আগমনের তারিখ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এটাই ছিল তার প্রথম ঢাকা সফর। অবশেষে নাজিমউদ্দীন সংগ্রাম কমিটির আট দফার চুক্তিটি মেনে নেন।

চুক্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ থেকে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদেরকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হবে।

১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার জন্য যেদিন স্থির করা হয়েছে, সেদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেব ইংরেজি উঠে যাওয়ার পরই বাংলা তার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি পাবে। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হবে।

বন্দীমুক্তি

১৫ মার্চ সন্ধ্যায় ভাষা আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য ঢাকা জেল গেটে আনা হয়। শওকত আলী ও কাজী গোলাম মাহবুবের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ করে স্বতন্ত্র মামলা করা হয়েছিল। কাজেই তাঁদের মুক্তির আদেশ আসেনি। রণেশ দাশগুপ্ত কমিউনিস্ট বলে তাঁরও মুক্তির আদেশ আসেনি। বন্দীরা এই তিনজনকে বাদ দিয়ে মুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। পরে নাজিমউদ্দীনকে ব্যাপারটি অবহিত করলে, ওই তিনজনেরও মুক্তির আদেশ আসে। তখন সবাই মুক্তি পেয়ে যান। ওই সময় জেলে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক প্রমুখ।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ব্যাপক জনসমাগম হয়। তিনি বক্তৃতায় বলেন, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। এই বক্তব্যের পর মৃদুকণ্ঠে 'না' 'না' ধ্বনি উত্থিত হয়। কিন্তু বিশাল জনতা শান্তভাবেই তাঁর বক্তৃতা শোনে। তাঁর বক্তৃতায় ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের এক অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রেসকোর্সের বক্তৃতার পর জিন্নাহ্ সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়। এর ফলে বাংলা ভাষার প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পায়।

সমাবর্তন বক্তৃতা

২৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এখানেও বক্তৃতায় বলেন যে, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হবে"। এই ঘোষণা করা মাত্র হলের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছাত্র 'না' 'না' বলে প্রতিবাদ জানান।

ব্যবস্থাপক সভায় খাজা নাজিমউদ্দীনের প্রস্তাব

ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

(ক) পূর্ববাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এবং যতশীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলো দূর করা যায় তত শীঘ্র কার্যকর করা হবে।

(খ) পূর্ববাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হবে যথাসম্ভব বাংলা ভাষা।

প্রস্তাবে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব মোটেও উত্থাপন করা হয় না, যদিও চুক্তির মধ্যে এটা সুপারিশ করার কথা মেনে নেওয়া হয়েছিল। এভাবে নাজিমউদ্দীন বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এসব ঘটনার পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে আসে।

এ সময়ে ছাত্র আন্দোলন ছাড়াও অন্য কতকগুলো আন্দোলন ছিল উল্লেখযোগ্য। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, চাকরিগত নানা অসুবিধার জন্য কতকগুলো আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ৮ এপ্রিল বিভিন্ন দাবিতে ১৮ দিন স্থায়ী যে ধর্মঘট করেন, তা উল্লেখযোগ্য।

পুলিশ ধর্মঘট

পুলিশরা দেড় মাস বেতন না পাওয়ায় ১৯৪৮ সালের ১৪ জুলাই ধর্মঘট করেন। তাঁরা ঢাকা শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সরকার অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সামরিক বাহিনীকে খবর দিয়ে আনে। লালবাগের পুলিশ লাইন সামরিক বাহিনী এসে ঘেরাও করে ফেলে। দুপক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। ফলে দুজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত ও নয়জন আহত হন।

এই সময়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ঢাকায় আসেন। তাঁকে জননিরাপত্তা আইনে বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়। তাঁকে বলা হয় যে, তিনি এখানে গণ্ডগোল পাকাতে এসেছেন। সোহরাওয়ার্দী যদি সফরসূচি বাতিল করেন এবং প্রদেশ ছেড়ে চলে যান, তবে অন্তরীণ আদেশ প্রত্যাহার করা হবে। তিনি প্রদেশ ছেড়ে যেতে রাজি হলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি কলাকাতায় চলে যান।

ঢাকা মেডিকেল ছাত্ররা কতকগুলো দাবি-দাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ সেগুলো মেনে নিতে সম্মত না হওয়ায় ৩৬ জন ছাত্র অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। অনশনকারী ছাত্ররা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী হাবীবুল্লা বাহারের বাসভবনের সম্মুখে এবং সার্জন জেনারেল ও মিটফোর্ড হাসপাতাল অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে নেয়। ফলে ২৭ এপ্রিল তাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের কন্যা এলিজাবেথের পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষে অন্যান্য সরকারি ভবনের সঙ্গে রাজশাহী কলেজেও পাকিস্তানের পতাকার সঙ্গে ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাকও তোলা হয়। এর ফলে ছাত্ররা ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'কমনওয়েলথ ছাড়তে হবে' ইত্যাদি স্লোগান দেন। জোর করে ইউনিয়ন জ্যাক নিচে নামিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়।

নতুন বিক্রয় কর ধার্যের বিরুদ্ধে ঢাকা এবং প্রদেশের অন্যত্র জনসাধারণ ও দোকানদারদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬ মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়।

ইডেন ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল একীভূত করার প্রতিবাদে এই দুই স্কুল ও ইডেন কলেজের পাঁচশ ছাত্রী ১৫ নভেম্বর ধর্মঘট করেন। এরপর ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পাঁচশ পঁচাত্তর জন ছাত্রের মধ্যে প্রায় পাঁচশ ছাত্র তাঁদের দাবি নিয়ে ধর্মঘট করেন। স্কুল ও কলেজের আংশিক দাবি কর্তৃপক্ষ পূরণ করায় তিন সপ্তাহ পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৪৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ফেডারেশন ময়মনসিংহের টংক আন্দোলনের কৃষকদের ওপর গুলি চালানো এবং কৃষক হত্যার প্রতিবাদে একটি জনসভা আহ্বান করে। একদল ছাত্র সেই সভাটি ভেঙে দেওয়ার জন্য সভাস্থলে উপস্থিত হয়। মোহাম্মদ বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হওয়ার পরই ওই ছাত্ররা গুণ্ডামি আরম্ভ করে। ফলে সভা করা আর হয় না। সে সময় প্রতিক্রিয়াশীলরা একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল সংগঠনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বা সহ্য করতেও প্রস্তুত ছিল না। ছাত্র ফেডারেশন এই ঘটনার প্রতিবাদে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘট ১৯৪৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নকর্মচারীরা কতিপয় দাবির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকদিন আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের অবস্থার কোনো প্রতিকারের আশা না দেখে এক মাসের নোটিশ দিয়ে ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু করেন। নিম্নকর্মচারীদের ইউনিয়নটি আমাদের কমরেডরা পরিচালনা করতেন। ধর্মঘটের প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র সংগঠন বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

নিম্নকর্মচারীদের সমর্থনে ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করেন। ৫ মার্চ সভা ডেকে ছাত্ররা স্থির করেন যে, যতদিন কর্তৃপক্ষ দাবি না মানে ততদিন ছাত্ররা সহানুভূতি ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। নিম্নকর্মচারী ও ছাত্রদের ধর্মঘট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-কর্মচারী পরিষদ পরিচালনা করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল ও ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকেন। এরই মধ্যে ভাইস চ্যান্সেলর, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার প্রমুখ আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মৌখিক আশ্বাস দেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় তাঁরা ব্যাপারটি আলোচনার জন্য প্রস্তাব করবেন। এই আশ্বাসে ছাত্ররা মোটামুটি সন্তুষ্ট হন। ১০ মার্চ ছাত্র ও নিম্নকর্মচারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রনেতারা বক্তৃতা দেন যে—আমাদের জয় হয়েছে, এখন নিম্নকর্মচারীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা উচিত। ছাত্রনেতারা বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, কর্তৃপক্ষ তাঁদের অঙ্গীকার রক্ষা না করলে বুকের রক্ত দিয়ে তারা ধর্মঘটীদের দাবি আদায় করে দেবেন। এই প্রতিশ্রুতির পর ধর্মঘটীরা দুপুর একটার সময় যে যাঁর কাজে যোগদান করতে থাকেন। তবে ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর কাজে যোগদান করতে গেলে কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের কাজে যোগদানে বাধা দেয়। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল যে, ১০ মার্চ বেলা ১১টায় কাজে যোগদানের কথা ছিল। তাঁরা নির্ধারিত সময়ে কাজে যোগ না দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করে। প্রকৃতপক্ষে আগের দিনের আলোচনায় ১১টার সময় কাজে যোগদানের কথা ছিল না। মৌখিক চুক্তি ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্ররা সভা করে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১২ মার্চ পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপনা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে আইন পরিষদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাঁরা

‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’, ‘আরবি হরফ চাই না’ ইত্যাদি স্লোগান উত্থাপন করেন। ওই মিছিল থেকে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলটি পরিচালনা করে ছাত্র ফেডারেশন।

ছাত্রদের ধর্মঘট ও মিছিল চলতে থাকে। পুলিশ অনেককে লাঠিচার্জ করে আহত করে, কিন্তু ছাত্ররা তাতে দমে যাননি। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পর ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এঁদের মধ্যে ছয়জনকে চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং ১৫ জনকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। পাঁচজনকে ১৫ টাকা জরিমানা ও একজনকে ১০ টাকা জরিমানা করা হয়। কর্তৃপক্ষের এই আচরণের প্রতিবাদে ছাত্র-কর্মচারী পরিষদ ১৭ এপ্রিল অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে সাধারণ ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। ২৫ এপ্রিল ঢাকার সব প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। সকালের দিকে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে থেকে অনেক ছাত্রকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য জায়গায়ও কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ ছাত্রের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও বহিষ্কারের বিরুদ্ধে এই সভা হয়। প্রতিকারের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মিছিল নিয়ে ছাত্ররা সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এরপর ছাত্ররা একত্র হয়ে সেক্রেটারিয়েটের দক্ষিণ গেটে উপস্থিত হয়। পুলিশ-কর্ডন ভেদ করে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে কয়েকজনকে গুরুতরভাবে আহত করে। তাঁদেরকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এত উৎপীড়নের পরও বেলা তিনটার সময় ছাত্ররা আবার সম্মিলিত হয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করেন। আওয়াজ দেয়—“ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ”, “জুলুমবাজি চলবে না’, “হাজার লোকের ভাত মারা চলবে না”, “মজুর-কৃষক-ছাত্র ভাই ভাই” প্রভৃতি। শহর ঘুরে ছাত্ররা আরমানিটোলা ময়দানে যায়। সেখানে পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে পরদিন আবার ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়া হয়।

ছাত্র-কর্মচারী পরিষদ ২৫ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে সরকার গণ্ডগোলের আশঙ্কায় রমনা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ২৫ এপ্রিল শহরে অভূতপূর্ব একটি ঘটনা ঘটে। সরকারি কর্মচারীরাও দুপুর ১২টা পর্যন্ত অফিসে না গিয়ে ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, নবাবপুর পর্যন্ত মিছিল করেন। বাস, রিকশা বন্ধ করে তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক ধর্মঘটে মিলিত হন। আরমানিটোলা ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাজার হাজার ছাত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তোলেন—“ফ্যাসিস্ট নীতি ধ্বংস হোক”, “পুলিশি জুলুম চলবে না”, “১৪৪ ধারা বাতিল কর”, “ছাত্রবন্দীদের মুক্তি চাই” ইত্যাদি। সভা শেষে সেক্রেটারিয়েটের উদ্দেশ্যে এক বিরাট মিছিলে হাজার হাজার ছাত্র ও জনসাধারণ শহরকে মুখরিত করে তোলেন। কিন্তু তাঁরা নাজিরাবাজার গেট অতিক্রম করতে পারেন না। সেখানে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। তারপর তাঁরা নবাবপুর ক্রসিং-এর সামনে উপস্থিত হন। সেখানেও পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। পুলিশের বাধা অতিক্রম করতে না পেরে তাঁরা রাস্তার ওপর বসে পড়েন। ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ এ সকল নিরস্ত্র মিছিলকারীর ওপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। পুলিশের এই নির্যাতনের পরও ছাত্রদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়নি। তাঁরা নানারূপ ধ্বনি দিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়। সভায় জনসাধারণ দলে দলে যোগদান করেন। তাঁরা ছাত্রদের প্রতি তাঁদের সংহতি জানান।

এই পর্যায়ের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ধীরে ধীরে কমে আসে। ২৬ এপ্রিল কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদ ক্রমগত ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৭ এপ্রিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়। আমাদের ছাত্র কমরেডরা এই আন্দোলনগুলোতে আগাগোড়াই সক্রিয় ও উদ্যোগী ছিলেন। সব ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন ব্যাপকতর করার জন্য তাঁরা সবসময় সচেষ্ট ছিলেন।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ্ সাহেবের মৃত্যু হয়। তারপর খাজা নাজিমউদ্দীন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান এবং খাজা নাজিমউদ্দীন হলেন প্রধানমন্ত্রী। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী গোলাম মোহাম্মদ হলেন গভর্নর জেনারেল। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন ঢাকায় এসে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ২৬ জানুয়ারি ঘোষণা করেন, ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’। এর ফলে ছাত্ররা ভীষণ বিক্ষুব্ধ হন। ১৯৪৮ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন ছাত্রদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে সুপারিশ করবেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। তার ওপর আবার উর্দুর পক্ষে ওকালতিতে সবাই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নাজিমউদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে

৩০ জানুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট করেন। সেই দিনই বার লাইব্রেরিতে আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ, যুব লীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদ ও খিলাফতে রাব্বানী পার্টি নিয়ে এক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। সভ্যরা ছিলেন মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, আবুল হাশেম, কামরুদ্দীন আহমেদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ।

ভাষা আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন। এই আন্দোলন থেকে সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। সরকারের জাতীয় দলননীতির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জাতীয় অধিকারের দাবি ক্রমে জোরদার হয়ে উঠতে থাকে।

৪ ফেব্রুয়ারি আবার ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং স্থির হয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস রূপে পালিত হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি নুরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ঐদিন সর্বদলীয় কর্মপরিষদের উদ্যোগে সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য মত প্রকাশ করে। আমাদের কমরেডরা এই সভায় ১৪৪ ধারা না ভাঙার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা, সেখানে ছাত্ররা কর্মপন্থা ঠিক করবেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে আমতলার ছাত্রসভায় শামসুল হক যখন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের মত জানান, তখন এই শুনে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নানারূপ ধ্বনি দিয়ে তারা শামসুল হককে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্ররা স্থির করেন যে, ১০-১০ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জগন্নাথ হলে (তখন ওখানে ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বসত) গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন।

কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই এই পর্যায়ের ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। পার্টি নেতৃত্ব ছিল আত্মগোপনে। তবু তাঁরা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৪৪ ধারা ভাঙা না ভাঙা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের কমরেডদের এই মত জানিয়েছিল যে, ১৪৪ ধারা ভাঙার মতো মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে থাকলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে। অবস্থা বিচার করে প্রকাশ্যে কমরেডরা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কেউ কেউ বলেন যে, সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি নাকি ১৪৪ ধারা ভাঙার নির্দেশ দেয়নি। অথচ প্রকৃত ঘটনা হলো, আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার কথা কখনো বলিনি।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দশ দশজন করে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম দলটি ছিল ছাত্রীদের। তাঁরা এবং পরবর্তী আরো অনেক দল গ্রেপ্তার হয়ে যায়। এক সময় পুলিশ আকস্মিকভাবে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে শুরু করে। ছাত্ররা ছিলেন জঙ্গি। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস তাঁদের উত্তেজিত করে তোলে। বিকেলবেলা কোনোরূপ হুঁশিয়ারি না দিয়ে পুলিশের গুলি চালানোর ফলে প্রথম ঝাঁকের গুলিতে জব্বার ও রফিক শহীদ হন। এর পরবর্তী গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত শহীদ হন। এইভাবে সেখানে তিনজন শহীদ হয়ে যান। এই খবর যখন চারদিকে প্রচারিত হয়ে পড়ে, তখন ঢাকায় বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। সর্বস্তরের মানুষ এই সংগ্রামে নেমে আসেন। গুলিতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শুনে মাওলানা তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, খয়রাত হোসেন ও আনোয়ারা বেগম আইন পরিষদ থেকে বের হয়ে আসেন। তখনো আইন পরিষদের অধিবেশন চলছিল।

এই হত্যাকাণ্ডে সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সাধারণ হরতাল পালিত হতে থাকে। জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে 'মর্নিং নিউজ' ও 'সংবাদ' অফিস পুড়িয়ে দেয়। 'মর্নিং নিউজ' ও 'সংবাদ' ছিল মুসলিম লীগের পত্রিকা। নারায়ণগঞ্জে রাস্তায় ব্যারিকেড স্থাপিত হয়। এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়ে যায়। মন্ত্রীরা ভীত হয়ে পড়েন। তাঁরা সামরিক ছাউনিতে আশ্রয় নেন। নুরুল আমিন এই আন্দোলনকে কমিউনিস্টদের কারসাজি বলে বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, কমিউনিস্টরা সাপ, তারা গর্তে থাকে, রাত্রিবেলায় বের হয় (কমিউনিস্ট পার্টি তখন গোপন ছিল)। তিনি আরো বলেন যে, ভারত থেকে পায়জামা পরে হিন্দুরা এসে এই আন্দোলন করছে। তাঁর এসব আজগুবি মিথ্যা কথা কেউই বিশ্বাস করে না। ঢাকার পাড়া পাড়ায় "নুরুল আমিনের কল্লা চাই" বলে আওয়াজ ওঠে। মিলিটারি ও ইপিআর ডাকা হয়। হরতালের ফলে ঢাকা শহর একেবারে অচল হয়ে যায়। দেশব্যাপী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জনগণ মরিয়া হয়ে ওঠে। এই সময়ে আমাদের কিছু কমরেডের মধ্যে এই চিন্তাধারা জাগ্রত হয় যে, যেহেতু বাঙালিরা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যেহেতু বাঙালিরা আন্দোলন করছে কাজেই আমাদের অন্য কোনো ভাষা সম্পর্কে দাবি তোলার দরকার নেই, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শুধু বাংলার দাবি তুলতে হবে। কিন্তু তখনকার অবস্থায় বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা সম্ভব ছিল না। বাংলা ও উর্দু দুটি রাষ্ট্রভাষা চাই-এই স্লোগান ছিল তখনকার দিনের পক্ষে বাস্তব ও উপযুক্ত আওয়াজ।

শহীদুল্লা কায়সার তখন আত্মগোপনে ছিলেন। পার্টির পক্ষ থেকে তিনি '৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব থেকেই যুক্ত ছিলেন। আমরা ঝুঁকি নিয়েও তাঁকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে পাঠাই। তিনি গুলির পর

থেকে আন্দোলনের প্রতিটি পর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের কমরেড ও অন্যদের বোঝান—শুধু বাংলা নয়, বাংলা ও উর্দু এই দুই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলতে হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আমরা বাংলা ইশতেহার ছাড়া সাইক্লো করে উর্দু ইশতেহারও বিলি করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক রিজভী ইশতেহারটি সাইক্লোস্টাইল করে দেন।

দেশে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়। এর আগে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ কোনো আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেননি। নুরুল আমিন সরকার আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে "কমিউনিস্টদের কারসাজি", "ভারত থেকে হিন্দুদের আগমন"—এই সব মিথ্যা ভাঁওতা ছেড়ে আইন পরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে এক প্রস্তাব পাস করেন। ভাষা আন্দোলনের কয়েকদিন পর শত শত কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা আইন পরিষদে সুপারিশের পর ও প্রচণ্ড দমননীতির ফলে আন্দোলন আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেলেও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা কখনো ম্লান হয়নি।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। ওই সংবিধানে উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের শুধু উন্মেষই ঘটেনি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আকাঙ্ক্ষাও উজ্জীবিত হয়। এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের এক ব্যাপক জঙ্গি সংগ্রাম।

চূড়ান্ত দমননীতির মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টি এই সংগ্রামের সঙ্গে শুধু যুক্তই ছিল না, এই আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে ব্যাপকতর করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। সে সময় আমাদের কমরেডরা প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কেবল বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করে আন্দোলনের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি জাতি-গোষ্ঠীগুলোকে জমায়েত করে আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার যে বিপদ তখন দেখা দিয়েছিল, সেই বিভ্রান্তি থেকেও আন্দোলনকে রক্ষা করে কমিউনিস্ট পার্টি এটাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে সাহায্য করেছে।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের বাঙালি জনগণের পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক ও জাতীয় দমননীতির বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক জাতীয় প্রতিবাদ। বাংলাদেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণ পাকিস্তানের

দাবিতে সক্রিয় হয়েছিলেন, বিশেষভাবে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত ও ছাত্রসমাজ। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত ও ছাত্রসমাজ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন উপলব্ধি করল—পাকিস্তান সরকার ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বাঙালিদের প্রতিটি ন্যায্য অধিকার পদদলিত করতে বদ্ধপরিকর, তখন থেকে তারা ক্রমে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতির ফলে গরিব ও মেহনতি জনগণও ক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। এভাবে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্তসহ ব্যাপক জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছিল। এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে।

সেদিন ’৫২-এর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় জাগরণ ও আন্দোলনের সূচনা হয় তাই ক্রমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৫০ সাল থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি এ দেশের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবির ওপর জোর দিয়ে এসেছে। পার্টি নেতৃত্ব এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এই দাবি এ দেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। কাজেই পার্টি এই আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়া তার কর্তব্য মনে করেছে। মুসলিম লীগ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমি স্বার্থের প্রতিভু, গণস্বার্থবিরোধী। কমিউনিস্টরা জনগণের অধিকারের দাবিতে সংগ্রাম করে। সেজন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার প্রথমেই আক্রমণ করেছে কমিউনিস্টদের। তাঁদের ওপর নির্মম দমননীতি চালিয়েছে। প্রতিক্রিয়ার ধরনই এই। কমিউনিস্টরা যেহেতু জনগণের অধিকারের দাবিতে একনিষ্ঠ সংগ্রামী, সেজন্য কমিউনিস্টদেরই প্রথম আক্রমণের শিকার হতে হয়। এটাই দুনিয়ার অভিজ্ঞতা। মুসলিম লীগ এর ব্যতিক্রম করেনি।

কমিউনিস্টদের ওপর যখন ব্যাপক দমননীতি চালানো হয়, তখনো এদেশে অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির তেমন বিকাশ হয়নি। এরপর ক্রমে অন্য গণতান্ত্রিক শক্তি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৫২-এর পর এদিক থেকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়ই মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের বিরুদ্ধে সব গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের জন্য সচেষ্ট ছিল। কারণ এটাই ছিল শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের একমাত্র পথ। ভাষা আন্দোলনের সময়েও পার্টি এ ব্যাপারে প্রথম থেকে সচেতন ছিল। এ দেশে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির ভিত স্থাপিত হয়েছিল এ দেশের মানুষের, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের দাবি নিয়ে, আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে। পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্ট পার্টি এ দেশের জাতীয় বিকাশ ও মেহনতি মানুষের অধিকারকে অগ্রাধিকার

দিয়ে আন্দোলন করেছে। আর এভাবেই সকল দেশপ্রেমিক মহলের কাছে সাচ্চা দেশপ্রেমিক দল হিসেবে পার্টি স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা দমননীতি চালিয়ে, বিদ্বেষ ও বিভেদ ছড়িয়ে পার্টিকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এটাই এ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস।

শাসকচক্র অবশ্য প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে ও অন্যায়ভাবে বারবারই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ সরকার এই চেষ্টা চালিয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগও এই পথ অনুসরণ করেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। দমননীতির মধ্যেও পার্টি শুধু টিকেই থাকেনি, ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

কমিউনিস্টদের নীতি ও আদর্শ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কমিউনিস্টরা প্রকৃত দেশপ্রেমিক। কমিউনিস্ট কর্মীরা সৎ ও ত্যাগী। সেজন্যই প্রতিক্রিয়াশীলরা কোনো সময়ই তাঁদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বা পার্টিকে নির্মূল করতে পারেনি।

জনগণের সঙ্গে একাত্মতাই কমিউনিস্টদের শক্তি। আর জনগণের শক্তির নিকট প্রতিক্রিয়ার পরাজয় অবধারিত।

■

এই গ্রন্থ রচনাকালে যেসব গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে :

১. বাংলাদেশের কৃষকের আন্দোলন—সত্যেন সেন

২. ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ—জ্ঞান চক্রবর্তী

৩. পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি—বদরুদ্দীন উমর

৪. যে সংগ্রামের শেষ নেই—প্রমথ গুপ্ত

৫. নানকার বিদ্রোহ—অজয় ভট্টাচার্য

জীবন-সংগ্রাম

দ্বিতীয় খণ্ড

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের
শহীদদের উদ্দেশে

ভূমিকা

মণি সিংহ শুধু একটি নাম নয়, একটি ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের। এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে শুধু সম্পৃক্ত নয়, ওতপ্রোতভাবে জড়িত নাম।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দেশ বিভাগ হয়েছে। বিপুল জনপ্রিয়তা মুসলিম লীগের। ব্যাপক জনগণ তখন পাকিস্তানের মাঝেই মুক্তি—এই চিন্তায় আন্দোলিত। এই সুযোগে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সারা দেশের ওপর নিজেদের একনায়কত্ববাদী শাসন চাপিয়ে দিতে তৎপর। আর তারই সূত্র ধরে পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া থেকেই কমিউনিস্টদের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়গ।

মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক চরিত্র কমিউনিস্টরা উপলব্ধি করেছিল প্রথম থেকেই। আর সেজন্যেই তাঁরা একেবারে গোড়া থেকেই তাঁদের কার্যক্রমে জোর দিয়েছিল গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার ও প্রসারে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের গোড়ার দিকে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কতদূর ব্যাপক ও গভীর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া তখন মুসলিম লীগ যে তত্ত্বটি নিয়ে আসতে চেষ্টা করে তা হলো—মুসলিম লীগের বিরোধিতার অর্থ রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আর এই পটভূমিতে ১৯৪৭ সালেই কমিউনিস্টদের উদ্যোগে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক যুব লীগ ও সিভিল লিবার্টিজ লীগ (Civil Liberties League)। অসাম্প্রদায়িক ও বহু দলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত। আর সে কারণেই কমিউনিস্টদের এই প্রাথমিক প্রয়াস। প্রথমোক্ত উদ্যোগে মুসলিম লীগের বহু গণতন্ত্রমনা নেতা-কর্মী শরিক ছিলেন। তাঁরাই পরবর্তীকালে উদ্যোগী হয়েছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের কাজেও।

১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে বামপন্থী বিচ্যুতির অধ্যায় থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্টরা যখন পুনরায় কাজে নামলেন, ততদিনে এদেশে গণতন্ত্রের অনুষঙ্গরূপে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সামনে এসে গেছে। ভাষার বিষয়টি তো ১৯৪৯ সালেই সামনে এসেছে তীব্রভাবে। কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নের সাথে শুধু সম্পৃক্তই ছিলেন না, উদ্যোগীও ছিলেন সে ব্যাপারে। ১৯৫০ সালে 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে' তাঁদের ভূমিকাই তার প্রমাণ।

এর পরবর্তীকালে একেবারে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিকশিত করা ও গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার প্রসারের কাজকে তৎকালীন অবস্থার মুখ্য কাজ বলে মনে করার নীতি থেকে কমিউনিস্টরা বিচ্যুত হননি কোনোদিন।

সেদিন কঠিন নির্যাতনের মাঝে কাজ করতে হতো কমিউনিস্টদের। পার্টি ছিল বে-আইনি। এছাড়াও ছিল নানা ঐতিহাসিক কারণে ব্যাপক জনগণের মাঝে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সন্দেহ-অবিশ্বাস। আর সে কারণেই কমিউনিস্টরা অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে—কোনো সময় আওয়ামী মুসলিম লীগ, কোনো সময় আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, আবার পরবর্তীকালে ন্যাপ-এর মাধ্যমে কাজ করার নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে ব্যাপক জনগণের মাঝে কমিউনিস্টদের কাজের কোনো প্রচার সম্ভব ছিল না। তাঁরা যে কাজ করছেন তা জানারও উপায় ছিল না অন্যদের। তবু সব জেনেশুনেই কাজের পূর্বোল্লিখিত কৌশল গ্রহণ করেছিলেন।

আর পাকিস্তানের শাসনাধীনে যাবার পুরো সময়টা জুড়ে কমিউনিস্টদের পুরোধা ছিলেন মণি সিংহ। বস্তুত সেদিন যে নীতি কমিউনিস্টরা অনুসরণ করেছেন তার অন্যতম মুখ্য রূপকার ছিলেন মণি সিংহ।

অথচ মণি সিংহ ও অন্যান্য মুষ্টিমেয় কমিউনিস্ট যখন পাকিস্তানে কাজ শুরু করেন তখন যে অসুবিধাসমূহের মুখোমুখি হয়ে কাজ করতে হয়েছে তা অচিন্ত্যনীয়। সরকারি নির্যাতন তো ছিলই। তার ওপর ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরূপতা। ১৯৫০ সালের পর ব্যাপক সংখ্যক সংখ্যালঘু জনগণের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আগত কমিউনিস্টরাও দেশত্যাগ করেন। নিরাপদ আশ্রয় থেকে শুরু করে সবকিছুই তখন সমস্যা। সে অবস্থায় জনগণের ওপর অবিচল বিশ্বাসই সেদিন তাঁদের টিকিয়ে রেখেছিল। পুরনো বন্ধু-বান্ধব যাঁরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের অনেকেই তখন দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মণি সিংহরা শোনেননি সে কথা। আর তার ফল তাঁরা পেয়েছেন বৈকি! ক্রমে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের। পাকিস্তানের সেই অবস্থা থেকে জাতি হিসেবে অন্তত এক ধাপ অগ্রগতি তো সম্ভব হয়েছে।

আর সে কারণেই আমি মনে করি মণি সিংহের নাম এ দেশের বাঙালির জাতিসত্তার বিকাশের অধ্যায়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ইতিহাস থেকে তাঁকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

অন্য পরিচয়ও আছে মণি সিংহের। টংক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং ও অন্য কৃষকদের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের সাথে তাঁর নাম যুক্ত। তাঁর নাম যুক্ত এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে। কিন্তু তার চাইতেও তাঁর

বড় পরিচয়, পাকিস্তান শাসনামলে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও তার মধ্য দিয়ে জাতীয়তার বিকাশের ধারার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত তাঁর নাম। তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন যে ভূমিকা পালন করেছে, সেদিন তা শুধু যে কমিউনিস্ট পার্টিকেই শক্তিশালী করেছে, মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে তাই নয়, সামগ্রিক জাতীয় বিকাশে রেখেছে ইতিবাচক অবদান। সেই অধ্যায়ের কিছু খণ্ড তথ্য এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার, বর্তমান গ্রন্থে যে কালপর্বের কথা বিবৃত হয়েছে তার বড় অংশ জুড়ে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ-বঞ্চিত ছিলেন মণি সিংহ। আরেকটি অংশ কেটেছে কারান্তরালে।

'জীবন-সংগ্রাম'-এর এই খণ্ডটি যখন লেখা শুরু করেন, তখন রোগ তাঁকে আক্রমণ করেছে। তার ওপর সহ্য করতে হয়েছে স্ত্রী অণিমা সিংহের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর শোক ও শূন্যতার ধকল। সব মিলিয়ে যে যত্ন নিয়ে, যে পরিমার্জনার সাথে প্রথম খণ্ড তিনি লিখতে পেরেছিলেন, সেরূপ যত্ন ও অভিনিবেশ নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড তিনি চূড়ান্ত করতে পারেননি। প্রাথমিক খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরির পর তথ্য যাচাই, সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ, যা তিনি প্রথম খণ্ড রচনা শেষে করেছিলেন, এবার অসুস্থতার কারণে করতে অপারগ ছিলেন। তবু ইতিহাস হিসেবে এই খণ্ডের মূল্য আশা করি সচেতন পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন। আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যে এই খণ্ডটিও একটি মূল্যবান সংযোজন বলে বিবেচিত হবে বলে মনে করি। পাণ্ডুলিপির ভাষা ও শৈলীগত সম্পাদনা করেছেন আখতার হুসেন।

মণি সিংহের জীবন নিরন্তর অভিযাত্রারই আলেখ্য। দেশের গণতন্ত্র ও সমাজপ্রগতির সৈনিকরা আজকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেখানে নতুন অভিযাত্রার তাগিদ আমার বিবেচনায় আরো বেশি। আর সেক্ষেত্রে অতীত ঐতিহ্য চলার পথে নানাভাবে আলোকপাত করে তা সুগম করে তুলবে নিঃসন্দেহে। 'জীবন-সংগ্রাম'-এর এই খণ্ডটির তাৎপর্য সেখানেই। মণি সিংহের নিরন্তর অভিযাত্রারই আরেকটি প্রকাশ 'জীবন-সংগ্রাম'-এর দ্বিতীয় খণ্ড।

অজয় রায়

ঢাকা, ২৯.১২.১৯৯১

১৯৪৮ সালের একটি ঘটনা

১৯৪৮ সালের জুন মাসে খাদ্য পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতি হওয়ার ফলে বরিশাল শহরে স্থানীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। ওই মিছিলের নেতৃত্ব দেন মনোরমা বসু (মাসীমা), স্বদেশ বসু, গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ। এঁরা সবাই ছিলেন বরিশাল জেলা পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী-সদস্য। মিছিলটি বরিশালের কালেক্টরেট বিল্ডিং-এ গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘেরাও করে। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বেধে যায় বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান সেফ্‌টি অর্ডিন্যান্স' (East Pakistan Safety Ordinance) বলে গ্রেপ্তার করে মনোরমা বসু, স্বদেশ বসু ও গোলাম কিবরিয়াসহ কয়েকজনকে। গ্রেপ্তার করার আগে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হলে পুলিশের লোকজন এক পর্যায়ে বন্দুকের বাঁট দিয়ে স্বদেশ বসুসহ অনেককেই আঘাত করে আহত করে।

নেতৃবৃন্দের এই গ্রেপ্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি কৌতুককর, সেই সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দমনমূলক চরিত্র প্রকাশক যে ঘটনাটি ঘটে, তারও উল্লেখ করতে হয়। ঘটনাটি ছিল এই রকমের। যে 'পূর্ব পাকিস্তান সেফটি অর্ডিন্যান্স' বলে মনোরমা বসু ও গোলাম কিবরিয়াসহ অন্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই অর্ডিন্যান্সটির মেয়াদ তাঁদের গ্রেপ্তার করার আগেই শেষ হয়ে যায়। ফলে তাঁদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই বে-আইনি হয়ে পড়ে। পুলিশ পড়ে যায় বিপাকে। তাই গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দকে প্রথমে জামিন দিয়ে ছেড়ে দেয়, আবার তা বাতিল করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সটিকে Retrospective effect দিয়ে পুনরায় বলবৎ বা জারি করা হয়।

এদিকে বন্দীরা তাঁদের গ্রেপ্তারের বৈধতার বিরুদ্ধে মামলা করলে কোর্ট তাঁদের ছেড়ে দেয়। এভাবে নেতৃবৃন্দের ছাড়া পাওয়া ও পুলিশের তরফ থেকে এক আইন ছেড়ে অন্য আইনে তাঁদের গ্রেপ্তার করা উপর্যুপরি চলতে থাকে। এই ঘটনা তখনকার রাজনৈতিক মহলে বেশ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। আলোড়নও সৃষ্টি করেছিল সমভাবে।

দৈনিক ‘আজাদ’-এ প্রকাশিত একটি বিবরণ

[১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯]

“জানা গিয়াছে যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মোমেনশাহী জেলার আসাম পূর্ববঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকাবাসী হাজং ও অধিবাসীগণ লাঠি, তীর, বর্শা ও রামদা লইয়া লেঙ্গুরাস্থিত পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। হাজংদের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব আছে বলিয়া প্রকাশ। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পুলিশদের আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশ পাল্টা আক্রমণ ও গুলি চালাইলে সকলে হটিয়া যায়। গুলিবর্ষণের ফলে ১০ জন হাজং নিহত ও আরো কয়েকজন আহত হইয়াছে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ প্রেরণ করা হয় এবং অবস্থা আয়ত্তাধীন আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।”

“পুলিশ হাজংদের কয়েকটি গ্রামে হানা দিয়া ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং বহু তীর-ধনুক ও বর্শা উদ্ধার করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, হাজংরা কিছুকাল যাবৎ সরকারের টংক ও কর সংগ্রহ পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। টংক ব্যবস্থা অনুসারে নগদ টাকার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ জমিদারকে দিতে হয়। প্রকাশ যে, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঘটনার পূর্বে উক্ত এলাকার সীমান্ত বাহিনীর একজন সৈন্য নিহত হয়।”

১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ

১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারি প্রথার সৃষ্টি হয়। অবশ্য এর আগে থেকেই কিছু জমিদারের অস্তিত্ব পূর্ববঙ্গে ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার এবং কৃষকশ্রেণির মধ্যে অসংখ্য মধ্যস্বত্ব ভোগীর সৃষ্টি হয়।

পূর্ববাংলায় ৭৬ শতাংশ জমি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায়। এর মধ্যে পুরোপুরি কর্ষণযোগ্য অথচ পতিত জমির পরিমাণ ছিল ২.২৩ কোটি একর (বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন ছিল ৩.৫২ কোটি একর)। এর মধ্যে চাষের উপযোগী জমি ছিল না বললেই চলে। পক্ষান্তরে চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ জমিতে ধান চাষ হলেই আমাদের খাদ্য ঘাটতি পূরণ হয়ে যাওয়ার মতো

ফসল ঘরে উঠতে পারত। অথচ এটা না হওয়ার ফলে আমাদের মোট প্রয়োজনের ১০ শতাংশ পর্যন্ত খাদ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। কারণ একর প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কম। আউস, আমন, বোরো ও ইরি—এই চারটি ফসলের মধ্যে প্রধান আমন চাষের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা এবং এর উৎপাদনের ক্ষেত্রে তীব্র ওঠা-নামা খুবই প্রকট। উৎপন্ন খাদ্যশস্যের তিন-চতুর্থাংশ উৎপাদনের স্তরে ভোগের প্রয়োজন পূরণ করে বাজারে কেনা-বেচার প্রক্রিয়ার ভেতরে আসে না।

অন্যদিকে, সেই ইংরেজ আমল থেকেই Subsistence Economy-তে ধরে ভাঙন, সেই সঙ্গে ঘটে মুদ্রা ও পণ্য-অর্থনীতির বিকাশ ও বিস্তৃতি। এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া কৃষি সংক্রান্ত সম্পর্ককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কিছুটা অগ্রগতি ও পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি মূলত পশ্চাৎপদ।

উল্লেখ্য, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ আমল থেকেই আন্দোলন করে এসেছে। শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি তাঁর নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির তরফ থেকে তুললেও তাঁর মন্ত্রিত্বের আমলে সেটা কার্যকর করার জন্য কোনোরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দেশ ভাগাভাগির পর (১৯৪৭) অর্থাৎ নুরুল আমিনের মন্ত্রিত্বের সময়ই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তবে আপনাআপনি ব্যাপারটা ঘটেনি। এরও পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল, ছিল বিভিন্নমুখী আন্দোলন ও সংগ্রামের অবদান। এসব আন্দোলন সংগ্রামের ভেতরে প্রধানতম ছিল ’৪৭ সালের দেশ ভাগের আগে ও অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা ও যশোর প্রভৃতি অঞ্চলে সংঘটিত তে-ভাগার লড়াই, ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চলে সংঘটিত টংক প্রথার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম, শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলায় সংঘটিত নানকার প্রথার বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন ইত্যাদি। এসব আন্দোলনের তীব্রতাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা যুগ প্রাচীন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্নটি অতীব জরুরি করে তোলে।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সময় আইনসম্মতভাবে দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮.৪২ কোটি টাকা। জমিরদারদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য স্বত্বের অর্থের পরিমাণ ছিল ২.২৫ কেটি টাকা। সরকারের খরচের হিসাব ছিল ১.২৪ কোটি টাকা। কিন্তু পরবর্তীকালে (আইয়ুব শাসনামলের অন্তিমে) অর্থাৎ ১৯৭০ সালে এই পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৮.৫ কোটি টাকা। জমিদারি হুকুম দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাকা হওয়ার পর শোষণের মাত্রা কী পরিমাণ বেড়ে যায়, উপরে উল্লিখিত উপাত্ত থেকে সেটা সহজেই বোঝা যায়।

১৯৫০ সালে প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ববঙ্গের যাবতীয় জমিদারি হুকুম দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করা হয়। এই আইনের প্রধান বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. খাজনা-ভোগী সব জমিদারি ও মধ্যস্বত্ব অধিকারের অবসান ও সরকার কর্তৃক এ জাতীয় সব জমির দখল গ্রহণ;

২. সরাসরি সরকারের অধীনে সকল প্রজাকে জমির প্রকৃত দখল প্রদান;

৩. ভবিষ্যতে জমিতে কোনো রকমের উপস্বত্বের সৃষ্টি কিংবা পত্তন দেওয়া বা খাজনার বন্দোবস্ত দেওয়া নিষিদ্ধকরণ; এবং

৪. জোত-জমির সর্বোচ্চ সীমা ৩৩ একর নির্ধারণ;

ওই আইনে এ কথাও বলা হয় যে, সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত জমি সরকার দখল নিয়ে ভূমিহীন গরিব চাষিদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করবেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই আইনের কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। কিন্তু পাশাপাশি একথাও স্বীকার্য, এই আইন পূর্ববাংলার প্রাক-ধনতান্ত্রিক কৃষি কাঠামোর মূলে কোনো রকম আঘাত হানতে পারেনি কিংবা ঘটায়নি কোনো রকম মূলগত পরিবর্তন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের জের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবেই তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার সুযোগ লাভ করে।

উল্লেখ্য, ক্ষতিপূরণ দিয়েই এই জমিদারি নেওয়া হয়। তবে এই ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ কোটি টাকা। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এই ক্ষতিপূরণের টাকা ৪৫ বছরের অধিক সময় ধরে দেওয়া হবে, কিস্তির পর কিস্তিতে।

এদিকে এই আইনের বলে টংক ও নানকার প্রথা সারা বাংলাদেশ থেকে তুলে দেওয়া হলেও, ভাগচাষ প্রথার ক্ষেত্রে কোনো রকম সংস্কার করা হয় না। কারণ, হিন্দু ও মুসলমান জোতদারদের মধ্যে মুসলমান জোতদারের সংখ্যা এবং তাদের জমির পরিমাণও ছিল বেশি। আর এই মুসলমান জোতদাররাই ছিলেন মুসলিম লীগের শক্ত খুঁটিস্বরূপ। কাজেই এদের স্বার্থে কোনো রকম আঘাত হানার ব্যবস্থা মুসলিম লীগ সরকার ওই আইনে রাখেনি।

অন্যদিকে জমিদারদের মধ্যে হিন্দু জমিদারের সংখ্যা ছিল বেশি এবং বড় বড় জমিদারের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ভাগচাষ প্রথার উচ্ছেদ না হওয়ার ফলে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষসমূহ আমাদের দেশে আগের মতোই অস্তিত্বমান থেকে যায়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের পর ভাগ চাষি পায় তিন ভাগ আর মালিক পায় মাত্র এক ভাগ ফসল। এছাড়া গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো মহাজনি ঋণ আমাদের দেশের কৃষক সমাজকে নিদারুণভাবে শোষণ করে থাকে। উপরোক্ত দুই প্রথাই মূলত সামন্ততান্ত্রিক। এই দুই প্রথার অবসান না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

সারা-ভারত ছাত্র ফেডারেশনের শাখা হিসেবে বিভাগ-পূর্ব পূর্ববাংলায় ছাত্র ফেডারেশনের একটি শক্তিশালী শাখা ছিল। এটা ছিল সেইকালে অবিভক্ত বাংলার এই অংশে অন্যতম মুখ্য অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগাভাগির ফলে বহু ছাত্র, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সঙ্গে দেশের মাটি ছেড়ে ভারতে চলে যায়। এর মূলে প্রধান যে কারণটি কাজ করেছিল, তা হলো সাম্প্রদায়িকতা এবং এই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্ট জীবনের নিরাপত্তাহীনতা। এছাড়াও ছিল প্রচণ্ড দমননীতি। এর ফলে, ছাত্র ফেডারেশন দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা, সেই সময় এই ছাত্র সংগঠনটির নেতা, কর্মী ও সাধারণ সদস্যদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে যে জাগরণের সৃষ্টি হয়, তার ফলে নতুন একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার বিষয়টি পার্টি তার বিবেচনায় আনে। এবং এই বিবেচনা থেকে পার্টির তরফ থেকে শহীদুল্লা কায়সারকে ছাত্র সংগঠনটি গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরে পূর্ব পাকিস্তান তখন ছিল একটি প্রদেশ মাত্র। নতুন ছাত্র সংগঠনটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৫০ ছাত্র প্রতিনিধি ঢাকায় আসেন। ঢাকা শহরের ছাত্র সমাজের তরফ থেকেও বেশ কিছু প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। এই ছাত্র সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার পর 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখে জন্ম হয় অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'-এর। প্রথমে এটি গঠিত হয় আহ্বায়ক কমিটি রূপে। এই আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মুহম্মদ সুলতান ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সাবেক এমপি, আওয়ামী লীগ) পরে ১৯৫৩-৫৪ সালের দিকে ছাত্র ইউনিয়ন পূর্ণ সাংগঠনিক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অচিরকালেই (অল্পদিনের মধ্যেই) এটি একটি শক্তিশালী সংগ্রামী ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন ছিল ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রতিনিধিত্বশীল ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন এবং চরিত্রের দিক থেকেও ছিল

প্রগতিশীল। আবদুস সাত্তার (নোয়াখালী), আব্দুল মতিন (পরে ভাষাসৈনিক) ও অন্যরা ছিলেন এর সভ্য।

এই সময় অন্য আর যে কটি ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল, সেগুলো হয় ছিল অঞ্চলভিত্তিক, না হয় দক্ষিপন্থী।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন '৫৪-এর নির্বাচনী প্রচার-অভিযানে, '৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে এবং '৬৯-এর আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান ও পরিশেষে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গৌরবময় সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। এই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা ছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এককালের ছাত্র ইউনিয়নের এইসব নেতা বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকেই তাঁরা প্রমাণ করে চলেছেন তাঁদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা। এসব কৃতী নেতার মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ ফরহাদ, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, মতিয়া চৌধুরী, আব্দুল মতিন, কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননসহ আরো অনেকে। বর্তমানে এঁদের অনেকেরই রাজনৈতিক মত ও পথ বিভিন্নমুখী হলেও, এককালে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাঠামোর পাঠশালাতেই।

গণতন্ত্রী দল [১৯৫৩]

১৯৪৮ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রাথমিক স্ফুরণ ঘটলেও দেশজুড়ে তখনো প্রবল সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিরাজমান। প্রকাশ্যে 'কমিউনিস্ট' পরিচয়ে কাজ করা তখন রীতিমতো একটি কঠিন ব্যাপার। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হলেও, তার নামের অগ্রভাগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি তখনো বাদ দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে কাজ করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আমাদের চারপাশের চেনা-পরিচিত প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার কিছু মানুষ, আমাদের পার্টি সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি এবং সাম্প্রদায়িক ভাবধারামুক্ত উদার ব্যক্তিবর্গকে সংগঠিত করে গঠন করা হয় গণতন্ত্রী দল। এই দল গঠনের মূলে আমাদের চিন্তা-ভাবনার ধরনটি ছিল এ রকমের : দেশে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটানো না গেলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না কাঙ্ক্ষিত প্রগতির পথে।

এ লক্ষ্য থেকেই ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে গঠিত হয় গণতন্ত্রী দল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দল তেমন কোনো কাজ করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার ওই পরিবেশে এর অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল ভাবধারা ও নীতি-আদর্শের মূল্যকে খাটো করে দেখার অবকাশ ছিল না।

স্বল্পায়ু এই গণতন্ত্রী দলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন হাজি মোহাম্মদ দানেশ এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী। সহ-সভাপতি ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ, এডভোকেট আব্দুল জব্বার (খুলনা), আলতাব আলী (ময়মনসিংহ) এবং সদস্য ছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ (পরবর্তীকালে বাকশাল সভাপতি), আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নিহত হন), দেবেন দাশ (খুলনা), আতাউর রহমান (রাজশাহী), এডভোকেট আব্দুল্লাহ (সিলেট), গোলাম কাদের চৌধুরী (ঢাকা), বিজয় চ্যাটার্জী (ঢাকা), মাওলানা সাইফুদ্দিন খালেক (নোয়াখালী), খাজা আহমদ (ফেনী), ফেরদৌস আহমদ (খুলনা), আবদুল গফুর (সাতক্ষীরা), দেওয়ান মাহবুব আলী (কুমিল্লা), আজিজুল হক (রংপুর), গোলাম রহমান (দিনাজপুর) এবং আশু ভরদ্বাজ (ফরিদপুর)।

গণতন্ত্রী দলের নেতা-সদস্যবৃন্দ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন। কেউ প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিরও অনুসারী হয়েছিলেন, কিন্তু সেইকালে তাদের স্বল্পকালীন কর্মতৎপরতা আমাদের পার্টির নীতি-আদর্শের প্রচার ও প্রসারে যে ভূমিকা রেখেছিল, সে ভূমিকাই এ দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভ্রুণের সৃষ্টি করেছিল।

’৫৪-র নির্বাচন

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে, এই ঘোষণা দেওয়া হলো। পিওসি এই ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমরা, কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে কাজ করবার চেষ্টা করব এবং আমাদের এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য চালাব সংগ্রাম। আমাদের পার্টিকে তখনো আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা না হলেও, প্রকাশ্যে কাজ করার পথে নানাবিধ অসুবিধা যে ছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া, তখন এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয় যে, নির্বাচনে আমরা যথাসাধ্য অংশগ্রহণও করব।

আমাদের পিওসি’র অন্যতম সদস্য মীর্জা সামাদ তখন প্রকাশ্যে ছিলেন। তাঁর ওপর প্রকাশ্যে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। এ সময় মতিন (বগুড়া)

এবং নুরুন্নবী (রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশের গুলিতে যিনি আহত হয়েছিলেন এবং যাঁর একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছিল) জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ঝুঁকি নিয়ে পার্টির কাজকর্ম পরিচালনা করার দায়িত্বভার তুলে নিলেন নিজেদের কাঁধে। এ প্রসঙ্গে আলী আকসাদের কথাও উল্লেখ করতে হয়। তিনি প্রকাশ্যে কাজ করার ব্যাপারে আগে থেকেই রাজি ছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে মতিন ও নুরুন্নবী যোগ দিলে প্রকাশ্যে পার্টির কাজকর্ম পরিচালনা করার পথ কিছুটা প্রশস্ত হয়। এই ঘটনার মুখে পার্টি আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ঢাকায় পার্টির একটি প্রকাশ্য অফিস খুলতে হবে। বিভিন্ন জেলায়ও স্ব পরিচয়ে কমপক্ষে একজন করে কমিউনিস্ট কাজে নামবেন এবং সম্ভব হলে তাঁরা পার্টির অফিসও খুলে বসবেন। আর এই লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৫৩ সালে ঢাকার বংশাল রোডে পার্টির একটি অফিস খোলা হয়। অফিসের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগসহ সেইকালের বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলিম লীগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে বংশাল রোডে আমাদের পার্টি অফিস রাখা গেল না। অচিরকালেই (অল্পদিনের মধ্যেই) সেই অফিস স্থানান্তরিত করা হলো নারিন্দায়। যাই হোক, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই আমরা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জোর আওয়াজ তুলি এবং এই লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে থাকি।

মীর্জা সামাদ যেহেতু তখনকার বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের কাছে বেশ পরিচিত ছিলেন, তাই আমরা তাঁকেই শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে এ ব্যাপারে দূতিয়ালি করার দায়িত্ব অর্পণ করি। যুক্তফ্রন্ট গঠন সংক্রান্ত আমাদের পার্টির মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি তিনিই পৌঁছে দেন আমাদের হয়ে ওইসব নেতার কাছে।

ফজলুল হক সাহেব তখন পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল। নুরুল আমিন তাঁকে ওই পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে আগস্ট মাস পর্যন্ত ওই পদে থাকার পর তিনি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করার পর তিনি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে, আবারও তাঁর সাবেক কৃষক প্রজা পার্টি পুনর্গঠনের ব্যাপারে সচেষ্ট হন। কেননা, ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার ফলে ওই সংগঠনের কোনো অস্তিত্ব বা কাজকর্ম ছিল না বললেই চলে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর কৃষক প্রজা পার্টি উঠিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর দলের নাম রাখেন 'কৃষক শ্রমিক পার্টি'। এই পার্টি গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে।

এদিকে আওয়ামী লীগই তখন প্রদেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের এক সম্মেলনে

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাব অধিবেশনে খুবই উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। এই সময় যুব লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি প্রগতিশীল যুব-ছাত্র সংগঠনের এ উদ্যোগেও যুক্তফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে সাড়ম্বরে মিছিল, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এভাবে প্রচার প্রপাগাণ্ডা ও মিছিল সমাবেশের পরিণতিতে ১৯৫৩ সালেরই শেষভাগে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট।

যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল ২১টি দফা। এসব দফায় সন্নিবেশিত ছিল প্রধানত নিম্নলিখিত দাবিগুলো : পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, নিরাপত্তা আইনের বিলোপ সাধন, বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দান, শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের অধিকার প্রদান ও তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে দর কষাকষির সুযোগ সৃষ্টি, পাট সম্পর্কে বাস্তব নীতি গ্রহণ এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আমাদের উপরোক্ত দাবি-দাওয়া পূর্ব পাকিস্তানের সেই সময়কার পরিস্থিতিতে খুবই ন্যায়সঙ্গত এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের অধিকারী ছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিসহ এসব দাবি আমাদের পার্টি প্রথম উত্থাপনকারী হওয়া সত্ত্বেও, আমাদেরকে যুক্তফ্রন্টে শামিল করা হয় না সংকীর্ণ নানা কিসিমের 'কমিউনিস্ট ভীতির' কারণে। অথচ ফজলুল হক সাহেব নেজামে ইসলামের মতো ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল দলকে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলে পরিণত করতে দ্বিধা করেননি। এ রকম পরিস্থিতিতে আমরা হতাশ না হয়ে ঘোষণা করি যে, এই নির্বাচনে আমাদের দলীয় প্রার্থীরা যে কয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, সেগুলোর বাইরের আর সব কয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন দিয়ে যাব।

আমাদের এই রকম সিদ্ধান্তের মূলে যে প্রধান লক্ষ্যটি কাজ করেছিল, তা ছিল এই যে, আমাদের পার্টি যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত না হতে পারলেও, মুসলিম লীগ বিরোধী ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগকে পরাজিত করাই হবে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক বিজয়। কেননা, এতে করে একটা সাম্প্রদায়িক, চরম প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারী ও সংকীর্ণ ধর্মান্ধ সরকারের শুধু যে পরিবর্তন ও পতনই হবে তাই নয়, মুসলিম লীগের পতন পূর্ববাংলার রাজনীতিতে বয়ে নিয়ে আসবে এক গুণগত ও যুগান্তকারী পরিবর্তন। আর সে পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রদায়িকতার স্থান গ্রহণ করবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও চেতনা, গড়ে উঠবে শ্রেণি ও গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার মতো একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ। এছাড়া এ চিন্তাও আমাদের ছিল যে, বাঙালি জনগোষ্ঠী যেহেতু পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশ, সেহেতু পূর্ববাংলায়

মুসলিম লীগের পতনের বিষয়টি সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিতেও ফেলবে অনিবার্য প্রভাব। তাই, আমরা দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করা, তার কর্মসূচিকে জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করা, সর্বোপরি, যুক্তফ্রন্টকে অটুট রাখা এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের সর্বাত্মক সমর্থন করার বিষয়টিকে অকৃত্রিম দায়িত্ব হিসেবেই গ্রহণ করি।

'৫৪-এর ওই নির্বাচন সার্বজনীন ভোটেই অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, এক লোক এক ভোট। কিন্তু এই নির্বাচনী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কিছু অনিবার্য সীমাবদ্ধতা ছিল। আর এই সীমাবদ্ধতার মূলে ছিল নির্বাচনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র। কেননা মুসলমান ভোটাররা মুসলমান প্রার্থীদের এবং হিন্দু ভোটাররা হিন্দু প্রার্থীদের ভোট দেবে—এমন বিধান ওই নির্বাচনী ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করা হয়েছিল। যাই হোক, আমরা এসব সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এবং সর্বমোট আটটি সিটে আমাদের প্রার্থী দাঁড় করাই। এর মধ্যে ছিল তিনটি মুসলমান এবং পাঁচটি হিন্দু সিট।

'৫৪-এর নির্বাচনী আন্দোলনের তিন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

যাই হোক, চারটি প্রধান রাজনৈতিক দল, যথাক্রমে—আওয়ামী মুসলিম লীগ, কেএসপি, গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলামকে নিয়ে ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলো। কিন্তু মাঝে-মধ্যে এর শরিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ এমন পর্যায়ে পৌঁছাত যে, মনে হতো, এই বুঝি ভেঙে গেল যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু মুসলিম লীগ ছিল যুক্তফ্রন্টের সব শরিক দলেরই শত্রু। কাজেই মুসলিম লীগের তৎপরতার কারণেই শেষতক টিকে যায় এই রাজনৈতিক প্লাটফর্মটি। এ কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত হবে যে, এই নির্বাচনী অভিযানকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্টকে সক্রিয় ও টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিচক্ষণ কর্মদক্ষতা বিশেষভাবে কাজ করেছিল।

'৫৪-এর নির্বাচন ছিল সত্যিই এক স্মরণীয় রাজনৈতিক ঘটনা। স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের ওপর জনসাধারণ এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে, নির্বাচনী অভিযান শুরু হওয়া মাত্র যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সূচিত হয় এক ব্যাপক গণজাগরণ। প্রদেশের (বাংলাদেশ সে সময় পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতো) সর্বস্তরের মানুষ যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আর এরই পরিণতিতে নির্বাচনে মুসলিম লীগের অভাবিত ভরাডুবি হয়। নির্বাচনের আগে আমরা স্লোগান তুলেছিলাম, যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা যাবে, কিন্তু যে রাজনৈতিক দলটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

করেছে, সে যে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করবে, এটা আমাদের অনুমানের বাইরে ছিল। মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে মোট ৩০৯টির মধ্যে পেয়েছিল মাত্র ৯টি আসন। বাদবাকি আসনে জয়ী হয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট ও তার বাইরের ফ্রন্ট সমর্থক প্রার্থীরা।

আমাদের পার্টির মনোনীত তিনজন মুসলিম প্রার্থী ছিলেন যথাক্রমে কুমিল্লায় ইয়াকুব মিয়া, কিশোরগঞ্জে জমিয়ত আলী এবং যশোরে আব্দুল হক। আব্দুল হকের সিটে যুক্তফ্রন্ট কোনো প্রার্থী দাঁড় করায়নি, এ ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর বিশেষ বিবেচনা প্রসূত ব্যক্তিগত ভূমিকা ছিল। কেননা, তিনি জানতেন, ওই সিটে কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রার্থী দাঁড় করাবে। কিন্তু ফজলুল হক সাহেব নিজে আশীর্বাদ দিয়ে যশোহরের ওই আসনে একজন প্রার্থী দাঁড় করান। এতেও কিছু হতো না। কিন্তু নির্বাচন তারিখের কদিন আগে থেকে আমাদের কর্মী-নেতাদের ওপর নেমে আসে ব্যাপক নির্যাতন। গ্রেপ্তার করে পাঠানো হয় তাঁদের জেলে। ফলে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আব্দুল হক মাত্র কয়েকশ ভোটের ব্যবধানে বরণ করেন পরাজয়। তখন তিনি জেলে। অন্য দুটি মুসলিম সিটেও আমরা জয়লাভ করতে পারিনি। তবে পাঁচটি হিন্দু সিটের মধ্যে আমরা চারটিতে জয়লাভ করি। একটি মাত্র সিটে হেরে যাই। যে সিটগুলোতে আমরা জয়লাভ করেছিলাম, সেগুলো ছিল—সিলেট : বরুণ রায়, চট্টগ্রাম : পূর্ণেন্দু দস্তিদার (তিনি ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়ি পথ দিয়ে ভারতে যাবার সময় মারা যান), চট্টগ্রাম : সুধাংশু দত্ত এবং রংপুর : অভয় বর্মণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও এ কথা সত্যি যে, পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিজয়ে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী প্রমাদ গোনে। এই বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য কায়েমি স্বার্থবাদীরা চক্রান্তের পর চক্রান্তে লিপ্ত হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে জব্দ করা বা শিক্ষা দেবার নানা মতলব আর ফন্দি ফিকির করতে থাকে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সে সময়ে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের উচ্চারিত ধৃষ্টতামূলক মন্তব্যের ভেতর দিয়ে। রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথ বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো রকম পরিবর্তন ঘটাবে না।"

এদিকে হক সাহেব যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতৃপদে আসীন থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর তাকে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের জন্য আহ্বান জানান। ১৯৫৪-এর ২ এপ্রিল তারিখে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভায় হক সাহেব অন্য দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হলেও শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে

প্রথম দিকে রাজি ছিলেন না। শেখ মুজিবকে অবশ্য পরে ওই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। আর সেটা হলো, পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ও এখানকার অবাঙালি মিল মালিকদের ভীতি। কেননা, এরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকেই মুসলিম লীগ সরকারকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সর্বতোভাবে চেষ্টা-চরিত্র চালিয়ে এসেছে। এমন কি ব্যয় করেছে প্রচুর অর্থকড়ি। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিজয়ে তাদের সেই প্রচেষ্টা ভেস্তে যাবার যোগাড় হয়।

এই রকম পরিস্থিতিতে ফজলুল হক সাহেব কলকাতা যান। সেখানে গিয়ে তিনি দুটি সমাবেশে আবেগময় বক্তৃতা দেন। এই সভা দুটিকে এবং তাতে প্রদত্ত ফজলুল হকের বক্তৃতাকে পাকিস্তান সরকার 'দেশদ্রোহিতার শামিল' বলে অভিহিত করেন। ওই বক্তৃতা দুটির সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো :

৩ মে ১৯৫৪ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ

"আজ আমাকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। আশা করি 'ভারত' কথাটি ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি এর দ্বারা পাকিস্তান ও ভারত উভয়কে বুঝিয়েছি। এই বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ বলে আমি মনে করতে চেষ্টা করব। আমি ভারতের সেবা করব।"

৪ মে ১৯৫৪ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ

"দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা একটা স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র। করুণাময় খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করব এই ব্যবধান দূর করার জন্য।"

আসলে 'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় উপরে উল্লিখিত হক সাহেবের ভাষণ দুটিকে বিকৃত ও উদ্দেশ্যেমূলকভাবে পরিবেশন করা হয়। ফজলুল হক সাহেব পরে মার্কিন ওই পত্রিকায় প্রকাশিত তার বক্তৃতা-ভাষ্যের বিকৃত পরিবেশন ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা হক সাহেবের ওই প্রতিবাদের প্রতি কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ বা কর্ণপাত করার

প্রয়োজন অনুভব করেনি। লীগ সরকার তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতাকে 'দেশদ্রোহী' ও 'ভারতের দালাল' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করতে থাকে এবং ১৯৫৪ সালের ৩০ মে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে। অবশ্য যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার অজুহাত হিসেবে প্রতিক্রিয়াশীলরা আরো একটি পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আর সেটা হলো দাঙ্গা। এই দাঙ্গা হিন্দু, মুসলমানের ছিল না। ছিল মুসলমান মুসলমানে। বাঙালি ও অবাঙালি অর্থাৎ বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকের মধ্যে। এই দাঙ্গা সংঘটিত হয় আদমজী জুট মিলে, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী পেপার মিলে। এসব দাঙ্গার সবগুলোই ছিল ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বাধানো। প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত ও ভূলুণ্ঠিত—এই ধুয়া তোলা হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার অজুহাত সৃষ্টি করার জন্য এবং বাস্তবে তাই করা হয়। জারি করা হয় ৯২ (ক) ধারা। এই ধারা বলে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পোরা হয় জেলে। ফজলুল হককে করা হয় গৃহবন্দী।

অবশ্য সরকারের এই অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয় সব থেকে বেশি কমিউনিস্ট পার্টি। আর তারই পরিণতিতে ১৯৫৪ সালের ৪ জুলাই আমাদের পার্টিকে আইনত নিষিদ্ধ করা হয় (এর আগে অবশ্য পার্টির ওপর সরকারের নির্যাতন চললেও তাকে বে-আইনি করা হয়নি)।

এসব ঘটনার আগে অবশ্য আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি ছিল এ রকমের : গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনকে বরখাস্ত করেন। এই বরখাস্তের মূলে তাঁর বক্তব্য ছিল : পাকিস্তানজুড়ে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভা। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, যিনি আমেরিকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তাঁকে পাকিস্তানে তলব করে এনে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হলো। মোহাম্মদ আলী না ছিলেন পার্লামেন্টের সভ্য, না ছিলেন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি বা দলের নেতা। অথচ অগণতান্ত্রিকভাবে তাঁকেই করা হলো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য, গোলাম মোহাম্মদ বা নাজিমউদ্দীনও আইনসঙ্গতভাবে তাঁদের স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না।

যাই হোক, মোহাম্মদ আলী পরে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হয়েছিলেন আগেই। কিন্তু কেউ তাঁর এসব পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করেননি। কারণ এসব ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল আমলাতন্ত্র ও পাঞ্জাবিদের হাতে। কাজেই গোলাম মোহাম্মদের এ জাতীয় স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের কেউই টু শব্দটি পর্যন্ত করল না।

ফজলুর রহমান তখন পূর্ব পাকিস্তানের গণপরিষদের একজন সভ্য। নাজিমউদ্দীনের বরখাস্তের পর থেকে গোলাম মোহাম্মদকে কাবু করার জন্য তিনি যারপরনাই তৎপর ছিলেন। মুসলিম লীগ তখন গণপরিষদের মধ্যে প্রধানতম রাজনৈতিক দল। সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তিবলে তিনি গোলাম মোহাম্মদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য গণপরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। এই সময় 'ভারত অ্যাক্ট-১৯৩৫' মতে চালু ছিল পাকিস্তানের যাবতীয় শাসন ব্যবস্থা। ওই অ্যাক্টের ধারা সংশোধন করে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় ১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে। অবশ্য এই ঘটনার ভেতর দিয়ে রাজনৈতিকভাবে সাময়িক একটা বিজয় সূচিত হলেও, এই বিল পাশ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সার্বভৌম গণপরিষদ বাতিল করে দেন। ঘোষণা করা হয়, "পাকিস্তানে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানে এই গণপরিষদ ব্যর্থ। সে জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছে, তাই এর কাজ করার আর কোনো রকম অধিকার নেই।"

অবশ্য এ কথাও এখানে স্বীকার্য, ১৯৪৭ সাল থেকেই এই গণপরিষদ কোনো সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। মুসলিম লীগের যারা সভ্য ছিলেন, তারা নির্বাচনে তাদের জয়লাভের ব্যাপারে ছিলেন শঙ্কিত। পক্ষান্তরে ভারত ১৯৫২ সালে তার সংবিধান প্রণয়ন করে এরই মধ্যে সম্পন্ন করেছে নির্বাচন। এই অবস্থায় পাকিস্তানের জন্যও সংবিধান প্রণয়ন করা ছিল অতীব জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙে দেওয়ার মতো অপরাধ করলেও পাকিস্তানে সেইকালে কেউ-ই সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেননি, যদিও ওই পরিষদ জনস্বার্থে কোনো কাজই করেনি। অথচ কী চরম পরিহাসের বিষয়, সেই গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় এলে ফজলুল হক ও আতাউর রহমান সাহেব কে কার আগে তাঁকে মালা দিয়ে বরণ করবেন, সেই প্রতিযোগিতার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটে। এই রকম অবস্থায় গণপরিষদের স্পিকার তমিজউদ্দিন সাহেব সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা দায়ের করে বসেন। সুপ্রিম কোর্ট থেকে এই রায় দেওয়া হয় যে, গণপরিষদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের আছে, কিন্তু পুনরায় গণপরিষদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আগেই বলেছি, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১৯৫৪ সালে বাতিল করার পর পরই জারি করা হয় ৯২ (ক) ধারা এবং এই ধারা বলে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর সীমাহীন নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হতে থাকে। এই অবস্থায় ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠানো হয়। এই সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য চলে যান সুইজারল্যান্ডে।

গোলাম মোহাম্মদ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে এয়ারপোর্ট থেকে গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। মোহাম্মদ আলীকে গোলাম মোহাম্মদের

প্রয়োজন ছিল এ কারণে যে, তিনি বাঙালি। এ ছাড়া তাঁর নিযুক্তিতে আন্তর্জাতিক পরিসরেও প্রতিক্রিয়া কম হবে। গোলাম মোহাম্মদের পেছনে সমর্থন ছিল সৈন্য বিভাগ, আমলাতন্ত্র ও শিল্পপতিদের। সীমান্ত প্রদেশের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর খুব একটা অসুবিধা ছিল না, কেননা, ডা. খান সাহেব ছিলেন ইস্কান্দার মির্জার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর এখন প্রয়োজন শুধু পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থন। গোলাম মোহাম্মদ মাহমুদুল হক ওসমানীকে ঢাকা পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন। কেননা, ওসমানী ও গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন একই পীরের মুরিদ। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থন আদায় করাই ছিল তার লক্ষ্য। ওসমানী ঢাকায় এসে আতাউর রহমান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, গোলাম মোহাম্মদকে সমর্থন করা না হলে সামরিক বাহিনীর হাতে তিনি শাসন ভার তুলে দেবেন। আতাউর রহমান খান তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থনের কথা তখনই জানিয়ে দেন ওসমানীকে। এর পরেই তিনি চলে যান জুরিখে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য। জুরিখে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন সুস্থ হবার পথে। সব কিছু শুনে তিনি মনস্থির করতে পারেন না। কেবল বলেন, দেশে ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে তিনি তাঁর মত ঠিক করবেন।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পপতিরা হাসান ইস্পাহানির নেতৃত্বে গোলাম মোহাম্মদকে জানান যে, আওয়ামী লীগকে যেন মন্ত্রিসভায় নেওয়া না হয়। পাশাপাশি জেনারেল আইয়ুব খান ও ইস্কান্দার মির্জাও সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য ইঙ্গিত দেন। এই সঙ্গে গোলাম মোহাম্মদ আতাউর রহমানের কাছে এই মর্মে খবর পাঠান যে, সোহরাওয়ার্দীকে অচিরেই প্রধানমন্ত্রী করা হবে, তবে আপাতত সাধারণ একজন মন্ত্রী হিসেবেই তাঁকে থাকতে হবে। আবার বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ঢাকায় এসে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, তাঁরা কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতা পাবেন যদি তিনি 'আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বশীল দল বা সংগঠন নয়'—এ মর্মে স্থির থাকেন বা বিবৃতি দেন। গোলাম মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে আর মোহাম্মদ আলী ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। কিন্তু কী অবাক ব্যাপার, যে ফজলুল হক সাহেবকে জঘন্যভাবে এই সেদিন 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়িতে এবং অন্যায়ভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তাঁর মন্ত্রিপরিষদ, সেই তিনি এত সহজে ভুলে গেলেন সব কথা এবং রাজি হয়ে গেলেন ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে।

মাওলানা ভাসানী তখন লন্ডনে। দেশের মাটি থেকে তাঁর অনুপস্থিতির এ সময়টাতেই জারি করা হয় ৯২ (ক) ধারা। ইস্কান্দার মির্জা এই সময় ঘোষণা করেছিলেন যে, ভাসানী দেশে ফিরে এলে তাঁকে গুলি করে মারা হবে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব দেশে ফিরে এলেন। করাচি বিমানবন্দরে তাঁকে দেওয়া হলো বিপুল সংবর্ধনা। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় তিনি আইনমন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন শপথ। ওই মন্ত্রিসভায় একজন সাধারণ মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করায় পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর খুবই বিরূপ সমালোচনা হয়। মোহাম্মদ আলীর ওই মন্ত্রিসভায় আইয়ুব খান হন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আইনমন্ত্রী হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী রচনা করেন পাকিস্তানের সংবিধান। চালু করা হয় এক ইউনিট।

এদিকে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে সমঝোতা হয় পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর। ফলে নেতৃত্বের চরিত্রের ক্ষেত্রে এক গুরুতর রদবদলের কারণ ঘটে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হন। গোলাম মোহাম্মদকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এরপর ইস্কান্দার মির্জা হলেন গভর্নর জেনারেল এবং আবু হোসেন সরকার হন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী।

এই রকম উত্থান-পতনময় জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিতে থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। ১৯৫৩ সালে ম্যানিলাতে স্বাক্ষরিত হয় পাক–মার্কিন সামরিক চুক্তি। ১৯৫৪ সালে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ এলাকা বা দেশগুলোকে মুক্ত রাখার পরিকল্পনা থেকে ‘মিডল ইস্ট ডিফেন্স প্যাক্ট’ (Middle East Defence Pact) নামে একটি চুক্তি সম্পাদনের মনস্থ করে। এই চুক্তির সংক্ষিপ্ত নাম ছিল ‘মেডা’। কিন্তু প্রবল বাধা বা আপত্তির মুখে ওই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বাস্তবরূপ লাভ করতে পারেনি। তবে এর পরপরই কতগুলো গণবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে পাকিস্তান সিয়াটোতে যোগ দেয় ১৯৫৪ এবং বাগদাদ চুক্তি অর্থাৎ সেন্টোতে যোগ দেয় ১৯৫৫ সালে। এসব চুক্তির প্রত্যেকটিই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের গভীর স্বার্থ-সহায়ক। সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগত ও তল্পিবাহক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সহজেই এসব চুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ ১৯৫৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী এসব প্যাক্টের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান।

১৯৫৫ সাল

১৯৫৫ সালে গোলাম মোহাম্মদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার পর বগুড়ার মোহাম্মদ আলীও প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ থেকে বাদ পড়লেন। এই অবস্থায় গভর্নর জেনারেল হয়ে বসলেন ইস্কান্দার মির্জা এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন পাঞ্জাবের

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে ইস্কান্দার মির্জা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই তিনি স্বাভাবিক নিয়মে মেতে উঠলেন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হয় এবং তা চালু করা হয় ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে। এই সংবিধানে এমন একটি ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছিল, যার ফলে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান দুটি ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট হিসেবে পরিগণিত হলো। উর্দু ও বাংলাকে আইনত গ্রাহ্য করা হলো পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারটি সেখানে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে।

১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসের দিকে আমাদের কাছে এ মর্মে খবর পাঠালেন যে, আমি এখন মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং কমিউনিস্টদের এখন আর গোপনে থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই। আপনাদের সবার নামে যেসব ওয়ারেন্ট জারি করা আছে, আমি সেসব অচিরেই উঠিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। কাজেই যাঁরা গোপনে আছেন, তাঁরা শিগগিরই প্রকাশ্যে চলে আসুন। যতদূর মনে করতে পারি, আমাদের প্রতি আবু হোসেনের আবেদনের মর্ম ও ভাষা প্রায় এ রকমেরই ছিল।

এই সংবাদ ও আবেদন আসার পরপরই আমরা পিওসির মিটিং ডাকি। যথারীতি সে মিটিং বসে। মিটিং-এ দুই ধারার অভিমত প্রকাশিত হয়। একটি মত ছিল এ রকমের যে, আমাদের বিরুদ্ধে জারি করা ওয়ারেন্ট যখন উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তখন আমাদের প্রকাশ্যে কাজের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। না হলে আমরা নাশকতামূলক বা ধ্বংসাত্মক কাজ-কর্মে লিপ্ত বলে সরকার এতদিন যা প্রচার করে এসেছে, আমরা তার অনিবার্য শিকার হব এবং সাধারণ মানুষও আমাদের ভুল বোঝার অবকাশ পাবে। প্রকাশ্যে এসে আমাদের এখন প্রমাণ করা উচিত, অহেতুক সন্দেহ ও ভীতি থেকে আমাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলেই জনসাধারণের দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার স্বার্থেই আমরা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হই। এখন যাবতীয় ওয়ারেন্ট তুলে নেবার এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রকাশ্যে আসতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে, আমরা নাশকতামূলক কাজকর্মের ধারে কাছেও নেই, ছিলাম না কখনোই।

ওই মিটিং-এ দ্বিতীয় যে বিশ্লেষণমূলক চিন্তাটি বেরিয়ে আসে, তা হলো এই যে, মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন ব্যক্তিগতভাবে ভালো মানুষ হলেও, তিনি বা তাঁর সরকার সর্বশক্তিমান বা যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী নন। তিনি আমাদের ওয়ারেন্ট তুলে নিয়েছেন সত্য, কিন্তু কেন্দ্রে এখনো একটি প্রতিক্রিয়াশীল সরকার অধিষ্ঠিত। তারা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জারিকৃত

যাবতীয় পরোয়ানা বাতিল করার বিষয়ে স্বভাবতই খুশি হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের প্রকাশ্যে কাজ করা সঠিক হবে না। তাহলে আমাদের নিশ্চিত গ্রেপ্তারি বরণ করতে হবে। ফলে পার্টি পরিচালনার লোক থাকবে না। আমাদের অশেষ ক্ষতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুই মতের দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলল। অবশেষে পিওসির অধিকাংশের ভোটে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, আমরা প্রকাশ্যে আসব। তবে কেন্দ্র যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল সরকার অধিষ্ঠিত, সেহেতু আমাদের খুবই হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ্য কাজের পক্ষে ছিলাম। খোকা রায় ছিলেন এর বিরুদ্ধে।

এই রকম সিদ্ধান্তের পর আমাদের পার্টির নেতৃস্থানীয় সব কমরেড আত্মগোপন অবস্থা থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলেন। কমরেডদের বাসস্থান হিসেবে সিদ্দিক বাজারে আমরা একটা বাসা ভাড়া নিলাম। জেল থেকে নিরাপত্তা-বন্দীরাও মুক্ত হয়ে এলেন। জেলায় জেলায় যাঁরা আত্মগোপনে ছিলেন, তাঁরাও এলেন প্রকাশ্যে। ঢাকা জেল থেকে আমাদের যেসব কমরেড মুক্ত হয়ে এলেন, তাঁরাও এসে উঠলেন সিদ্দিক বাজারে অবিস্থত আমাদের ওই 'ডেন' বা 'শেল্টার'-এ।

কিন্তু কমিউনিস্টদের ব্যাপারে আবু হোসেন সরকারের এত যে আশ্বাস ও অভয়বাণী, সেটা একটা ফাঁপা ব্যাপার, অচিরেই তার আলামত দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের সিদ্দিক বাজারের বাসার দুটি বাসা পরেই ১০ থেকে ১২ জন আইবি ওয়াচার আমাদের ২৪ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে রাখত। আমরা যেখানেই যেতাম, তারা ফেউয়ের মতো আমাদের পেছনে পেছনে যেত। সাইকেল চেপে গেলে, তারাও আমাদের অনুসরণ করত সাইকেল যোগেই।

আমরা প্রকাশ্যে এসেই শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী সাহেব, শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ইত্তেফাক, সংবাদ ও অবজারভার অফিসে যাই। আমরা সাক্ষাৎ করি মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের সঙ্গেও। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে আমি বলি, আমার নামে যেসব ধারা বলে বিভিন্ন মামলা আছে, সেগুলো তুলে নিতে। তিনি এ ব্যাপারে তার অপারগতার কথা জানালেন। তখন বুঝতে পারা গেল যে, ব্যাপারটা সুবিধাজনক নয়। ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চলে সংগ্রামের সময় আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল বিভিন্ন ধারা বলে কয়েকটি মামলা।

জেল থেকে মুক্ত ও আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা উপলক্ষে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল গণতন্ত্রী দল।

এরপর একটি সংবাদ সম্মেলনও আমরা করি। সেই সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কৌশল ব্যাখ্যা করে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। সেই বিবৃতি ছাপাও হয়েছিল কয়েকটি পত্র-পত্রিকায়। পাকিস্তানের জন্মের পর পার্টির এটাই ছিল প্রথম সংবাদ সম্মেলন।

অবশ্য ওই সংবাদ সম্মেলনে, তখনকার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে আমরা নিজেদেরকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য বলে উল্লেখ না করে, কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী, এভাবে আমাদের পরিচিতিসহ বক্তব্য পেশ করেছিলাম।

এ সময়ই একদিন বিকেলে খন্দকার হামিদ সাহেবের বাসায় আমরা কয়েকজন মিলে বেড়াতে গেলাম। আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যেই। হামিদ সাহেব একজন এমএনএ এবং আবু হোসেন সরকার সাহেবের সঙ্গে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি আমাদের দেখেই ঠাট্টার সুরে বললেন, "আপনারা খুব ওস্তাদ লোক তো! বের হতে না হতেই পুলিশ ধর্মঘট করিয়ে ফেললেন! আসলে এই পুলিশ ধর্মঘটের কথা আমরা আগে থেকে জানতাম না। তাঁর মুখ থেকে ঘটনাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রমাদ গুণলাম (এই পুলিশ ধর্মঘটের তারিখ ছিল ১৯৫৫ সালের ২১ নভেম্বর)। আমরা উঠে চলে আসছি, খন্দকার সাহেব বললেন, চা খেয়ে যান। আমি বললাম, আজ না, অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব।

আমরা বিলম্ব না করে প্রায় তখনই চলে এলাম আমাদের সেই সিদ্দিক বাজারের বাসায়। এখানে নেতৃস্থানীয় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সমবেত করে বসে গেলাম বৈঠকে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বৈঠকে আমি বললাম, পুলিশের ধর্মঘট আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতিরই পরিচায়ক। পুলিশের লোকজন নিজেদের বাঁচা-মরার দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেছে, অথচ কমিউনিস্টদের এর পেছনে হাত রয়েছে বলে সরকার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গোপন অবস্থা থেকে সদ্য প্রকাশ্যে আসা কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা প্রকট। কাজেই তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে কিংবা তাঁদের গোপনে চলে যাওয়া প্রয়োজন। আমার বক্তব্যে সবাই সম্মতি জানালেন।

তবে আমাদের এমনটাও মনে হয়েছিল, পার্টির যেসব নেতা-কর্মী সদ্য জেল থেকে বের হয়ে এসেছেন, সরকার সম্ভবত তাঁদের গ্রেপ্তার করবে না। তাই ওই সভায় অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, আমরা যাঁরা আত্মগোপন অবস্থা থেকে প্রকাশ্যে এসেছিলাম, তাঁরা আবার গোপন অবস্থায় চলে যাব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কথা হলো, আমরা খুব ভোরবেলা ঢাকার গেণ্ডারিয়ার এক বাসায় চলে যাব। পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেড কমনীয় দাশগুপ্ত সেখানে এসে আমাদের খবর দেবেন, এরপর আমরা কোথায় যাব। কিন্তু ভোরবেলা গেণ্ডারিয়ার ওই বাসায় উপস্থিত

হলেও, বেলা আটটা পর্যন্ত কেউই আমাদের খবর দিতে এলেন না। বলা বাহুল্য, গেণ্ডারিয়ার এ বাসাটি আমাদের জন্য মোটেই নিরাপদ ছিল না। কারণ প্রকাশ্য কাজ করেন, এই বাসা ছিল এমন কয়েকজন কমরেডের শেল্টার। সালাম ভাই থাকতেন গেণ্ডারিয়ার ওই বাসাটির কাছাকাছি এক বাসায়। তিনি আমাদের উপস্থিত অসুবিধার কথা শুনে দ্রুত তার বাসায় চলে যাবার জন্য খবর পাঠালেন। তার বাসাটি নিরাপদ ছিল। আমরা বিলম্ব না করে তাঁর বাসায় গিয়ে উঠলাম।

এদিকে আমরা গোপনে যাবার সিদ্ধান্ত নেবার পর ঢাকার সদরঘাট এলাকার যে বাসায় ঢাকা জেলা কমিটির সেক্রেটারি জ্ঞান চক্রবর্তী থাকতেন, সেখানেও আমাদের সিদ্ধান্ত অবহিত করে তাঁকে এই বলে খবর পাঠালাম, তাঁরাও যেন সাবধানে থাকেন। অনিল মুখার্জী তখন ঢাকার বাইরে ছিলেন।

সন্ধ্যার দিকে আমাদের আশ্রয় নেওয়া নতুন বাসায় এসে উপস্থিত হলেন রমজান নামের একজন পার্টি কর্মী। আমাদের খোঁজ-খবর নিতেই তাঁর এই আগমন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম, ধর-পাকড় হয়েছে। তবে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাতে পারলেন না।

খোকা রায় ছিলেন তখন বরিশালে। তিনি সেখানকার জেলা কমিটির এক সভায় যোগ দিতে সেখানে গিয়েছিলেন। মিটিংরত অবস্থায় পুলিশ এসে চড়াও হয় সভাস্থলে। কিন্তু খোকা রায়ের নাম গ্রেপ্তারি তালিকায় না থাকায় তিনি পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান। কিন্তু ওই সভায় উপস্থিত আর সবাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

প্রদেশব্যাপী শুরু হয়ে যায় ব্যাপক ধর-পাকড়। প্রায় সবাই গ্রেপ্তার হয়ে যান। তবে সিলেটের চিত্ত দাশ অল্পের জন্য গ্রেপ্তার এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী গোপনে না যাওয়ার ফলে গ্রেপ্তার হয়ে যান। এই ব্যাপক ধরপাকড়ের ঘটনা ঘটে ১৯৫৫ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে। অনিল মুখার্জী গ্রাম থেকে ফিরে সোজা চলে যান সদরঘাটের সেই বাসায়, যেখানে জ্ঞান চক্রবর্তী থাকতেন। কিন্তু এসেই দেখেন, বাসা তালাবদ্ধ। তিনিও এসব ধর-পাকড়ের ঘটনা সম্পর্কে তখন পর্যন্ত কিছুই জানতেন না।

যা হোক, অবশেষে নানা প্রচেষ্টার ফলে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে এসে ওঠেন এবং এইভাবে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন।

এদিকে আরেকটি ঘটনা ঘটে। মীর্জা সামাদ পরদিন সকালে সিদ্দিক বাজারস্থ আমাদের পুরনো বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সেই বাসা পরিত্যক্ত, তালাবদ্ধ। তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান থেকে সটকে পড়েন। এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই তিনি আমাদের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে বলেন, কিছু পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর

দ্বারা আর কিছু করা সম্ভব হবে না। "আমি আর পারলাম না"—মীর্জা সামাদের পদত্যাগপত্রে ব্যক্ত উচ্চারণটি, আমার যতদূর মনে পড়ে, এই রকমই ছিল।

মীর্জা সামাদের পদত্যাগপত্র নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করি এবং সেই আলাপ-আলোচনা শেষে গ্রহণ করা হয় তাঁর পদত্যাগপত্র। পারিবারিক কোনো ব্যক্তিগত কারণে একজন উজ্জ্বল উদ্যোগী ও কর্মিষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতার পার্টিগত জীবনের সমাপ্তি ঘটে একদিন এভাবেই।

আমরা, কমিউনিস্টরা মাত্র এক মাসের মতো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলাম। "পুলিশ ধর্মঘটের নেপথ্যে আমাদের উসকানি রয়েছে"—এই অজুহাতে ব্যাপক ধর-পাকড়ের মুখে আবার আমাদের আত্মগোপনে চলে যেতে হলো। আবু হোসেন সরকার জেল থেকে যাঁদের মুক্তি দিয়েছিলেন, আবার তিনি তাঁদেরকেই পাঠালেন জেলের বদ্ধ কুঠুরিতে।

এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো 'এক ইউনিট'-এর জোর আওয়াজ। পাঞ্জাবের মিয়া মমতাজ দৌলতানা ছিলেন এই 'এক ইউনিট' তত্ত্বের মূল প্রবক্তা। এই তত্ত্বের সার কথা ছিল, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাব সমন্বয়ে গঠিত হবে একটি ইউনিট আর পূর্ব পাকিস্তান হবে আরেকটি ইউনিট। এর ফলে সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হবে না। বেলুচিস্তান তো আরো দূরের ব্যাপার।

আমরা এই এক ইউনিটের প্রবল বিরোধিতা করি। কেননা এই 'এক ইউনিট' তত্ত্বের অর্থ ছিল, পাকিস্তানের ছোট ছোট প্রদেশকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। যেহেতু পাঞ্জাব পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ, তাই এই 'এক ইউনিট'-এর মাধ্যমে তাদের অবস্থা হয়ে উঠল পোয়াবারো। তাদের হুকুমদারির মুখে ছোট প্রদেশগুলোর দাবি-দাওয়া পদদলিত হওয়ার অবস্থারই সৃষ্টি করল। তাই আমরা কমিউনিস্টরা এই গণবিরোধী 'এক ইউনিট' প্রথা বা বিধানের বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রতিবাদ-বাক্য উচ্চারণ করতে পিছপা হইনি।

সংখ্যা সাম্য নীতি

সংখ্যা সাম্য নীতি অনুসারে এ রকম সিদ্ধান্ত হয় যে, গণপরিষদে পৃথক দুটি ইউনিটের সভ্য সংখ্যা সমান হবে অর্থাৎ প্রতি ইউনিটে ৪০ জন করে সভ্য থাকবেন। তাছাড়া সরকরি চাকরি-বাকরি, সামরিক ক্ষেত্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র কার্যকর হবে এই সংখ্যা-সাম্য অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সমান সমান

সুযোগ-সুবিধা। এ ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের মধ্যে লিখিত আকারে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু কার্যত একমাত্র গণপরিষদ ছাড়া আর কোথাও সংখ্যা সাম্য নীতি কার্যকর হয়নি। কেননা, সমর ব্যবস্থা, সরকারি চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধানের কোনো সুরাহা হয় না এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নানাভাবে আরো অধিকহারে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। তাই আমাদের পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি কোনোদিন সংখ্যা সাম্য নীতিকে সমর্থন করেনি।

১৯৫৫ সালের আরো কিছু কথা

১৯৫৫ সালের জুন মাস। আবার গণপরিষদের নির্বাচন। এই নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের নির্বাচনে যাঁরা সভ্য হয়েছিলেন, তাঁদেরই ভোটে নির্বাচিত করতে হবে এবার পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ জন গণপরিষদ সদস্যকে। এই নির্বাচনে মোট গণপরিষদ সদস্যের সংখ্যা ছিল ৮০।

পার্টি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু প্রার্থী কে হবেন, এ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে স্থির হয়, সরদার ফজলুল করিমকেই আমরা আমাদের পার্টি প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী-কৃতী ছাত্র সরদার ফজলুল করিম তখন জেলে। বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর পরিচিতি তখন বেশ উজ্জ্বল। ঢাকা জেলা কমিটির সভ্য এবং সৎ চরিত্রের অধিকারী সরদার জেলে বসেই পরিষদ-সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু গণপরিষদের ভেতরে তাঁর পরিচালিত কর্মকাণ্ডে আমরা সবসময় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। গণপরিষদের কার্যকালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিপরিষদ গণবিরোধী 'সেফটি অ্যাক্ট' বহাল রাখার জন্য ভোট দিয়ে পাশ করিয়ে নেয়। সরদার ফজলুল করিমও তার পক্ষে ভোট দেন। আমরা ওই 'সেফ্‌টি অ্যাক্ট;-এর ঘোরতম বিরোধী ছিলাম। যাই হোক, সরদার ফজলুল করিম পরবর্তীকালে পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর সংস্রব রক্ষার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করায়, তাঁকে সসম্মানে পার্টি সভ্যপদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা [১৯৫৫–৫৬]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ফজলুল হক সাহেবের সমর্থন অর্জনের জন্য আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব পাকিস্তান অ্যাসেমব্লির মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। অথচ আইন পরিষদে আবু হোসেন সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করার জন্য নিযুক্ত করেন এক বিরাট সংখ্যক মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ইত্যাদি। সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আবু হোসেন সরকার তাঁর ১৪ মাসের শাসনামলে কোনোদিন অ্যাসেমব্লির সভা পর্যন্ত ডাকেননি। এমন কি বাজেট সেশন পর্যন্ত করেননি। তাঁর গৃহীত সব পদক্ষেপ বা ব্যবস্থাই ছিল অগণতান্ত্রিক। এর ফলে তাঁর সরকার হারিয়ে ফেলেছিল গণসমর্থন। দেখা দিয়েছিল প্রদেশব্যাপী নানা অরাজক অবস্থা, বিশেষত তীব্র খাদ্য সংকট।

এই সময় আবু হোসেন সরকার এমন এক চরম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে বসেন, যা ছিল সত্যিকারভাবেই নজিরবিহীন। তিনি সরকারি চালের মজুদ থেকে ১০ টাকা মণ দর সংবলিত পারমিট বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। এ পারমিট বিক্রি করা হয় তাঁর পরিষদ সদস্যদের কাছে। কথা হয়, ওই সব পরিষদ সদস্য সরকারি মজুদ থেকে পারমিট মারফত ওই দরে চাল নিয়ে পরে তা তিনগুণ দরেও বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়া তাঁর মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে প্রচুর লাইসেন্সও বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, সরকারি পারমিট মারফত সস্তা দরে চাল ক্রয় করে পরে তা তিন-চার গুণ দরে বিক্রি করে এই সময় অনেকেই রাতারাতি বিত্তবান হয়ে উঠলেও, তাতে করে খাদ্য সংকটের মোটেও সুরাহা হয় না। এ অবস্থায় ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকা নগরীতে নিরন্ন মানুষের এক ভুখ মিছিল বের হয়। পুলিশ মিছিলকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে একজন কৃষক নিহত (মতান্তরে কয়েকজন) এবং বেশ কয়েক ব্যক্তি আহত হন। ফলে ঢাকা নগরীসহ প্রদেশের সর্বত্র আবু হোসেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এমন বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল যে, তার মন্ত্রিসভাকে ১৯৫৬ সালের ৩১ আগস্ট পদত্যাগে বাধ্য হতে হয়েছিল।

এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ফজলুল হক সাহেব কোনো রকম উপায়ান্তর না দেখে নানা টালবাহানা শেষে বিরোধী দলীয় আওয়ামী লীগের নেতা আতাউর রহমানকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। ১৯৫৬ সালের

৬ সেপ্টেম্বরে গঠিত হয় আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, কংগ্রেস ও তপসিলী ফেডারেশনকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন ইস্কান্দার মির্জা। সে রাতেই গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সঙ্গে করে ঢাকা ত্যাগ করেন।

ওই বছরেরই ১১ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দীকে সারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। পরের দিনই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই সময় গণপরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগের সদস্য ছিল মাত্র ১৩ জন। এর আগে অবশ্য ইস্কান্দার মির্জার ইঙ্গিতে গঠিত হয়েছিল রিপাবলিকান পার্টি। মন্ত্রিসভায় রিপাবলিকানদের সভ্য ছিল ২৭ জন।

আমরা এই সময় সরদার ফজলুল করিমকে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে সাধারণভাবে সমর্থন দেওয়ার কথা বলেছিলাম। আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যরা কেন্দ্রে সবসময় পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-দাওয়া ও অধিকারাদি আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা ছাড়া আর সব ক্ষমতা প্রদেশকে দিতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আওয়ামী লীগ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'সেফ্‌টি অ্যাক্ট'-এর অধীনে বিনাবিচারে রাজনৈতিক বন্দীদের যতদিন খুশি আটক রাখার ব্যবস্থা ছিল। তাই স্বাভাবিক কারণেই, এই অ্যাক্টটি ছিল গণবিরোধী। আমরা এর বিরুদ্ধে থাকলেও, আমাদের পার্টি সভ্য সরদার ফজলুল করিম ওই গণবিরোধী অ্যাক্টের প্রতি সমর্থন জানালে, আমাদের সঙ্গে তাঁর যে বিরোধের সূচনা হয়, সে কথা আমি আগেই বলেছি।

আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা

আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, কংগ্রেস ও তপসিলী ফেডারেশন সমবায়ে (সমন্বয়ে) আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর বার্মা (মিয়ানমার), থাইল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া থেকে চাল ও গম আমদানি করে খাদ্য সংকটের তীব্রতা থেকে দেশকে রক্ষা করা হয়। দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা তিরোহিত হয়। তাছাড়া, এই মন্ত্রিসভা সব রাজবন্দীকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের 'সেফ্‌টি অ্যাক্ট'ও তুলে নেয়। তাদের তরফ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, আর কাউকে বিনাবিচারে আটক রাখা হবে না। কিন্তু এই মন্ত্রিসভা যৌক্তিকতা ও

সাহসের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ওই গণবিরোধী 'সেফটি অ্যাক্ট' তুলে দিলে তাদের ওই শুভ উদ্যোগ অন্তহীনতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। কেননা, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ওই সেফটি অ্যাক্ট বলবৎ রাখার ব্যাপারে সমর্থন দিয়ে তা পাশ করিয়ে নিতে দ্বিধা করেনি।

আসলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র নামেই ছিল। তবুও ক্ষমতা হাতে পেয়েই আওয়ামী লীগ মন্ত্রিপরিষদ পূর্ব পাকিস্তানে বিল ও বাজেট পাশ করার ব্যবস্থা করে। যেসব এলাকায় আইন পরিষদ সদস্য ছিলেন না, সেইসব এলাকা বা আসনে তারা উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। এর আগে মুসলিম লীগ সরকার তাদের শাসনামলে এ জাতীয় শূন্য আসন পূরণ করার কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। এ ব্যাপারে তাদের ছিল প্রচণ্ড ভীতি। কেননা, ১৯৪৯ সালে তারা একবার ওই জাতীয় নির্বাচন করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছিল। আর সেই পরাজয়ের ভীতি থেকেই আবু হোসেন সরকার দীর্ঘদিন কোনো রকম উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। যা হোক, আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবার উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, তারা সাতটির মধ্যে ছয়টি আসনে জয়লাভ করে।

আওয়ামী লীগ এই সময় কেন্দ্রের কাছে স্বায়ত্তশাসনসহ অন্যান্য দাবি উত্থাপন করলেও তার শাসনামলেই একটি চাঞ্চল্যকর ধরপাকড়ের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা ঘটায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ, বিশেষত সামরিক বাহিনী। কেন্দ্রে এরই মধ্যে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছিল। এর নাম ছিল 'প্রিভেনশান অব স্মাগলিং অর্ডিন্যান্স' এবং এই অর্ডিন্যান্সটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।

এই সময় কেন্দ্রীয় সামরিক সংস্থা পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশের একজন সুপারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দেশ প্রেরণ করে গ্রেপ্তার করে আমাদের পার্টি কমরেড শহীদুল্লা কায়সার, আলী আকসাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী ও আলতাব আলীকে (ময়মনসিংহ)। এই গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জায়গায়। কিন্তু মজার বিষয়, বিনাবিচারে কাউকে আটক করা সংক্রান্ত যাবতীয় আইন বা বিধান পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাতিল করা সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। ওই চারজন কমরেডের গ্রেপ্তারির ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

আতাউর রহমান তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি নিজেও আগে থেকে এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। তাই তিনিও বলেন, আমি হোম মিনিস্টার অথচ আমিই কিনা এ ঘটনা সম্পর্ক কিছুই জানি না। তিনি এই গ্রেপ্তারি ঘটনার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেন সামরিক সংস্থার ওপর।

এদিকে শহীদুল্লা কায়সার ও আলী আকসাদকে গ্রেপ্তারের সময় বেশ মারপিট করা হয়। কী আইনে তাঁদের ধরা হয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলে তাঁদের কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, ওপর উল্লিখিত ওই 'প্রিভেনশান অব স্মাগলিং অর্ডিন্যান্স'-এর কথা। যাই হোক, আমাদের এই চারজন কমরেড জামিনে মুক্তি পেয়ে যান।

এই গ্রেপ্তারি ঘটনা নিয়ে এতটাই হৈচৈ হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক জিওসি ওমরাও খান এই মর্মে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত নন। পরে অবশ্য ওই কেস উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের পার্টি সম্মেলন

১৯৫১ সালে পিওসি গঠিত হবার পর আমাদের পার্টির ওপর বিশেষভাবে পরিচালিত দমননীতির কারণে আমরা পার্টি সম্মেলন করতে সক্ষম হইনি। অথচ সম্মেলন করাটা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। পার্টির পাকিস্তানভিত্তিক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবার পর মাত্র একবারই সেই কমিটির বৈঠক হয়েছিল। এরপর নানাভাবে চেষ্টা সত্ত্বেও সেটা করা সম্ভব হয়নি। একে তো আমাদের গোপনে কাজ করতে হচ্ছিল, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল ১২০০ মাইল। এই ভৌগোলিক দূরত্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ও সদস্যবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা অলঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর ছিল। এই অবস্থায় পিওসি-ই নীতিনির্ধারণী কমিটি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা আর কারো ছিল না। এছাড়াও রাজনৈতিক নানা প্রশ্ন আমাদের কাছে এসে জমা হচ্ছিল। তার সমাধান জরুরি ভিত্তিতে করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কেননা, এসব প্রশ্নের অধিকাংশই ছিল বিতর্কমূলক, পার্টির কাজ পরিচালনা বিষয়ে মত ও পথ সংক্রান্ত।

আগেই বলেছি, সার্বিক দমন নীতির কারণে আমরা প্রকাশ্যে কাজ করতে পারছিলাম না। আর প্রকাশ্যে কাজ পরিচালনা করতে না পারার ফলে জনগণের আশু ও জরুরি দাবি-দাওয়াগুলো নিয়ে আন্দোলন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সম্ভব হচ্ছিল না জনগণের মধ্যে থেকে জনগণের চেতনা বৃদ্ধি এবং তাঁদের সংঘবদ্ধ করা।

এই অবস্থার মুখে আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আওয়ামী লীগের ভেতরে থেকে আপাতত দৈনন্দিন রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করে যুক্তি তুলতে থাকেন। এ ব্যাপারে আমাদের অর্থাৎ পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বিমতও দেখা দেয়। এ বিষয়ে কোনো ঐকমত্য হয় না।

এর আগে আমরা কয়েকবার সিদ্ধান্ত নিয়েও পার্টি সম্মেলন স্থগিত করেছিলাম। কিন্তু এবার পিওসি সিদ্ধান্ত নিল যে, যে করেই হোক এবার গোপনে সম্মেলন করে গঠন করতে হবে পার্টির পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটি। এই মোতাবেক ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে আমরা পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত করি এবং অত্যন্ত গোপনেই।

আমাদের পার্টির ওই সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন পূর্ব পাকিস্তানে জেলার সংখ্যা ছিল ১৭। এই ১৭টি জেলার মধ্যে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের পার্টির কোনো রকম সংগঠন ছিল না। নোয়াখালী, বগুড়া ও রাজশাহী—এই তিনটি জেলায় ব্যাপক ধর-পাকড়ের ফলে আমাদের সংগঠনগত অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল

অবশেষে বড় বড় জেলা থেকে ঊর্ধ্বে তিনজন, কোথাও থেকে দুজন এবং কোনো কোনো স্থান থেকে মাত্র একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আমাদের পার্টির ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৩টি জেলা ও অন্য সব ইউনিট প্রভৃতি থেকে মোট ২৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আমরা রিপোর্ট ইত্যাদি ছাপিয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করি। তাছাড়া, আওয়ামী লীগের মধ্যে কাজ করার বিরুদ্ধে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ওই বিরুদ্ধ মতামত সংক্রান্ত বুকলেটও ছেপে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করা হয়। পার্টির আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্রও উপস্থিত করা হয় সম্মেলনে। শুধু তাই নয়, এই সম্মেলনে আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও তার অবশেষসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণনীতি ঠিক করি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা ও কর্মসূচি ইত্যাদিও গ্রহণ করি।

প্রতিনিধিদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শেষে এই সম্মেলনেই গৃহীত হয় আওয়ামী লীগের মধ্যে আমাদের কাজ করার কৌশলগত নীতি। তিনদিন ধরে চলা এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই। তবে, এই সম্মেলন চলাকালে আমাদের মধ্যে একটা চিন্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পার্টির দৈনন্দিন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে আগত নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের ব্যাপারটি বেশ উপেক্ষিত। এর একটা সুরাহা দরকার এবং অনতিবিলম্বেই। কেননা ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ’৫৪-এর নির্বাচনের ভেতর দিয়ে পার্টিতে এরই মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এমন কিছু শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত নতুন উদ্যোগী ও সৎ সভ্য-কর্মী। কাজেই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে আগত ওইসব কমরেডকে সাহসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

এদিকে আমরা বেশ আগেই খবর পেয়েছিলাম যে, সাজ্জাদ জহির পশ্চিম পাকিস্তানে পার্টির একটি রিজিওনাল বা আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেছেন। এরও পেছনে কারণ ছিল। এক. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব। দুই. কমিউনিস্টদের ওপর পরিচালিত ব্যাপক নির্যাতন এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে পার্টিগত যোগাযোগের চরম অসুবিধা।

আরো একটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানেও কমিউনিস্টদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন পাকিস্তান সৃষ্টির একেবারে গোড়া থেকেই চরমভাবে অব্যাহত ছিল। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় সাজ্জাদ জহির ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সভ্য আতা মোহাম্মদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ-অব-স্টাফ জেনারেল আকবরসহ বেশ কজন পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাকে। রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, কমিউনিস্টরা জেনারেল আকবরের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনায় পশ্চিম পাকিস্তানের ওই কমরেডরা সরাসরি জড়িত ছিলেন না। সামরিক বাহিনীর ওইসব পদস্থ কর্মকর্তা একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠনে কমিউনিস্ট নেতাদের পরামর্শ ও সাহায্য চেয়েছিলেন মাত্র। সামরিক বাহিনীর এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর একটি অংশের চরম অসন্তোষের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশস্বরূপ ছিল।

রাওয়ালপিণ্ডি 'Conspiracy Tribunal Ordinance'-এর বিরুদ্ধে আপিল করা হলে সুপ্রিম কোর্ট এই অর্ডিন্যান্স বাতিল করে দেন। ফলে এই ষড়যন্ত্র মামলার সব আসামি মুক্তি পেয়ে যান। পরে সাজ্জাদ জহিরকে পাকিস্তান ত্যাগ করার একটা 'পারমিট' দিয়ে ভারতে চলে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়। পাকিস্তান সরকার কৌশল করে পরে ওই 'পারমিট' প্রত্যাহার করে নিলে সাজ্জাদ জহিরের আর পাকিস্তানের মাটিতে ফেরা সম্ভব হয় না।

এর আগে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে আসা সৎ-উদ্যোগী পার্টি কর্মী-নেতাদের আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে অংশগ্রহণ বা অন্তর্ভুক্ত আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর সেই প্রয়োজনকে

সামনে রেখেই পার্টির এই সম্মেলনে যে ১২ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়, সেটা ছিল নিম্নরূপ :

১. নেপাল নাগ, ২. সুখেন্দু দস্তিদার, ৩. আমজাদ হোসেন, ৪. মোহাম্মদ তোয়াহা, ৫. শহীদুল্লা কায়সার, ৬. অনিল মুখার্জী ৭. মোজাফ্‌ফর আহমদ. ৮. হারুন অর রশীদ, ৯. খোকা রায়, ১০. আবদুস সালাম, ১১. আলতাব আলী এবং ১২. মণি সিংহ।

সম্পাদক নির্বাচিত হন মণি সিংহ।

সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন : মণি সিংহ, অনিল মুখার্জী, নেপাল নাগ, সুখেন্দু দস্তিদার ও আবদুস সালাম। এঁদের সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলীতে আর যে কজন নতুন নেতা যুক্ত হন, তাঁরা হলেন : হারুন অর রশীদ, মোজাফ্‌ফর আহমদ, আমজাদ হোসেন এবং মোহাম্মদ তোয়াহা। পরে সরদার ফজলুল করিমকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়। এ সময় তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য।

১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশের সংবিধান সংশোধন করে পৃথক নির্বাচন প্রথার স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করে প্রশংসা অর্জন করলেও পাশাপাশি তিনি এমন কিছু কাজও করেছিলেন, চরিত্রের দিক থেকে যেগুলো স্পষ্টতই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী।

সোহরাওয়ার্দীর এইসব প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী পদক্ষেপের মধ্যে প্রধানতম ছিল, সুয়েজ খাল জাতীয়করণের প্রশ্ন নিয়ে মিসরের ওপর ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসরায়েলের মিলিত আগ্রাসনের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সামরিক জোটগুলোকে সমর্থন করা এবং সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তিতে পাকিস্তানের যোগদানের পক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ানো। ফলে সোহরাওয়ার্দীর সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা এই বিদেশনীতি পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্টি করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি সোহরাওয়ার্দীর ওই দুটি প্রতিক্রিয়াশীল নীতির তীব্র সমালোচনা করতে পিছপা হয় না। আওয়ামী লীগের সে সময়কার সভাপতি মাওলানা ভাসানীও সোহরাওয়ার্দীর ব্যাপারে আমাদের মতোই

প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। আর এই রকম এক পরিস্থিতিতে মাওলানা সাহেব টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। এই কাউন্সিল অধিবেশন ব্যাপক বিশাল ও সাড়ম্বর আয়োজনের ভেতর দিয়ে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভাসানী ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে এই অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান জানান। তবে ভারতের ওই দুই বরেণ্য নেতা উপস্থিত না থাকলেও পশ্চিমবাংলার বেশ কজন প্রখ্যাত কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক এতে অংশগ্রহণ করেন। কেননা, এই অধিবেশনের অঙ্গীভূত একটি অংশ ছিল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানা। এছাড়া অধিবেশন স্থলে প্রবেশের বিভিন্ন তোরণদ্বারের নামকরণ করা হয়েছিল দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সব নেতার নামে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জওহরলাল নেহেরু, বিধান রায়, মাও সে তুং, স্তালিন এবং ইস্কান্দার মির্জা তোরণদ্বার ইত্যাদি। ওই কাউন্সিল অধিবেশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

আমরা এই পরিস্থিতির মুখে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, সোহরাওয়ার্দীর প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশনীতির বিরুদ্ধে কোনো সরাসরি বিরোধিতা বা প্রস্তাব উত্থাপন না করে, ’৫৩ সালের শেষে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগদানের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগের এ অধিবেশনেও সেই প্রস্তাবের অনুরূপ একটা প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। আমরা শুনেছিলাম যে, সোহরাওয়ার্দীর বিদেশনীতির বিরোধিতা করে মাওলানা ভাসানী প্রস্তাব আকারে তাঁর বক্তৃতায় কিছু একটা উত্থাপন করবেন। ওই রকম কোনো বিরোধিতা মাওলানা সাহেবের তরফ থেকে উচ্চারিত হলে, তাঁকে যেন আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার, পার্টির সভ্য ও সমর্থকরা সমর্থন করেন, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে এ রকম নির্দেশও দিয়েছিলাম।

যাই হোক, সোহরাওয়ার্দী ওই কাউন্সিল অধিবেশনে সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি ‘সিয়াটো’ ও ‘সেন্টোর’ পক্ষে বক্তৃতা করেন। কিন্তু মাওলানা ভাসানী বা উপস্থিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিলরদের কেউই ওই নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলেননি। সোহরাওয়ার্দী কাগমারী থেকে ফিরে এসে পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সমাবেশেও তাঁর বিদেশনীতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অর্জন করেন তিনি তাঁর নীতির প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি ও ছাত্রসমাজের সমর্থন।

কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ওই কাউন্সিল অধিবেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হওয়ায় আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির তিনজন অর্থাৎ নেপাল নাগ, খোকা

রায় এবং মণি সিংহ গোপনে সেখানে যাই। কিন্তু আমাদের উপস্থিতির ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে গেলে, আমরা কাগমারী থেকে চলে আসি। আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা নীতির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াবার কথা বলি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

আসলে এই সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ওপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। সে চাপ সৃষ্টি করে চলেছিলেন ইস্কান্দার মির্জা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতি বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সমর্থন আদায় করাই ছিল এই চাপ সৃষ্টির কারণ।

এই সময়ের আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো এই যে, সোহরাওয়ার্দী সাহেব মিসর যাবার প্রস্তাব দিলে মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসের তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা, ওই সময়কার মার্কিন নীতির সমর্থক সোহরাওয়ার্দীর কার্যকলাপ কার্যত পরিচালিত হচ্ছিল মিসরের বিরুদ্ধে, যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি।

কাগমারী অধিবেশনের পর 'ইত্তেফাক' পত্রিকা মাওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় প্রচার ও আক্রমণ চালাতে থাকে। মাওলানাকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করবার জন্যই এই আক্রমণাত্মক প্রচারকাজ চালানো হচ্ছিল। ফলত মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে বিদেশনীতি বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করতে থাকে। তাই কাগমারী অধিবেশনের কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের জুন মাসে ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগের আরেকটি কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হয়। ওই কাউন্সিল বৈঠকে মাওলানা ভাসানী ও আওয়ামী লীগে কর্মরত আমাদের পার্টির সভ্য কাউন্সিলরদের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশনীতি প্রস্তাবাকারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ হয়ে গেলে আমাদের পার্টির সভ্য ও সমর্থকদের পক্ষে সে দলে থাকা আর সম্ভব ছিল না। তাই তাঁরা পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে ও তার সমর্থন নিয়েই নতুন একটি রাজনৈতিক দল গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। মাওলানা ভাসানী অচিরকালের (অল্পদিনের) মধ্যেই আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁকে অনুসরণ করেন আওয়ামী লীগের ভেতরে কর্মরত আমাদের পার্টির অন্য সভ্য-সমর্থকরাও।

১৯৫৭, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন

আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেই মাওলানা ভাসানী সারা পাকিস্তানভিত্তিক একটি প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের নেতা আবদুল গাফফার খান (যিনি 'সীমান্ত গান্ধী' নামে সমধিক খ্যাত), পাঞ্জাবের নেতা মিয়া ইফতিখার উদ্দিন, মাহমুদ আলী কাসুরী, মাহমুদুল হক ওসমানী (করাচি), আবদুল মজিদ সিন্ধী, জি এম সৈয়দ ও গাউস বক্স বেজেঞ্জোসহ আরো অনেক পশ্চিম পাকিস্তানি নেতার কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। স্থির হয়, ২৬ থেকে ২৭ জুলাই (১৯৫৭)-এই দুদিন পর্যন্ত ঢাকার সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে গঠন করা হবে একটি নতুন রাজনৈতিক দল।

মাওলানা ভাসানীর এই উদ্যোগে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। ফলে এই সম্মেলনে যোগ দেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খানসহ আরো বহু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আরবাব সিকান্দার, আফজাল বাংগাস (সীমান্ত প্রদেশ), মিয়া ইফতিখার উদ্দিন, এয়ার কমোডর ঝঞ্জুয়া, মাহমুদ আলী কাসুরী, মেজর ইসহাক (পাঞ্জাব), সি আর আসলাম (পাঞ্জাব), আব্দুল মজিদ সিন্ধী, জি এম সৈয়দ (সিন্ধু প্রদেশ), মাহমুদুল হক ওসমানী (করাচি), কালাতের নবাব আবদুল করিম, গাউস বক্স বেজেঞ্জো, আতাউল হক খান মেঙ্গল, খায়ের বক্স মারি, আবদুস সামাদ আচাকজাই, গোলাম মোস্তাফা খার ও সাভো জ্ঞান চন্দানী। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। জমজমাট সম্মেলন বলতে যা বোঝায়, রূপমহলে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনের চেহারা ছিল সে রকমই। এ সম্মেলনেই গঠন করা হয় দেশের প্রথম সারা পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক দল 'পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি', সংক্ষেপে 'ন্যাপ'।

সম্মেলন শেষে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভা করা হয়। সভায় বিপুল জনসমাবেশ হয়। কিন্তু ওই সভাকে ভণ্ডুল করার জন্য আওয়ামী লীগের তরফ থেকে নানা রকম প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি, পটকা ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও 'ন্যাপ'-এর উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সভাস্থল ত্যাগ করেননি।

ওইদিন আওয়ামী লীগের এক শ্রেণির লোক সভামঞ্চ লক্ষ্য করে এমনভাবে ঢিল-পাটকেল ছুড়তে থাকে যে, মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনেকেই আহত হন। তাঁদের মধ্যে বেশি আহত হন পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা আফজাল বাংগাস। তাঁর মাথা ফেটে যায়। সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খান এই রকম ঢিল-পাটকেলের মুখে ডায়াসে উঠে দাঁড়ান এবং মঞ্চ বরাবর নিক্ষিপ্ত ঢিলের খণ্ডগুলো লুফে নিতে এবং এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে থাকেন। এই ঢিল লুফে নেওয়া ও তার মঞ্চের এক কোণে জড়ো করে রাখার ঘটনা বেশ কৌতুকের জন্ম দিয়েছিল।

যাই হোক, 'ন্যাপ'-এর একেবারে জন্মলগ্নে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় আওয়ামী লীগাররা যেমন বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি বিভিন্ন জেলা পর্যায়েও তারা 'ন্যাপ'-এর সভা-শোভাযাত্রার ওপর হামলা চালাতে কসুর করেননি। শুধু তাই নয়, ন্যাপ-এর জন্মের পর থেকেই আওয়ামী লীগের একটি অংশ তুলেছিল কমিউনিস্ট ও সোভিয়েতবিরোধী কুৎসার ঝড়। তাদের এই কুৎসার আগুনে ইন্ধন যোগায় সমাজতান্ত্রিক দেশ হাঙ্গেরিতে একটি প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান দমনে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপের বিষয়টি। 'ইত্তেফাক' পত্রিকা এই কুৎসা প্রচারের সব থেকে বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য, আমাদের পার্টি তখন বে-আইনি থাকলেও বিভিন্নভাবে বা মাধ্যমে এই কুৎসা খণ্ডন করে তার যথাসম্ভব জবাব দিয়েছিল।

নানা রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ন্যাপ অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার গণভিত্তি দৃঢ় হতে থাকে। গণতন্ত্রী দল এই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া, কমিউনিস্ট পার্টির অনেক প্রকাশ্য কর্মী, বিশেষ করে পার্টির যেসব সভ্য ও সমর্থক আওয়ামী লীগে কাজ করতেন, তাঁরা ওই দল ত্যাগ করে 'ন্যাপ'-এ যোগ দিয়ে কাজ করতে শুরু করলে এর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অচিরকালের (অল্পদিনের) মধ্যেই জনগণ 'ন্যাপ'-এর রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নরূপ ছিল :

সভাপতি : মাওলানা ভাসানী।

সাধারণ সম্পাদক : মাহমুদুল হক ওসমানী।

সহ-সভাপতি : আবদুল গাফফার খান, আব্দুল মজিদ সিন্ধী, মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরি, হাজি মোহাম্মদ দানেশ, দবির উদ্দিন আহমদ, মাওলানা আলতাফ ও মোহাম্মদ তোয়াহা।

সহ-সাধারণ সম্পাদক : অধ্যাপক মোজাফফ্র আহমদ।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটি ছিল নিম্নরূপ :

সভাপতি : মাওলানা ভাসানী।

সাধারণ সম্পাদক : মাহমুদ আলী।

সহ-সভাপতি : হাজি দানেশ, দবির উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, মাওলানা আলতাফ হোসেন ও আবদুল কাদের চৌধুরী।

যুগ্ম-সম্পাদক : অলি আহাদ।

সদস্যবৃন্দ : আহমদুল কবির, মহিউদ্দিন আহমদ, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, আতাউর রহমান (রাজশাহী), আবদুর রাজ্জাক (যশোর), মাওলানা আজমী (চট্টগ্রাম), বিজয়ভূষণ চ্যাটার্জী, মোশাররফ হোসেন মণ্ডল, আজিজুল হক (রংপুর) ও গাজিউল হক (বগুড়া) প্রমুখ।

কৃষক সমিতির পুনর্গঠন

১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ সাল সময়ের ভেতরে তে-ভাগা, টংক ও নানকার আন্দোলনের ওপর মুসলিম লীগ সরকারের অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন এবং ওইসব আন্দোলনের ক্ষেত্রে পার্টি নেতৃত্বের অতি বাম বিচ্যুতির ফলে আমাদের প্রভাবাধীন কৃষক সংগঠনের কাজকর্মে প্রচণ্ড ভাটা পড়েছিল। এই ভাটা পড়ার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করার পর পার্টি ১৯৫১-৫২ সাল থেকে নতুন করে কৃষক সমাজের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার জন্য কৃষক সমিতি পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নেয়।

এরই মধ্যে মুসলিম লীগ সরকারের কৃষি ও কৃষকবিরোধী নীতি এবং সামন্তবাদী শাসক-শোষকদের অব্যাহত শোষণ ও জুলুমের ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছিল। এই প্রেক্ষাপটে পার্টির কিছু উদ্যোগী কর্মীর প্রচেষ্টায় ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে প্রদেশের কয়েকটি জেলার কোনো কোনো অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের ভেতরে পার্টির প্রভাবাধীন কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর ফলে কৃষক সমিতি পুনর্গঠনের ব্যাপারে পার্টির ভেতরে নতুন করে উৎসাহের সঞ্চার হয়। এই অবস্থায় আমরা প্রাদেশিক ভিত্তিতে একটা কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেই। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৫৬ সালে আমরা মাওলানা ভাসানীকে অনুরোধ জানাই। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি তাঁর অপারগতার কথা প্রকাশ করেন।

পরে আমরা মাওলানা তর্কবাগীশকে এ ব্যাপারে অনুরোধ জানালে তিনি রাজি হন। মহিউদ্দিন আহমদ ও পার্টির কয়েকজন কৃষক কর্মীর উদ্যোগে বিভিন্ন জেলার কৃষক নেতা ও কর্মীদের এক বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। ওই বৈঠকে প্রাদেশিক কৃষক সমিতি গঠন করা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয় বিশদ আলাপ-আলোচনা। এই আলাপ-আলোচনা শেষে মাওলানা তর্কবাগীশ ও মহিউদ্দিন আহমদকে যথাক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারি করে কৃষক সমিতি গঠন করা হয়। কিন্তু সরকারের দমন নীতির দরুন নবগঠিত এই কৃষক সমিতির উদ্যোগে কাজকর্ম আর অগ্রসর করে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এই সময় মাওলানা ভাসানী নিজস্ব উদ্যোগে গঠন করেছিলেন প্রদেশভিত্তিক একটি কৃষক সমিতি। আমাদের পার্টির নেতৃবৃন্দ তখন মাওলানা ভাসানীর ওই কৃষক সংগঠনে যোগ দিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী পার্টির কৃষক ফ্রন্টের কর্মীরা ওই সমিতিতে যোগ দিয়ে কাজকর্ম করতে শুরু করলে অত্যল্পকালের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের অনেক স্থানে গড়ে উঠেছিল ওই কৃষক সমিতির শাখা। পরবর্তীকালে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন এই কৃষক সমিতিই কৃষক সম্প্রদায়ের প্রধানতম সংগঠনে পরিণত হয়।

সোহরাওয়াদী মন্ত্রিসভার পতন ও তা রোধে পার্টির ভূমিকা

আগেই বলেছি, ইস্কান্দার মির্জা ছিলেন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। তাঁর ষড়যন্ত্র আগের মতোই চলতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকেন। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ার মুখে তাঁকে গদিচ্যুত করা হয় ১৯৫৭ সালের ১৩ অক্টোবরে। পরিবর্তে কেন্দ্রে গঠিত হয় চুন্দ্রিগড় মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভার বয়স ছিল মাত্র দুমাস। তারপর ফিরোজ খান নুনের নেতৃত্বে কেন্দ্রে গঠিত হয় নতুন মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রে এই সময় নতুন কারো গদিতে আরোহণ এবং দুদিন পর পর তার পতন বা গদিচ্যুতির ঘটনা ডাল-ভাতের মতোই ব্যাপার হয়ে ওঠে।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক ঘোট পাকিয়ে ওঠে। এ সময় আওয়ামী লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান ও শক্তিশালী সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ফলে কথা নেই বার্তা নেই, এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এ কে ফজলুল হক আতাউর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে বসেন। এই বরখাস্তের তারিখ ছিল ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ।

পূর্ব পাকিস্তানে আবার গঠিত হয় আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা। কিন্তু ওই মন্ত্রিসভা টিকে থাকে মাত্র ১২ ঘণ্টা। সবচেয়ে কৌতুককর ঘটনা, ওইদিনই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ তারিখেই ফিরোজ খান নুনের সহযোগিতায় ফজলুল হক সাহেবকেও গভর্নর পদ থেকে গদিচ্যুত করা হয়।

এ সময় ন্যাপ-এর সভাপতি মাওলানা ভাসানী ছিলেন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে। তিনি তার নিজস্ব দল ন্যাপ-এর মাধ্যমে 'আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা যাবে না'—এ মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। মাওলানা ভাসানী তথা ন্যাপ-এর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই অসন্তোষের মূলে ছিল ন্যাপ-এর বিরুদ্ধে দলটির কুৎসা প্রচার, গুণ্ডামি এবং প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা বিদেশনীতি। এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, ন্যাপ আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। না হলে পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তানের সেইকালের দ্রুত উত্থান-পতনময় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বোঝার পক্ষে পাঠক সাধারণের অসুবিধা হতে পারে।

ষড়যন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জা কেন্দ্রে যেমন, পূর্ব পাকিস্তানেও তেমনি রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটনোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। মন্ত্রিত্ব পাওয়ার লোভে কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি) আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ইস্কান্দার মির্জার এই চক্রান্তে। পূর্ব পাকিস্তানের নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগও পা দিয়েছিল ওই চক্রান্তের ফাঁদে। ফলে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল তাদের ত্রি-দলীয় ঐক্য জোট।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার তখন পর্যন্ত যে সমর্থন ছিল, তাতে করে কৃষক প্রজা পার্টি 'কেএসপি', নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগ জোটের মিলিত শক্তিতে ওই মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আবু হোসেন সরকার যখন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে, তখন সত্যিকারভাবেই সেই মন্ত্রিসভার ভাগ্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ে আমাদের পার্টির ওপর। কেননা, '৫৪ সালের নির্বাচনে পার্টির ৪ জন প্রার্থী ছাড়াও আরো কিছু পার্টি সভ্য ও সমর্থক যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য মিলিয়ে মোট ২১ থেকে ২২ জন পার্টি সভ্য ও সমর্থক পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য ছিলেন এবং ন্যাপ গঠনের পর স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন আইনসভার ন্যাপ গ্রুপে। তাই আবু হোসেন সরকার যখন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

আনে, তখন ন্যাপ-এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের এতদিনকার বৈরী মনোভাব ও কর্মতৎপরতার ফলে সৃষ্ট অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ ন্যাপ-এর আইন পরিষদ সদস্যরা সেই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন এবং আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। অবশ্য আবু হোসেন সরকারের ওই অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতি ন্যাপভুক্ত পার্টির আইন-পরিষদ সদস্যদের সমর্থন জানানো না-জানানো বিষয়ে পার্টির তরফ থেকে আগাম স্পষ্ট কোনো নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ঘটনাটা ঘটেছিল অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই।

কিন্তু চুরি করে চোর পালালে যেমন বুদ্ধি বাড়ে, আওয়ামী মন্ত্রিসভার পতনের পর আমাদের পার্টির অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা সে রকমেরই। আমরা এরপর ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশ্লেষণে বসি এবং সে বিশ্লেষণে দেখতে পাই যে, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কতগুলো প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম এবং আওয়ামী লীগ ন্যাপ-এর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার ও গুণ্ডামি করলেও, আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসারে এবং সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া, আওয়ামী লীগের বর্তমান ভূমিকা ষড়যন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জার বিরুদ্ধে পরিচালিত, যে ইস্কান্দার মির্জা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্ত ভূস্বামী গোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে চলেছেন। তাই বৃহত্তর জনস্বার্থেই পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম রাখা কর্তব্য বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিই। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস মারফত সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে কতগুলো প্রস্তাব পাঠিয়ে বলি, সেগুলো মেনে নিলেই আমরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করব।

দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. যুক্ত নির্বাচন।
২. সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা।
৩. সার্টিফিকেট প্রথা রদ করা।
৪. স্বাধীন ও সক্রিয় জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ।
৫. সব ধরনের সামরিক জোট বর্জন ইত্যাদি।

আমাদের উপরিউক্ত দাবিগুলো শেখ মুজিবুর রহমান আগেই মেনে নিয়েছিলেন। পরে আতাউর রহমান খান সাহেবও গ্রহণ করে নেন। ফলে পুনরায় আওয়ামী লীগকে নীতিগতভাবে সমর্থন করার বিষয়ে আমরা সম্মত হই। ঢাকায় এই সময় পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকেই আবু হোসেন মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করার বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত আইনসভার ন্যাপ গ্রুপভুক্ত পার্টির সব সভ্য ও সমর্থককে অবহিত করে এই জরুরি নির্দেশ দেওয়া হয় যে—আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে, তারা সেই প্রস্তাবকে অবশ্যই সমর্থন করবেন।

১৯৫৮ সালের ২১ জুন তারিখে প্রাদেশিক আইনসভায় আওয়ামী লীগের তরফ থেকে অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ন্যাপভুক্ত আইন পরিষদ সদস্যবৃন্দ পার্টির ওই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন এবং মাত্র দুই মাস ক্ষমতায় থাকার পর আবু হোসেন সরকারের পতন ঘটে। এর পরিণতিতে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রাদেশিক আইনসভায় যে ২১ থেকে ২২ জন কমিউনিস্ট সদস্যের অনাস্থা ভোটে একদিন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছিল, সেই একই সদসবৃন্দের আস্থা অথবা সমর্থনসূচক ভোটে তাঁরা আবার ক্ষমতাসীন হবার সুযোগ লাভ করে। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পুনর্বহালে কমিউনিস্ট পার্টির এই ভূমিকার জন্য পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক সমাজ সেদিন কমিউনিস্ট পার্টিকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা করেনি।

ঠিক এরপরই এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার অজুহাতে প্রদেশব্যাপী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ঘোট আরো পাকিয়ে ওঠে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি করার পথ প্রশস্ত হবার সুযোগ পায়।

আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম হবার ২/৩ দিন পরেই পূর্ব পাকিস্তানে দুই মাসের জন্য জারি করা হয়েছিল প্রেসিডেন্টের শাসন। এই শাসন জারির অজুহাত হিসেবে ধুয়া তোলা হয়েছিল এই বলে যে, ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তনে পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়েছে এক অনিশ্চিত অবস্থা। দুই মাস পর ১৯৫৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার বাজেট অধিবেশন। আইনসভার এই অধিবেশনকে ভণ্ডুল বা বানচাল করার জন্য ইস্কান্দার মির্জার সমর্থনধন্য কৃষক শ্রমিক পার্টি 'কেএসপি' ও মুসলিম লীগ আইনসভার ভেতরে হাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে তারা আইনসভায় বাইরে থেকে নিয়ে আসে ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী পর্যন্ত।

আইনসভার অধিবেশন বসত তখন জগন্নাথ হলে। সেদিন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে অধিবেশনের শুরুতেই সৃষ্টি হয় ভীষণ গোলমালের। প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও বচসা। পরে শুরু হয় পারস্পরিক চেয়ার ও ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি। এক পর্যায়ে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। দুঃখজনক ব্যাপার, হাসপাতালের বেডেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৫৮, মার্শাল ল

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অভ্যন্তরে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর দুঃখজনক মৃত্যু সামরিক শাসন জারির একটা অজুহাত ছিল মাত্র। এই শাসন জারির মূল কারণ নিহিত ছিল অন্যত্র। এইসব কারণের মধ্যে প্রথমত ছিল নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনে ব্যাপক মন্দা প্রভৃতির ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে ঘটেছিল নিদারুণ অবনতি। এরই পরিণতিতে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও কেন্দ্র নতুন সরকার গঠনের দাবিও তখন সারা পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল ব্যাপক জাগরণ। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও কায়েমি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল জানত, অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে তাদের মারাত্মক ভরাডুবি হবে।

এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ও পাকিস্তানের উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের বিদেশি মিত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশেষভাবে উদ্বেগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এছাড়া অন্য যে ঘটনাটি সামরিক শাসনকে ত্বরান্বিত করেছিল, তা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আসন বণ্টনের বিষয়টি নিয়ে ফিরোজ খান নুনের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের মতবিরোধ এবং তারই পরিণতিতে ১৯৫৮ সালের ২ অক্টোবর আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রীরা ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এর ফলে দেখা দিয়েছিল একটা তীব্র সংকট। এ জাতীয় ঘটনার মুখে পূর্বাপর ষড়যন্ত্রকারী ইস্কান্দার মির্জা, 'দেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের' অজুহাত তুলে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জারি করেন দেশব্যাপী মার্শাল ল অর্থাৎ সামরিক আইন। এই সামরিক আইন জারির মাধ্যমেই ১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধান, সেই সঙ্গে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রিপরিষদসমূহ বাতিল করা হলো। ফলে জনসাধারণ সীমিত আকারেও যেটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছিল, ছিনিয়ে নেওয়া হলো তাও।

দেশে যে সামরিক শাসন জারি হতে পারে, এমন আশঙ্কার কথায় আমরা সহজে বিশ্বাস করতে পারিনি। ফিরোজ খান নুন ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন, আমরা নিশ্চিত ছিলাম, সে অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, আমরা তাতে অংশগ্রহণ কিংবা পরিস্থিতি বুঝে কার্যক্রম গ্রহণ করব। কিন্তু তা আর হলো না।

সামরিক শাসন জারির ৫/৬ দিন আগে আমরা কয়েকজন মিলে দেখা করেছিলাম মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে। অনেক কথার পর আমরা তাঁর সামনে নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুললে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "নির্বাচন হবে না, হবে না, হবে না। আমি ইন্দোনেশিয়ায় চলে যাচ্ছি।" নির্বাচন যে হবে না, এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়তা দেখে আমরা থ মেরে গিয়েছিলাম। এখন মার্শাল ল জারি হওয়ার পর আমরা বুঝতে পারলাম, মাওলানা সাহেবের কথা সর্বৈব সঠিক। জানি না, এ ব্যাপারে তিনি আগে কোনো রকম আভাস পেয়েছিলেন কিনা, তবে তাঁর জানার সম্ভাবনা বেশি, এমন ধারণা উড়িয়ে দেওয়া গেল না।

মার্শাল ল জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে উপস্থিত হলো নানাবিধ সমস্যা। প্রথমত, পার্টির যারা প্রকাশ্য কমরেড, তাঁদের গোপনে যেতে বলা হলো। কিন্তু তাঁরা পরিচিত ব্যক্তি বলে পুরনো শেল্টারে তাঁদের পক্ষে আশ্রয় নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলো এ কারণে যে, তাঁদের ওই পরিচিতির কারণে পুরনো শেল্টারগুলোর কথা সহজে প্রকাশ হয়ে যাবার ভয় ছিল। যা হোক, এ ব্যাপারটার একটা সুরাহা অবশেষে হয়ে গেল প্রকাশ্য নেতাকর্মীরা যখন তাঁদের স্ব স্ব চেষ্টায় দ্রুত আত্মগোপনের স্থান খুঁজে পেলেন। পরে অবশ্য তাঁদের জন্য ভিন্ন শেল্টারের ব্যবস্থা করা হয়।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর শাসনামলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন, তখন আমরা একবার মার্শাল ল সম্পর্কে শুনতে পাই। তখন এ রকম একটা কথা উঠেছিল যে, সোহরাওয়ার্দীর আইনমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটিকে যদি মেনে নেওয়া না হয়, তা হলে মার্শাল ল জারি করা হতে পারে। কেননা, বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের আইনমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটি অবমাননাসূচক বা সেটা যথার্থ হয়নি বলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল, বিশেষত আওয়ামী লীগ মহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতেই তখন মার্শাল ল দেবার ভীতি উচ্চারণ করা হয়েছিল।

যাই হোক, মার্শাল ল জারি করার সঙ্গে সঙ্গে ইস্কান্দার মির্জা জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে যুগপৎ প্রধান মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর এবং সৈন্যবাহিনীরও প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন। আর এই সঙ্গে শুরু হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক কমিউনিস্ট নেতাকর্মীসহ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলসমূহের নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে জেলে আটক করার পালা।

কিন্তু জাত ষড়যন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জার দমনমূলক কাজকর্মের শেষ এখানেই হলো না। এবার তিনি ষড়যন্ত্র শুরু করলেন খোদ সামরিক জেনারেল ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। ফলে এবার নিজের পেতে রাখা ফাঁদে আটকা পড়লেন

তিনি নিজেই অচিরেই আইয়ুব খান ও তাঁর সহকর্মীরা ইস্কান্দার মির্জাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং সামরিক শাসন জারির মাত্র ২০ দিন পর মির্জা দেশত্যাগ করে সস্ত্রীক বিলেত চলে যেতে বাধ্য হলেন। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর তারিখে আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে তাঁর কাছে দায়ী একটি মন্ত্রিসভাও গঠন করলেন। প্রেসিডেন্ট হবার পাশাপাশি তার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটিও বহাল থাকল।

আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভা গঠন করা হলো মোট ১২ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে নিয়ে। তাঁদের মধ্যে চারজন ছিলেন জেনারেল এবং বাকি আটজন অসামরিক ব্যক্তি। পুলিশের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল জাকির হোসেনকে নিযুক্ত করা হলো পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। আইয়ুব খান যতদিন ক্ষমতাসীন ছিলেন, ততদিন প্রতি বছর ২৭ অক্টোবর তারিখটিকে পালন করা হতো 'বিপ্লব দিবস' হিসেবে।

আইয়ুবের মার্শাল ল-কে এ দেশের মানুষ, প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের আকাশচুম্বিতার ফলে তাঁদের দুর্ভোগ ও দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা দর্শনে তাঁদের হতাশা থেকেই তাঁরা সামরিক শাসনকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অনেককেই, বিশেষত কেরানি বা নিম্ন শ্রেণির মানুষজনকেও এ সময় বলতে শুনেছি, এবার খুব ভালো শক্ত হাতে দেশের শাসন হবে। গোলমাল বলে কোনোকিছু থাকবে না। কিন্তু তাঁদের এই মনোভাব বেশি দিন স্থায়ী হওয়ার সুযোগ পায়নি। সামরিক শাসন সম্পর্কে ধীরে ধীরে তাঁদের মোহভঙ্গ হতে থাকে।

ক্ষমতাসীন হবার পরপরই আইয়ুব খান সরকারি কর্মচারীদের জন্য স্ক্রিনিং কমিটি করে ৩০৩ উপধারা বলে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ছাঁটাই করেন। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য চালু করেন কুখ্যাত 'এবডো' প্রথা। এর ফলে ৭ বছর পর্যন্ত রাজনীতিকরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হলেন। এই 'এবডো' বিধি-নিষেধ জারি করা হয় ১৯৫৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে।

এর মধ্যেই জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করল। জিনিসপত্রের দামের লাগাম সরকারের পক্ষে টেনে ধরে সংযত রাখা সম্ভব হলো না। ১৯৫৯ সালে সামরিক বাহিনীকে ফিরিয়ে নেওয়া হলো ব্যারাকে। এই সময় আইয়ুব খান হাত দিলেন ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে। আইন করলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ সেচযুক্ত জমি ৫০০ এবং অসেচযোগ্য জমি ১০০০ একরের বেশি রাখতে

পারবেন না। এতে করে পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ সামন্ত ভূস্বামীদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে করা হলো তার সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার।

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫০ সালে যে ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল, তাতে করে কেউ ৩৩ একরের বেশি জমি রাখার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু আইয়ুব খান এখানে জোতদারদের সমর্থন লাভ করার জন্য সেই জমির সিলিং বাড়িয়ে করলেন ৩০০ বিঘা। যাঁরা এর আগে সিলিং অনুযায়ী বাড়তি জমি সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেইসব জমি আবার তাদেরকে ফেরত দেবার সরকারি ব্যবস্থা করা হলো।

এদিকে আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ‘ইউ-২’ নামক একটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশসীমার ভেতরে গোয়েন্দাগিরি করার সময় তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূপাতিত করে। মার্কিন বিমানটির বৈমানিক স্বীকারোক্তি দেন যে, তাঁর চালিত বিমানটি পাকিস্তানের পেশোয়ার বিমান ঘাঁটি থেকে উড়ে এসেছে। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশেভ কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন আইয়ুব খানের উদ্দেশ্যে। তাঁর ওই হুঁশিয়ারিমূলক ভাষ্যটি প্রায় এ রকমের ছিল—তোমরা যদি এই রকম ষড়যন্ত্রমূলক আর কিছু কর, তাহলে এখান থেকে বোতাম টিপে তোমাদের শায়েস্তা করতে দ্বিধা করব না। ক্রুশেভের এই হুঁশিয়ারি বাক্য শুনে আইয়ুব খান ঘাবড়ে যান। তিনি এর জবাবে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এ ব্যাপারে তারা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ভবিষ্যতে এ ধরনের আর কিছু হবে না।

১৯৫৯ সালে জেনারেল আজম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে আসেন।

কোরিয়ার যুদ্ধ থামার পর পাকিস্তান গভীর অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। এই সময় চালু করা হয় রপ্তানি বোনাস স্কিম। এর ফলে সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক সমাজ ও সাধারণ মানুষ। বিদেশে রপ্তানিকাজে নিয়োজিত এমন শিল্পপতিরাই হন লাভবান। কায়েমি স্বার্থবাদীদের হয় পোয়াবারো।

কেননা, ওই ‘রপ্তানি বোনাস স্কিমের’ অধীনে যেখানে বস্ত্র ও পাটজাত জিনিসপত্রের জন্য শতকরা ২০ ভাগ বোনাস ও অন্যান্য শিল্পজাত জিনিসের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ বোনাসের ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে পাট রপ্তানির জন্য কোনো বোনাসের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এতে করে কৃষকসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এই বোনাস স্কিম যখন প্রবর্তন করা হয়, ভুট্টো তখন আইয়ুবের মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী।

১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ওই বছরই প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পাকিস্তান সফরে আসেন।

এদিকে আইয়ুব খান বাংলা ভাষা রোমান হরফে লেখার কথা বলেন, উর্দু চাপিয়ে দিতে চান না। এতে করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, তিনি যুক্তিবাদী, যান্ত্রিক মানুষ নন। রোমান হরফে বাংলা লেখার কথা উঠলে, পূর্ব পাকিস্তানে তার জোরালো প্রতিবাদ হয়।

'ইউ-২' বিমান ঘটনার পর আইয়ুব খান সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের স্বার্থে ভুট্টোকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠান এবং ভুট্টো সেখানে গিয়ে তেল অনুসন্ধানে সোভিয়েতের সাহায্য কামনা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের ওই আবেদনে যথাযথ সাড়া দেয়।

এদিকে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকলে সাহায্যের আশায় আইয়ুব খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সাফ বলে দেয়, দেশে কোনো সংবিধান চালু এবং জনসাধারণের তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা না হলে, সে পাকিস্তানকে সাহায্য দিতে অপরাগ।

এখানে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। ঘটনাটি এ রকমের। আইয়ুবের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের কিছুদিন আগেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাস্থ্যোদ্ধারের নামে সেখানে যান। প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, তিনি সেখানে গিয়ে মার্কিন সরকারি মহলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের বিদ্যমান সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেন। যার পরিণতিতে মার্কিন সরকার আইয়ুব খানের সঙ্গে সাহায্যের ব্যাপারে ওই রকম জবাব দেয়। আইয়ুব ব্যাপারটা বুঝতে পারেন এবং সোহরাওয়ার্দীর ওপর চটে যান হাড়ে হাড়ে।

আইয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্র'

আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হয়েই গণতন্ত্রের চিরাচরিত প্রথার অঙ্গীভূত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি উচ্ছেদ করে দেশে চালু করলেন এক অদ্ভুত ব্যবস্থা, যার নাম দিলেন 'বেসিক ডেমোক্রেসি' (Basic Democracy) বা 'মৌলিক গণতন্ত্র'। এই তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তি হলো ইউনিয়ন বোর্ড। প্রত্যেক বোর্ডে ১০ জন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করার বিধান হলো। উভয় পাকিস্তানে এই রকম ৪০ হাজার ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী' প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং পরে তাঁরা নির্বাচিত করবেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টসহ প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য। এই ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্রের' চেহারা।

আইয়ুব প্রথমে নিজের রাজনৈতিক দল গঠন করার পক্ষে ছিলেন না। পরে এ রকম একটা কিছু করলে তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করা সহজ হবে মনে করে তিনি করাচিতে মুসলিম লীগের এক কনভেনশন ডাকেন। ওই কনভেনশনে মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। আইয়ুব নির্বাচিত হন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু পুরাতন মুসলিম লীগাররা ওই কনভেনশনে যোগ দেননি। এদিকে মার্শাল ল'র আগে যাঁরা মুসলিম লীগের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন তাঁরা ঢাকায় সমবেত হয়ে ১৯৬২ সালে একটি মিটিং ডাকেন। খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন ওই মিটিং-এর প্রেসিডেন্ট। তাঁরাও ওই মিটিং-এ মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ফলে সৃষ্টি হয় দুটি মুসলিম লীগের। আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের নাম হলো 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' আর খাজা নাজিমউদ্দীনের মুসলিম লীগের নাম হলো 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ'।

১৯৬১, একটি সাক্ষাৎকার

এই সময় একটা খবর চারদিকে প্রচারিত হতে থাকে যে, আইয়ুব খান সংবিধান দিতে যাচ্ছেন।

এ অবস্থায় একদিন 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া 'সংবাদ' সম্পাদক জহুর হুসেন চৌধুরী মারফত আমাদের কাছে খবর পাঠালেন যে, মানিক মিয়া মণি সিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান। আমাদের মনে একটু খটকা লাগে এই ভেবে যে, যে মানিক মিয়া তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও স্থানীয় কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করে থাকেন, তিনি হঠাৎ কী কারণ ও উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান! আমরা বিষয়টি নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীতে আলোচনা করি। আলোচনার পর অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, মানিক মিয়ার সঙ্গে দেখা করাই ভালো। তিনি কী বলতে চান, সেটা জানা দরকার এবং সম্পাদকমণ্ডলীতে এ কথাও হয় যে, আমরা যেহেতু গোপনে, এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে সেহেতু একটা টেকনিক্যাল ব্যবস্থা দরকার। তাই আমরা সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ নির্দিষ্ট করে মানিক মিয়াকে খবর পাঠালাম।

মানিক মিয়া সে অনুযায়ী এক রাত্রে এলেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাঁর সঙ্গে ওই সাক্ষাৎকারে যে আলাপ-আলোচনা হলো, তার মোদ্দা কথা ছিল অনেকটা এ রকমের—আইয়ুব কী ধরনের সংবিধান দেবে, তা আমাদের জানা। নিশ্চিতই সে সংবিধান হবে প্রতিক্রিয়াশীল। এ অবস্থায় আইয়ুব খানের

বিরুদ্ধে একযোগে আন্দোলন করতে না পারলে তার সঙ্গে এঁটে (পেরে) ওঠা যাবে না। মানিক মিয়া আমাদের লক্ষ্য করে আরো বললেন, "আমি অবশ্য আপনাদের আদর্শ সমর্থন করি না। তবে আপনাদের ব্যাপারে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনারা সৎ, দেশপ্রেমিক এবং সংঘবদ্ধ। আমরা এক হয়ে যদি আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি, তাহলে তাঁকে পরাস্ত করা কঠিন হবে না। কাজেই আপনি (আমাকে উদ্দেশ্যে করে বলেন) শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করুন। সকলে মিলে আমরা যাতে আন্দোলন করতে পারি, তার চেষ্টা করুন।" আমি মানিক মিয়ার কথা শুনে তাঁকে বলি যে, "ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে আপনাকে দিন দুয়েকের মধ্যে খবর দেব।"

আমরা যথারীতি এ নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীতে আলোচনা করি এবং আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেই যে, আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করব। সম্পাদকমণ্ডলীতে আরো স্থির হলো, আমাদের মধ্য থেকে মাত্র দুজন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

দিন-ক্ষণ ঠিক করে একদিন শেখ সাহেবের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। এসব আলোচনার সময় আমার সঙ্গে সাধাণত খোকা রায়, কোনো কোনো সময় সালাম ভাই যেতেন। এক পক্ষে থাকতেন শেখ মুজিবুর রহমান ও মানিক মিয়া। অপরপক্ষে আমি ও খোকা রায় (অধিকাংশ সময়)।

বিরতি দিয়ে দিয়ে আমাদের মধ্যে এই রকম বেশকিছু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনা বৈঠকের এক পর্যায়ে তাঁদের হাতে আমরা একটা টাইপ করা আন্দোলনের প্রোগ্রাম তুলে দেই। শেখ সাহেব ও মানিক মিয়াকে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করি যে, সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে জনগণের প্রধান শত্রু। আইয়ুব খান সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল।

এ রকম আলাপ-আলোচনা ও বেশ কয়েকটি বৈঠকের পর আমরা একমত হলাম যে, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করা হবে। আমি এক পর্যায়ে বলি, একমাত্র ছাত্ররাই প্রকাশ্যে এই আন্দোলন করতে পারে। কেননা শ্রমিক-কৃষক তথা মেহনতি মানুষ এখনো সচেতন আর সংঘবদ্ধ নয়। আমরা আরো বলি, তবে এ আন্দোলন যারা করতে পারে, সেই প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের মধ্যে বিরাট আকারে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই আছে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত যদি অপসারণ করা না যায়, তাহলে আন্দোলন করা সম্ভব হবে না। আমি শেখ সাহেবকে বললাম, আপনি নিজে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের ব্যবস্থা করুন। শেখ সাহেব বললেন, হ্যাঁ আমাদের মধ্যে কমিউনিস্টবিরোধী আছে। ঠিক আছে, আমি ব্যাপারটা নিরসনের চেষ্টা করব।

আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে সাব্যস্ত হলো, আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি লাখ খানেক ইশতেহার বিলি করবে। ওই ইশতেহারে সামরিক শাসনের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ২১ দফা কর্মসূচি মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার, শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের জরুরি দাবি-দাওয়া আদায়ের কথা থাকবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তও হলো, ওইসব দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতেই ১৯৬২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করা হবে।

আমাদের ওই রকম বৈঠকের শেষদিন আমি শেখ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আন্দোলনের কথা হচ্ছে, কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সাহেব কোথায়? শেখ সাহেব উত্তরে বললেন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের দাবি নিয়ে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন গড়ে ওঠে, সে কারণে তিনি সেখানে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা-কর্মীদেরও স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

শেষদিনের ওই বৈঠকেই আমি শেখ সাহেবকে আরো বলি, আন্দোলন শুরু হলেই তো আপনাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলবে। কাজেই আপনার আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া উচিত। শেখ সাহেব বললেন, "আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার কায়দা তো আমি জানি না।" আমি আরো বললাম, "আপনার এত লোকজন, আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে আপনার চিন্তা কী!" তিনি আমার কথায় সম্মত হলেন। অবশ্য ওই বৈঠকেই তিনি আমাদের বললেন, "বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য আমি মেনে নিলাম। সবই ঠিক আছে। তবে এই সঙ্গে আমার একটা কথা, আমি স্বাধীন পূর্ববাংলার স্লোগান দেব।"

আমি শেখ মুজিবের বক্তব্য শুনে তাঁকে বললাম, "আমাদের পার্টি মনে করে, পাকিস্তান একটা কৃত্রিম রাষ্ট্র। এটা টিকতে পারে না। ভেঙে যাবে। কিন্তু তার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার। জনগণের কেউ কিছু জানে না অথচ স্বাধীন পূর্ববাংলার স্লোগান ওঠালাম, তাতে করে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আমাদের আন্দোলনকে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা আখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে ভুল বোঝাতে সক্ষম হবে এবং প্রচণ্ড দমননীতির মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করার প্রয়াস পাবে। এখনো স্বাধীন পূর্ববাংলা কায়েম করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। অবস্থা পরিপক্ক হলেই কেবল ওই রকম আওয়াজ তোলা ঠিক হবে। এখন এমন একটা কিছু করা হবে আত্মঘাতী কাজের শামিল।"

শেখ সাহেব আমার কথা শুনে বললেন, "আপনার 'থিওরি' মানতে পারলাম না। তবে আপনার পরামর্শ আপাতত মানলাম। আমি এ আওয়াজ এখন তুলব না।"

আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ছাত্রদের নেতা ছিলেন মোহাম্মদ ফরহাদ।

তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা ও তাঁর পরিচালনা করার ব্যাপারে পার্টির তরফ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যাতে এই আন্দোলনে শরিক হয়ে যৌথভাবে কাজ করে যায়, সে ব্যাপারেও তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো। এও বলা হলো, দুই ছাত্র সংগঠন একমত হলে, আন্দোলনের কাজে তারা অগ্রসর হয়ে যাবে, পার্টির নির্দেশের অপেক্ষা যেন না করে।

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী সাহেব করাচিতে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর গ্রেপ্তারের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানে, বিশেষত এখানকার ছাত্রসমাজে মধ্যে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকাসহ সারাদেশ তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। এই অবস্থায় ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। আইয়ুবের ঢাকায় আগমনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগসহ সব ছাত্র সংগঠন একত্রে আলোচনা করতে বসে। অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সবই ছিল দক্ষিণপন্থী। তাঁরা বলে, আমরা কিছুই জানি না। তাঁরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার চাইতে পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়ার ভেতরেই তাদের কার্যক্রম সীমিত রাখার ব্যাপারে মনোভাব প্রকাশ করে। এদের এ জাতীয় ভাবসাব দেখে ফরহাদ ওই সভাস্থল ত্যাগ করে ছাত্র লীগ নেতাদের ডেকে বলেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেব তোমাদের নেতা। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। কাজেই বিলম্ব না করে আগামী কালকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করে আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়া উচিত হবে। অবশেষে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা রাত জেগে হাতে লেখা পোস্টার তৈরি করা হলো, প্রচারপত্র ইত্যাদি করা হলো এবং পরদিন থেকে যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়ে গেল ছাত্রদের ধর্মঘট। ছাত্রদের এই ধর্মঘট আন্দোলন খুবই জঙ্গিরূপ ধারণ করে। তাঁরা আইয়ুব খানের ছবি যেখানেই পায়, টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় বের করে জঙ্গি মিছিল। মিছিল করে যাওয়ার সময় ফুটপাতের দোকানপাট, অফিস, আদালত থেকে তারা টেনে নামিয়ে ফেলে আইয়ুব খানের ছবি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝাঁটা ও জুতোর মালা ঝোলানো আইয়ুবের প্রতিকৃতি বহন করেও মিছিল করা হয়। এই আন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় খুবই সাহসের সঙ্গে। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানে তখনো বলবৎ ছিল সামরিক আইন।

শুধু ঢাকা শহরেই নয়, প্রদেশের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও থানা শহরেও এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে আমাদের পার্টির তরফ থেকে মোহাম্মদ ফরহাদ অসম্ভব সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন।

সামরিক বাহিনীর জেল, জুলুম, গুলি ও কাঁদানে গ্যাস উপেক্ষা করে অবশেষে এই আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষও সহানুভূতিশীল হয়ে এতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বহু ক্ষেত্রে তাঁরা সাহসেরও পরিচয় দেন।

আইয়ুবের যাবতীয় শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই প্রথম প্রতিবাদী আন্দোলন চার মাস স্থায়ী ছিল। বীর ছাত্ররাই প্রথম আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জনসাধারণের মধ্যে এই ভরসা এনে দিল যে, আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। আইয়ুব যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাঁরও পতন ঘটানো সম্ভব।

যা হোক, সোহরাওয়ার্দী সাহেব ৬ মাস ২০ দিন পর আটকাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৬২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আসেন। তাঁর আগমনে পূর্ব পাকিস্তানে খুশির জোয়ার বয়ে যায় এবং তাঁকে অভূতপূর্ব গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আমাদের পার্টি বে-আইনি থাকলেও এই সময় ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে আইয়ুববিরোধী সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের একটি ঐক্য মোর্চা গঠনের নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এই প্রচেষ্টার পরোক্ষ পরিণতিতেই গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে 'কপ' অর্থাৎ 'কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি' (Combined Opposition Party)।

১৯৬২ সালের ২৫ জুন নয়টি রাজনৈতিক দলের একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ওই বিবৃতিতে দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র কায়েম করার দাবি উত্থাপন করা হয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বেশ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এই বিবৃতি। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী ওই নয়টি রাজনৈতিক দলেরই সমন্বয়ে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে 'কপ'। 'কপ'-এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই নয়টি দলের পক্ষে বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন, তাঁরা ছিলেন আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ), আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক ও ইউসুফ আলী চৌধুরী (কৃষক-শ্রমিক পার্টি), পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া (নেজামে ইসলাম), নুরুল আমিন (মুসলিম লীগ) এবং মাহমুদ আলী (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)।

এই সময় অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে দেশজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন ঢাকায় ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ফজলুল হক সাহেব। তাঁর জানাযায় লাখো মানুষের সমাবেশ হয়। তাঁকে রমনা রেসকোর্সের দক্ষিণে কবর দেওয়া হয়।

কিছুদিন বিরতির পর পুনরায় অর্থাৎ ’৬২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আবার ছাত্র আন্দোলন জেগে ওঠে। এবার ছাত্রদের আন্দোলনের মূল ব্যাপার হয় সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি অর্থাৎ ‘হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন’ বাতিলের দাবি। এ ক্ষেত্রেও পার্টির বিশেষ ভূমিকা ছিল। পার্টি বে-আইনি থাকলেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল তার ছাত্র ফ্রন্ট ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে। হামুদুর রহমানের শিক্ষা কমিশন নিয়ে ছাত্র সমাজের এবারকার আন্দোলন আগেরবারের চাইতেও জঙ্গি রূপ ধারণ করে। ফলে ছাত্র সমাজের অনগ্রসর অংশ, যারা ফেব্রুয়ারি-মার্চের আন্দোলনে অংশ নেয়নি, তারাও অংশগ্রহণ করে এবারকার এই নতুন আন্দোলনে। ফলে সেপ্টেম্বরের ছাত্র আন্দোলন ধারণ করে আরো জঙ্গি রূপ।

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিলের আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন যেসব ছাত্রনেতা ও সংগঠন, তারা ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সারা প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে বসে। ফলে ছাত্রদের আন্দোলনের এই আহ্বানে আইয়ুবের অপশাসনে শোষিত শ্রমিকদের ভেতরেও জাগরণের ঢেউ জাগে। তাই ধর্মঘটের ওইদিন ঢাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা সত্ত্বেও ছাত্র-জনতার যে বিরাট জঙ্গি মিছিল হয়, সেই মিছিল-শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন টঙ্গী, তেজগাঁও ও ডেমরা অঞ্চলের বহু শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ। চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলের বহু শ্রমিকও ১৭ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে যোগ দেন। এইভাবে সারাদেশে ওই ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয়। আইয়ুবশাহির বিরুদ্ধে ছাত্র ও শ্রমিকদের এক অপূর্ব ঐক্য গড়ে ওঠে। সেদিনই টঙ্গীতে শ্রমিক-মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে সুন্দর আলি নামে একজন শ্রমিক নিহত হন। সুন্দর আলিসহ ’৬২-র ছাত্র আন্দোলনে কয়েকজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করার জন্য সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে বিচারক ইদ্রিসকে চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার, ওই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কোনোদিনই জনসমক্ষে প্রচার করা হয়নি।

দেশের রাজনীতিতে এই সময় আরো একটি উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা ঘটে। সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে ’৬২ সালের ৫ অক্টোবর তারিখে গঠিত হয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। রাজনৈতিক ঘোষণা ও কর্মসূচিতে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের পার্টির আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য কিছু কর্মসূচিও তাদের ছিল। তাই, আমরা এনডিএফ গঠনের ব্যাপারটিকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা উৎসাহব্যঞ্জক রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে গণ্য করতে দ্বিধা করিনি।

যাই হোক, ’৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন ছিল আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পরে প্রথম গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনে আমাদের পার্টির কর্মীরা যে ছাত্র

সংগঠনে কাজ করেন, সেই ছাত্র ইউনিয়ন অন্যান্য গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'৬২-এর এই ছাত্র আন্দোলনের ভেতর দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে ছাত্র ইউনিয়নের এমন কয়েকজন উদ্যোগী, সাহসী ও বিচক্ষণ নেতা বেরিয়ে আসনে, যাঁরা দ্রুতই আমাদের পার্টির সভ্য হয়ে পার্টির দৈনন্দিন কাজেও অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তাঁরাই হয়ে ওঠেন কমিউনিস্ট পার্টির 'নতুন প্রজন্ম'। কমিউনিস্ট পার্টির এই 'নতুন প্রজন্ম' পুরো ষাটের দশকসহ '৭০ ও '৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বাংলাদেশ আমলের বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের সে ভূমিকা এখনো অব্যাহত।

'৬২ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বলে আইয়ুব খান দেশের জন্য এক নতুন সংবিধান চালু করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তি আইয়ুবের ওই প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধান অগ্রাহ্য করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও এর বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছিল প্রতিবাদ।

আইয়ুবের সংবিধান ঘোষিত হবার পর ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় পরিষদ ও মে মাসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের যে প্রহসন করা হয়েছিল, বলা বাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিসহ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব গণতান্ত্রিক শক্তি ওইসব নির্বাচন বয়কট করতে দ্বিধা করেনি। ওইসব নির্বাচনী প্রহসনের পর ১৯৬২ সালের ৮ জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে তথাকথিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসেছিল। আর সেদিনই উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল দেশ থেকে সামরিক আইন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সামরিক আইন উঠে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সব রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনকে প্রকাশ্যে কাজ করার অধিকার বা অনুমতি দেওয়া হলেও, একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিকে তার স্বাভাবিক কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি থেকে যায়।

১৯৬৩ সাল

এদিকে আরেকটি ঘটনা ঘটে। যে ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক মহলে কিছুটা বিস্ময়ের সূচনা করে। ১৯৬৩ সালে মাওলানা ভাসানী রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করেন। আইয়ুব তাঁকে সাদরে অর্ভ্যথনা জানান। মাওলানা সাহেব আইয়ুবকে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, "তিনি সোহরাওয়ার্দী ও এনডিএফ (জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট)-এর বিরুদ্ধে কাজ করবেন।" এই ঘটনার পরপরই মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি সরকারি প্রতিনিধি দল পিকিং সফরে যায়। তাঁর পিকিং রওয়ানা হওয়ার তারিখটি ছিল ১৯৬৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর।

এই বছরেরই ১৯ মার্চ তারিখে সোহরাওয়ার্দী সাহেব অসুস্থ বোধ করায় চিকিৎসার জন্য বৈরুত রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু সুস্থ নীরোগ দেহে তাঁর আর দেশে ফেরা হলো না। ৫ ডিসেম্বর (১৯৬৩) খবর পাওয়া গেল, তিনি বৈরুতের এক হোটেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ঢাকাসহ সারা প্রদেশে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ৭ ডিসেম্বর করাচি হয়ে তাঁর মরদেহ ঢাকায় এসে পৌঁছয়। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে তাঁর জানাজা শেষে শের-ই-বাংলার মাজারের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিলেন না সত্যি, কিন্তু পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবদ্দশায় তিনি নিয়োগ করেছিলেন তাঁর সর্বশক্তি।

১৯৫৭ সালের ১২ পার্টি ও ১৯৬০ সালের ৮১ পার্টির আন্তর্জাতিক দলিল

এখানে আমি উপরে উল্লিখিত দলিল দুটির বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করতে চাই। ১৯৫৭ সালের ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে ১২টি সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যে ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল, তাই

'১২ পার্টি ঘোষণা' নামে পরিচিত। সম্মেলনে উপস্থিত ১২টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে চীনের পার্টির নেতা মাও সে তুঙও ছিলেন। তিনিও স্বাক্ষর করেছিলেন ওই দলিলে।

'১২ পার্টির দলিল' ছিল নিম্নরূপ :

আমাদের যুগ হচ্ছে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। এই যুগের সূচনা ঘটেছে রাশিয়ায় মহান অক্টোবর বিপ্লবের ভেতর দিয়ে। আজ পৃথিবীর সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৯৫ কোটির বেশি মানুষ গ্রহণ করেছে সমাজতন্ত্রের পথ এবং সৃষ্টি করেছে নতুন জীবনের এক ধারা। দাসত্ব-শৃঙ্খল আবদ্ধ উপনিবেশভুক্ত দেশসমূহের জনসাধারণ তীব্রতর করে তুলছে তাদের মুক্তির সংগ্রামকে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত অবনতির কারণ ঘটিয়ে চলেছে।

আমাদের এই যুগে দুনিয়ার অগ্রগতি দুটি বিপরীতমুখী সমাজব্যবস্থার ভেতর প্রতিযোগিতার ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ৪০ বছর সময়ের মধ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক থেকে ধনতন্ত্রের চেয়ে সমাজতন্ত্র অনেক উন্নত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মেহনতি মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ভোগ করে থাকেন। সমাজতন্ত্র যতই উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদের অবনতি ঘটছে ততই বেশি করে। উপনিবেশবাদের ভাঙনের ফলে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। মেহনতি মানুষের মূল স্বার্থ নিহিত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে সমর্থন করার ভেতরে। এরা পৃথিবীতে শান্তি ও সমাজতান্ত্রিক উন্নতির জন্য কাজ করে।

... লেনিন বলেছেন, জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করলে সর্বহারার পার্টি বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্যুত হবে এবং জনসাধারণের কাছ থেকেও বিচ্যুত হবে। ফলে সমাজতন্ত্রের গঠন কাজে ক্ষতি হবে। পক্ষান্তরে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখলে উদ্দেশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হঠকারিতা যেমন ক্ষতিকর, ক্ষতিকর তেমনি শোধনবাদও। একথা উল্লেখ করে দলিলে শোধনবাদ অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে মূল বিপদ বলে উল্লেখ করা হয়। আবার কোনো কোনো দেশে হঠকারিতাও মূল বিপদ হতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলোই সিদ্ধান্ত নেবে, কোন্ কোন্ বিচ্যুতি তাদের স্ব স্ব দেশে প্রধান।

ওই '১২ পার্টি দলিল'-এর একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ :

আজ কতগুলো ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকশ্রেণি তার অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বে অন্যান্য পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, তাহলে গৃহযুদ্ধ ছাড়াই তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভবপর হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য ও একনিষ্ঠতা হচ্ছে সার্বভৌম ও স্বাধীনতা রক্ষার বিশ্বস্ত গ্যারান্টি।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণির পার্টিগুলো সব দেশের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক স্বার্থের বিশ্বস্ত রক্ষাকারী।...

বহু দেশের শ্রমিকশ্রেণি ও জনসাধারণ তাদের ঔপনিবেশিক অত্যাচার থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্তবাদবিরোধী ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট। ওই ফ্রন্টে শ্রমিক, কৃষক, শহরের পেটি বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া এবং অন্য সব দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

এই সভার যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে এই মত পোষণ করেন যে, সব বাধা অতিক্রম করে দ্রুততার সঙ্গে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বৃহৎ বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে মস্কোতে দুনিয়ার ৮১টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে কমরেড চৌ এন লাই উপস্থিত থেকে ওই সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিলেন। আমাদের পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমরেড নেপাল নাগ। তিনিও ওই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিলেন। তবে চীনের কমিউনিস্ট প্রতিনিধি ঘোষণাটিতে সই করলেও স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি এই ঘোষণার সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধের কথা প্রকাশ করেন। এরপর থেকেই সোভিয়েত ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়।

আজ এ কথা সকলের কাছেই সুবিদিত যে, চীনের পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিসমূহ থেকে কতখানি দূরে সরে গেছে। আজ চীনের প্রধান শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নয়, তার সেই শত্রু হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চীনের গাঁটছড়া বাঁধার বিষয়টিও আজ ভেবে দেখার বিষয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যেমন চিলির পিনোচেটের (পিনোশে) মতো একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচারী সরকারকে পর্যন্ত চীন স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রতি চীনের সাহায্য-সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করবার মতো। এই হচ্ছে মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র ও চেহারা।

অগ্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই চলে আসছে। আজও সে দ্বন্দ্ব অব্যাহত। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার এই দ্বন্দ্বে প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়ত পরাজিত হচ্ছে, জয়লাভ করছে প্রগতি। বিশ্ববিকাশের এটাই নিয়ম।

যাইহোক, ৮১ পার্টি দলিলের বিশেষ বিশেষ অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। ভাষ্যটি নিম্নরূপ :

১. কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহ সর্বসম্মতভাবে ১৯৫৭ সালে গৃহীত ঘোষণা ও শান্তি কর্মসূচির প্রতি এর আনুগত্যের কথা পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করছে। সৃজনশীল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দলিলসমূহ আমাদের কালের সব থেকে গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলোর প্রতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মৌলিক অবস্থানকে চিহ্নিত করছে এবং সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সংগ্রামে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে রেখেছে প্রকৃত অবদান। এসবই সমগ্র আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পতাকা ও কর্ম-নির্দেশিকারূপে বিদ্যমান।

২. বর্তমানে কতিপয় পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণি যদি এর অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বে শ্রমিক ও গণফ্রন্ট কিংবা অধিকাংশ মানুষকে সমবেত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দল ও গণসংগঠনগুলোর সঙ্গে অন্য কোনো ধরনের সমঝোতা এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারে, তা হলে গৃহযুদ্ধ ছাড়াই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব হতে পারে। এবং উৎপাদনের মৌলিক উপকরণগুলো নিশ্চিতভাবে তুলে দিতে পারে জনগণের হাতে।

   সুগভীর সামাজিক সংস্কার সম্পন্ন, শান্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবল একচেটিয়া পুঁজি ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষক সমাজসহ শহরের মধ্যস্তরের জনগণের শ্রেণিসংগ্রামের ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ভেতর দিয়েই।

   জনগণের বিরুদ্ধে শোষক শ্রেণিগুলোর আক্রমণাত্মক ব্যবস্থার মুখে অ-শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়টিও মনে রাখতে হবে। লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দেয় এবং অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, শাসক শ্রেণিগুলো কখনই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। কোন পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা, সেটা একটি দেশের বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার ওপরই নির্ভরশীল।

৩. ইউরোপ ও এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রোধ করার শক্তি সাম্রাজ্যবাদের নেই। সমাজতন্ত্র এক বিশ্ব-সমাজব্যবস্থায় পরিণত

হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক আর্থ-ব্যবস্থার অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদ ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

৪. লেনিন বলেছেন, যেসব দেশে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হয়েছে, সেইসব দেশ তাদের অর্থনৈতিক বিনির্মাণ কাজের দ্বারা বিশ্বের বিপ্লবের অগ্রগতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে।

৫. ধনবাদী অর্থনীতির স্থবিরতা বেড়ে চলেছে। কোনো কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন কিছু বাড়লেও, ধনবাদী দ্বন্দ্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রকট রূপ ধারণ করে চলেছে।

৬. যেসব দেশ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে, ঔপনিবেশিক জোয়াল থেকে মুক্ত হয়েছে, তাঁরা সফলতার সঙ্গে তাঁদের কাজ সম্পন্ন করতে পারবে না, যদি না তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের অবশেষসমূহের বিরুদ্ধে একটি দেশপ্রেমিক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলার সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে।

৭. কৃষকদের সমস্যাই হচ্ছে বিভিন্ন দেশের ব্যাপক বড় সমস্যা। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৌলিক কৃষি সংস্কার ছাড়া খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সামন্ততন্ত্রের অবশেষসমূহ কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত করে।

৮. বর্তমান পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক দেশসমূহের জাতীয় বুর্জোয়ারা, যাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের যোগসূত্র নেই তারা বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। তারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লবে শামিল থাকবে। এই অর্থে তারা প্রগতিশীল কিন্তু অস্থিরচিত্ত। যদিও তারা প্রগতিশীল, তবুও তারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্গে সমঝোতাপ্রবণ হয়ে থাকে। এদের এই দ্বৈত প্রকৃতির ফলে যেসব দেশে তারা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে, সেখানে তাদের প্রবণতা-প্রকৃতিও বিভিন্নরূপী হয়ে থাকে। সামাজিক দ্বন্দ্ব যখন বাড়ে, জাতীয় বুর্জোয়ারা তখন বেশি বেশি করে জাতীয় প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতা করার ব্যাপারে ইচ্ছুক হয়ে থাকে।

৯. বর্তমানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেশ এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে অনেক দেশের পক্ষেই স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে ওইসব দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে অবিচলভাবে শক্তিশালী করা, সাম্রাজ্যবাদের সামরিক জোটসহ নিজের দেশেও সামরিক স্থাপনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে সৃষ্টি হবে এমন সব রাষ্ট্র, যারা উপনিবেশবাদ ও

সাম্রাজ্যবাদের মূলধন প্রবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, প্রত্যাখ্যান করবে একনায়কত্ববাদী স্বৈরাচারী ব্যবস্থা, জনগণ ভোগ করবে ব্যাপক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা, করবে কৃষির সংস্কার সাধন, সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন। এইভাবে তারা জাতীয় গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করে দ্রুত সামাজিক অগ্রগতি ও শান্তির কাজে অংশগ্রহণ করবে, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে ও ঔপনিবেশিক জোয়ালগুলোর সম্পূর্ণ অবসানের জন্য সংগ্রাম করবে।

১০. বিশ্বের শক্তির যে ভারসাম্য দাঁড়িয়েছে, তাতে কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক শ্রেণির পার্টির পক্ষে শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১১. প্রত্যেকটি দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি স্বাধীন। তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে বাস্তব অবস্থার বিচারে তাঁদের নীতি নির্ধারণের অধিকারী।

মোনায়েম খানের আবির্ভাব

১৯৬২ সালের জুন মাসে আবদুল মোনায়েম খান নির্বাচিত হন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। তিনি সত্যিকার অর্থেই ছিলেন আইয়ুবের বশংবদ ব্যক্তি।

মোনায়েম খান ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার মুসলিম লীগের তিন নম্বর নেতা। প্রথম নম্বরে নুরুল আমিন, দুই নম্বরে গিয়াসউদ্দিন পাঠান এবং তিন নম্বরে ছিলেন এই মোনায়েম খান। ময়মনসিংহের আইনজীবীদের মধ্যে তার স্থান ছিল উকিল হিসেবে তৃতীয় শ্রেণিতে। আর এ রকমই একজন মানুষ নিযুক্ত হলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে।

মোনায়েম খান ক্ষমতাসীন হয়ে প্রথমেই এই সময়ে উত্তাল ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার কাজে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন এনএসএফ (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন) নামীয় একটি কুখ্যাত ছাত্র সংগঠনকে। এই ছাত্র সংগঠনটির উচ্ছৃঙ্খল ও গুণ্ডা প্রকৃতির ছাত্র নামধারী সদস্যরাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সুখ্যাত অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদকে তাঁর আইয়ুবের স্বৈরশাসনবিরোধী অবস্থানের জন্য প্রহার করে মারাত্মকভাবে আহত করে। মোনায়েম খান তাদের অস্ত্র সজ্জিত করার ব্যবস্থাও করেন। এনএসএফ-কে বুদ্ধিগত পরামর্শ দিতেন মোনায়েম খানের দুই পুত্র। মোনায়েম খানের

অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ঢাকার টিপু সুলতান রোডের নিকটস্থ দৈনিক ‘পয়গাম’ পত্রিকা অফিস ছিল এনএসএফ-এর শলাপরামর্শ করার একটা অন্যতম প্রধান আখড়া। পুলিশের নাকের ডগায় এরা নানা কুকর্ম করে কিংবা সশস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেও, পুলিশ তাদের কিছু বলত না এবং সেটা মোনায়েম খানের পরোক্ষ নির্দেশেই।

মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই ‘পাকিস্তানি সংস্কৃতি’র পক্ষে নতুন করে অভিযান শুরু করেন এবং ‘রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের কবি, তাই তাঁকে বর্জন করতে হবে’—এই জাতীয় ধুয়া তুলে তার অপপ্রয়াস অব্যাহত রাখেন। তার আমলেই গঠিত হয় ‘বিএনআর’ নামক একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রকাশনা সংগঠন, যার মাধ্যমে প্রচুর প্রতিক্রিয়াশীল বই-পত্র প্রকাশ করা হয়, লেখক-কবিদের দেওয়া হয় প্রচুর অর্থকড়ি। তাঁর নির্দেশেই রেডিও-টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার সীমিত করে ফেলা হয়। এমন কি কোনো নারী শিল্পীর কপালে টিপ পরে টেলিভিশনে গান গাওয়াও নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। আমাদের পার্টি একেবারে প্রথম থেকেই মোনায়েম খানের এইসব প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্মের যথাযথ প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছে। পার্টি তখনো বে-আইনি থাকায়, প্রকাশ্যে এই প্রতিবাদ কাজে এগিয়ে আসতে না পারলেও, ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে কখনো বিবৃতি, কখনো-বা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে মোনায়েম খানের আবির্ভাব একটা কলঙ্কতিলকের মতোই ছিল। তিনি এ দেশের জনগণের কতটুকু ঘৃণা কুড়িয়েছিলেন তার ঘৃণ্য কাজকর্মের ভেতর দিয়ে সে কথাও আসবে একটু পরে।

১৯৬৪ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুতেই করাচি থেকে খবর আসে, কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদে রক্ষিত হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মাথার চুল চুরি হয়ে গেছে। এই চুরির ঘটনাকে উপলক্ষ করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বেতার মারফত এক উগ্র হিন্দুবিরোধী ভাষণ দিলেন। তাঁর এই ভাষণ প্রচারিত হওয়ার পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে শুরু হয়ে যায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এই উপলক্ষে কনভেনশন মুসলিম লীগ ও তার সমর্থক ছাত্র সংগঠন

এনএসএফ ৩ জানুয়ারি 'কাশ্মীর দিবস' পালনের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভেতরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তারা ঢাকা শহরে দাঙ্গা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন ও গণতন্ত্রকামী অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কী আশ্চর্যের ব্যাপার, কোথায় কাশ্মীরে কী ঘটেছে, আর তাই নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা পূর্ববাংলায়! কাশ্মীরের ওই পবিত্র চুল চুরির ঘটনার সঙ্গে বাংলার মানুষের কোনো সংযোগই ছিল না। অথচ আইয়ুব সমর্থক কনভেনশন মুসলিম লীগের প্ররোচনায় খুলনায় বিহারি শ্রমিকরা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সূচনা করে। এর ফলে শুধু শ্রমিক এলাকায় নয়, সারা প্রদেশেই ছড়িয়ে পড়ে এই দাঙ্গা। শেষত, হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি এই দাঙ্গা বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গারও রূপ পরিগ্রহ করে।

এই দাঙ্গায় ঢাকা শহরে মৃত্যুবরণ করেন প্রখ্যাত কবি প্রজেশ কুমার রায়। তিনি নিহত হন র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের কাছাকাছি এক গলিতে। ঢাকার নবাবপুর রেলগেটের কাছে নিহত হন সাহিত্যিক মোতাহার হোসেন চৌধুরী। নটর ডেম কলেজের খ্রিস্টান অধ্যাপক নোভাককে হত্যা করা হয় নারায়ণগঞ্জে।

দাঙ্গার ফলে প্রদেশব্যাপী এই রকম প্রাণহানির মুখে দ্রুত এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন দেশের প্রকাশ্য প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল, তাদের নেতৃবৃন্দ, সেই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ। তাঁদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'। আমাদের পার্টি বে-আইনি থাকায় তার পক্ষে এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কাজ করা সম্ভব না হলেও, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সমাজে অন্তর্ভুক্ত আমাদের পার্টির সদস্য, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের মাধ্যমে আমরা ওই সর্বদলীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা চালাই। ফলে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক একটি আবেদনমূলক সম্পাদকীয় স্তম্ভ তখনকার সবগুলো দৈনিকে একযোগে প্রকাশিত হয়। পরে ওই সম্পাদকীয় স্তম্ভটিকে লিফলেট আকারে ছেপে ঢাকা শহরসহ প্রদেশের দাঙ্গাক্রান্ত এলাকাসমূহে বণ্টন করা হয়। ঢাকায় এই প্রচারপত্র বিলি করার কাজে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমাদের পার্টির বেশ কজন প্রকাশ্য সদস্য-সমর্থক নিদারুণ ঝুঁকি ও সাহসের পরিচয় দেন।

এই সময় 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মানিক মিয়া এবং 'সংবাদ' সম্পাদক জহুর হুসেন চৌধুরী গভর্নর মোনায়েম খানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছিলেন, আপনারা দাঙ্গা দমনের কোনো চেষ্টা নিচ্ছেন না। তাই আমরা বাঙালিরা একে দমন করার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করছি।

ওই দুই বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদকের মারমুখো হুমকিতে মোনায়েম খান কতখানি ভয় পেয়েছিলেন, জানি না। তবে এরপর থেকে দাঙ্গার উন্মত্ততায় ধীরে ধীরে ভাটা পড়তে থাকে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই দাঙ্গা বাধানোর পেছনে সরকারই ছিল।

যা হোক, এই দাঙ্গায় শহরে-গ্রামে-গঞ্জে বহু লোক মারা যায়। ভয় পেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু লোক চলে যান ভারতে। তবে প্রতিরোধ কমিটি গড়ে ওঠায় এবং তার কাজকর্ম দ্রুত প্রসারিত হওয়ায় দাঙ্গার বিস্তৃতি আর ঘটে না। সরকার এই সময় হিসাব করে যে, তার তরফ থেকে দাঙ্গার আরো উসকানি দিলে, শেষ পর্যন্ত তা ভয়াবহ বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গায় পরিণত হতে পারে এবং এই হিসাব থেকে সরকারিভাবেও দাঙ্গা প্রতিরোধের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকারের সেই ভূমিকা অনেকটা 'সাপ হয়ে কাটা আর ওঝা হয়ে ঝাড়ার' তুল্য বলেই সেদিন মনে হয়েছিল।

দাঙ্গার এই সময়টায় আমরা সবাই গোপনে। আমাদের গোপন আস্তানাগুলো ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত হওয়ায়, আমাদের কেউ কেউ কারফিউ কবলিত এলাকায়, কেউ কেউ তার বাইরে থেকে যাই। এই সময় রোকেয়া কবির আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমরা তাঁর মোটরগাড়িতে চেপে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় যাই এবং সাধ্যমতো দাঙ্গা প্রতিরোধে সাহায্য করি। কে কোথায় কীভাবে আছেন, তাঁর সেই গাড়িতে চেপে খোঁজ-খবর নিই। দাঙ্গার দুর্বিপাকে পড়া কাউকে কাউকে নিরাপদ স্থানে আমরা নিয়ে আসি তাঁর ওই গাড়িতে করেই। রোকেয়া কবির নিজেও অসম্ভব সাহসী নারী। ওই দাঙ্গার সময় তাঁর ভূমিকা ছিল সত্যিই স্মরণীয়।

এই সময় আরো একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। দাঙ্গার ঢেউ ময়মনসিংহের পাহাড়ি এলাকা হালুয়াঘাটেও এসে লাগে। ফলে দাঙ্গাবাজরা স্থানীয় উপজাতিদের কিছু ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করলে তখনো সেখানে অবশিষ্ট উপজাতিদের অধিকাংশই আসামে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

১৯৬৪ সালের কনভোকেশন

মোনায়েম খান যেহেতু গভর্নর, সেহেতু পদাধিকার বলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও চ্যান্সেলর। কিন্তু কুখ্যাত এই ব্যক্তির প্রতি প্রবল ক্ষোভ জমা ছিল ওই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে। এর মূল কারণ ছিল মোনায়েম খানের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ভূমিকা এবং তার

পৃষ্ঠপোষিত সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন এনএসএফ-এর গুণ্ডামি, খুন-জখম ও নারী ধর্ষণের মতো ঘটনাবলি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কনভোকেশনের দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে। অনুষ্ঠানের তারিখ ছিল ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ। এই তারিখটিকে সামনে রেখেই ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ছাত্র সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মোনায়েম খানের মতো স্বৈরাচারী আইয়ুবের একজন কুখ্যাত দোসরের হাত থেকে তাঁরা সনদপত্র গ্রহণ করবে না। এমন কি এই সিদ্ধান্তও হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন মঞ্চে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

তখন ডাকসুর ভিপি ছিলেন রাশেদ খান মেনন এবং জিএস ছিলেন মতিয়া চৌধুরী। ২২ মার্চ যখন ডাকসুর দপ্তরে বসে সর্বদলীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে কনভোকেশন বয়কটের প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, তখন এনএসএফ-এর গুণ্ডারা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে সর্বদলীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দের মনে কনভোকেশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। ফলে মোনায়েম খান কনভোকেশন স্থলে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রদের সমস্বর স্লোগান ওঠে, "বাঁচতে যদি চাও, মোনেম তুমি ফিরে যাও" ইত্যাদি। মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় পুলিশ ও ছাত্রদের জোর ধস্তাধস্তি। যুদ্ধ লাগার মতো অবস্থা হয়। মোনায়েম খানের আর কনভোকেশন হলে প্রবেশ করা হয় না। কনভোকেশন অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ পণ্ড হয়ে যায়। মোনায়েম খান এই ঘটনার প্রতিশোধ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০০ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে, অনেককে রাস্টিকেট করে, অনেকের ডিগ্রি কেড়ে নিয়ে। আর এর ফলে অনেকের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বিরুদ্ধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে আন্দোলন-শোভাযাত্রা হতে পারে—এই ভয় থেকে প্রদেশের বহু স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শুধু তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কনভোকেশন সংক্রান্ত ঘটনা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে ফলাও করে ছাপার জন্য সরকারের তরফ থেকে 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ' ও 'দৈনিক আজাদ'-এর ওপর শো-কজ করে আন্দোলন সংক্রান্ত সব ধরনের সংবাদ পরিবেশন করা বিষয়েও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর ফলে এক মাস পর্যন্ত এ আন্দোলন সংক্রান্ত খবরাদি পত্র-পত্রিকায় ছাপানো সম্ভব হয়নি। অবশ্য সরকারি এই বিধি-নিষেধকে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করা হলে হাইকোর্ট থেকে যে রায় প্রদান করা হয়, তাতে করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতারই জয় হয়।

১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ২৯ মার্চ দলটির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা করা হলো। রাজনৈতিক মহলে আওয়ামী লীগের এই তৎপরতায় উৎসাহের সঞ্চার হয়।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬৪ সালের সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করা হয় ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস।

এই নির্বাচনকে পাকিস্তানের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রকামী আইয়ুববিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র ভগিনী মিস ফাতেমা জিন্নাহ্কে আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান। এই উপলক্ষে ১৯৬৪ সালের ২১ জুলাই খাজা নাজিমউদ্দীনের বাড়িতে বিরোধী দলগুলোর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে গঠন করা হয় 'কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টিস' সংক্ষেপে 'কপ' নামে বিরোধী রাজনৈতিক জোট। 'কপ'-এ শরিক ছিল প্রধানত আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও কাউন্সিল মুসলিম লীগসহ অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল। অবশ্য মাওলানা ভাসানী 'কপ'-এ যোগ দেননি।

ওই নির্বাচনী ঘোষণায় বলা হয়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক অর্থাৎ মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটে। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন সরাসরি ভোটে নয়।

এখানে উল্লেখ্য, আমাদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি তখনো বে-আইনি থাকায় আমরা এই নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অশংগ্রহণ করি আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) কর্মরত আমাদের সভ্য-সমর্থকদের সহায়তায়। এ ছাড়া আমাদের প্রকাশ্য কমরেডরাও, কমিউনিস্ট হিসেবে যাঁদের পরিচয় পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনের কাছে অজানা ছিল, তাঁরাও যথাসাধ্য কাজ করেন এই নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে আনবার জন্য। কেননা, আমরা প্রাণপণে চাইছিলাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্বৈরাচারী ও একনায়ক আইয়ুবের পরাজয় এবং বিরোধীদলীয় প্রার্থী মিস জিন্নার বিজয়।

যাই হোক, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য, যাঁরা মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত, তাঁদের কাছে সরকারের তরফ থেকে এই মর্মে ভীতি ছড়ানো হলো যে—আইয়ুব খানকে যে ইউনিয়ন বোর্ড ভোট দেবে না, সেই ইউনিয়ন বোর্ডের খরচপাতির হিসাব-নিকাশ বা অডিট করা হবে। এতে ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যরা ভয় পেয়ে গেলেন। কেননা, এতদিন তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব ইউনিয়নের রাস্তা-ঘাট

নির্মাণের নামে 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম'-এর টাকা-পয়সা হরিলুট করে ফুলে-ফেঁপে কলাগাছ হয়ে গিয়েছিলেন। রাতারাতি হয়ে উঠেছিলেন প্রভূত বিত্তশালী। তাই 'অডিটের' কথা শুনে ভয় পেয়ে তাঁরা প্রমাদ গুণলেন। কেননা, তাঁদের আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র করা হলে তাঁদের সকল জারিজুরি মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে। তাই তাঁরা তাঁদের দুর্বলতাজনিত ভীতি থেকে আইয়ুব খানকেই ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করলেন। আইয়ুব খান ওই নির্বাচনে পেয়েছিল শতকরা ৬৩ ভাগ ভোট।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, এই নির্বাচনে মিস জিন্নাহ্‌র পক্ষে বিরাট গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের জাগরণ ছিল অবিস্মরণীয়। নির্বাচনী প্রচারে তিনি এই সময় যেখানেই যেতেন, মানুষজন তাঁর ট্রেন প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে থামিয়ে শুনতে চাইতেন তাঁর বক্তৃতা। যে ট্রেন ঢাকা থেকে সকাল ৮টায় রওয়ানা দিয়ে কোনোখানে দুপুরের মধ্যে পৌঁছার কথা, মিস জিন্নাহ্‌কে বহনকারী সেই ট্রেন প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে এভাবে থামার ফলে গন্তব্য স্থলে পৌঁছত ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চাইতেও বিলম্বে।

আর এ থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোট হলে, মিস জিন্নাহ্‌ অবধারিতভাবে আইয়ুব খানকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন।

আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

কাশ্মীর নিয়ে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

কাশ্মীর নিয়ে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ছিল মূলত সমগ্র পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনমুখর জনগণের দৃষ্টিকে তাদের মূল সমস্যা থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। এই ষড়যন্ত্রে ইন্ধন জুগিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কেননা, এই সময় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী ও আইয়ুবের স্বৈরশাসনবিরোধী জনগণ তথা সর্বস্তরের মেহনতি মানুষ তাদের বাঁচা-মরার দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে উত্তরোত্তর উত্তাল হয়ে উঠছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে এসব আন্দোলনের মধ্য প্রধানত ছিল সুতা ও চটকল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন, রেলওয়ে শ্রমিক লীগের আন্দোলন, ছাত্রদের শিক্ষা দিবসের

আন্দোলন, চট্টগ্রামের শিল্প শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে সেখানকার ‘শ্রমিক ঐক্য পরিষদ’-এর প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আন্দোলন। দিন যতই যাচ্ছিল, ততই বেড়ে চলেছিল এ জাতীয় আন্দোলনের সংখ্যা। তাই আইয়ুব খানের একটা অজুহাত খাড়া করে এইসব আন্দোলন কৌশলে দমন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। সেই অজুহাত তিনি খুঁজে পেলেন কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কৃত্রিমভাবে যুদ্ধ বাধিয়ে।

এই বিশ্লেষণের যুক্তি পাওয়া যেতে লাগল যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর। রেলওয়ে শ্রমিকরা এই যুদ্ধ বাধার আগেই তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘটের আলটিমেটাম দিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালে তারা তাদের সেই আলটিমেটামের কথা কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিলে, তাঁদের তরফ থেকে রেল শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কথা বলা হতো যে, “তোমরা রেল ধর্মঘট করে রেলের চাকা বন্ধ করে দিলে বর্ডারে বর্ডারে সৈন্য যেতে পারবে না। আর সেখানে সৈন্য যেতে না পারলে ভারতীয় সৈন্যরা সহজেই বর্ডার অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেবে। এখন ওসব রাখ।”

একই ধরনের কথা বলা হতো তখন অন্য শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে। তাদেরও বলা হতো, “তোমরা উৎপাদন বন্ধ করলে দেশের সৈনিক-জোয়ানরা রসদ সরবরাহ পাবে কোথা থেকে? বন্ধ কর তোমাদের ধর্মঘট।”

এই যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পোয়াবারো হয়েছিল। কেননা, এই যুদ্ধের অজুহাতে সে পাকিস্তানের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করার সুযোগ লাভ করেছিল। শুধু তাই নয়, এক ঢিলে সে দুই পাখি মেরেছিল এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। এই যুদ্ধে যেমন সে পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করেছিল, তেমনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে স্লোগান ইত্যাদি উঠত, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল মহল থেকে, এই রণ-উন্মাদনার ডামাডোলে তা তলিয়ে গেল। কেননা, এই যুদ্ধের অজুহাতেই আইয়ুব দেশজুড়ে ঘোষণা করলেন জরুরি অবস্থা এবং দেশরক্ষা আইন জারি করে সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করলেন। গ্রেপ্তার করা হলো অসংখ্য প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে।

এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সেটা হলো, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার বিষয়। সেই সংকটের সময়, বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় অরক্ষিতই রাখা হয়। প্রদেশের সীমান্ত এলাকাজুড়ে যে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল, তা শুধু লোক দেখানো ব্যাপারই ছিল না, সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের মোকাবেলায় ছিল নিতান্ত অপ্রতুলও। আর এখানে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন রাজনৈতিক মহলে এই প্রদেশকে

বহিঃআক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য পৃথক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা অথবা সামরিক বাহিনীতে আরো অধিক সংখ্যায় বাঙালি সৈন্য নিয়োগ করার বিষয়টি জরুরি প্রশ্নের আকারে দেখা দেয়।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত যুদ্ধের ভেতর দিয়ে আইয়ুব খান আরো একটি ব্যক্তিগত লক্ষ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন। সেজন্যও তাঁর এই যুদ্ধ বাধানোর প্রয়োজন ছিল। তাঁর এই যুদ্ধ অভিযানের মূলে ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক কারণ ছিল এই যে, কাশ্মীরকে যদি তিনি কোনোভাবে দখল করতে সক্ষম হন, তাহলে সেই কৃতিত্বের গৌরবে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আজীবন নিযুক্ত থাকতে পারবেন। এ ব্যাপারে জুলফিকার আলী ভুট্টোও তাঁকে যুগিয়েছিলেন ইন্ধন।

পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই যেহেতু মুসলমান, সেইহেতু আইয়ুবের ধারণা ছিল, কাশ্মীরের যুদ্ধে তিনি তাদের অনিবার্য সাহায্য লাভ করবেন। আর এইসব চিন্তা থেকেই তিনি যুদ্ধ-পরিকল্পনা করে বসলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একদল পাকিস্তানি সৈন্যকে ছদ্মবেশে পাঠানো হলো কাশ্মীরে। সিদ্ধান্ত ছিল, যুদ্ধ বেধে গেলে ওই সব সৈন্য কাশ্মীরের ভেতর থেকে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে, কিন্তু ব্যাপারটা হিতে বিপরীত ফল বয়ে আনল। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে ছদ্মবেশী পাক সৈন্যরা কোনো রকম সুবিধা করতে পারল না। বরং তাদের অধিকাংশই ধরা পড়ে গেল। কেউ তাদের স্থান দিতে রাজি না হলে তারা আশ্রয় নেয় একটি মসজিদে গিয়ে। আর সেখানেই তারা ধরা পড়ে গেল হাতে-নাতে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান কচ্ছ সীমান্ত আক্রমণ করে বসল। এই স্থানটি অরক্ষিত থাকায় তার পক্ষে সহজেই এটা দখল করে নেওয়া সম্ভব হলো। আর এতে করে তারা এতই উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, তাদের ধারণা হলো, কাশ্মীর দখল এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এই বিজয়ের ব্যাপারটি সরকার এমনভাবে প্রচার করতে থাকে যে, যার ফলে রাজনৈতিকভাবে অসচেতন সাধারণ মানুষ আইয়ুব ও পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর গুণ-কীর্তনে সরগরম হয়ে ওঠেন। যুদ্ধ যে ক্ষতিকর, এতে যে তাদের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই, সে কথা তারা বেমালুম ভুলে বসলেন। রাজনৈতিক সচেতন মানুষ ছাড়া যুদ্ধের মোহাচ্ছন্নতায় তলিয়ে গেল উভয় পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

কিন্তু যুদ্ধের মোড় ঘুরতে শুরু করল কয়েক দিনের ব্যবধানে, বিশেষ করে ৬ সেপ্টেম্বর ভারত যখন আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করে পাকিস্তানের শিয়ালকোট আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণের ঘটনা থেকে যুদ্ধের তীব্রতা

বৃদ্ধি পেল। পাকিস্তানের কাশ্মীর দখল করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ভারতীয় জোয়ানরা লাহোরের কাছাকাছি এসে পৌঁছাল যুদ্ধের তীব্রতায় উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সীমা ছাড়াতে বাধ্য হল। এই অবস্থায় জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট দুপক্ষের প্রতিই যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু কেউ সে আহ্বানে কর্ণপাত করল না। ২০ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি স্থাপনের আবেদন জানানোর পর পরই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন বলে জানালেন। আইয়ুব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁকে সোভিয়েতের প্রস্তাব মতো কাজ করার পরামর্শ দেন। ফলে আইয়ুব সোভিয়েতের মধ্যস্থতা করার আবেদনে সাড়া দিয়ে 'তাশখন্দ বৈঠকে' যোগ দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি বসেন। ১৭ দিন যুদ্ধের পর অবশেষে তাশখন্দ শহরে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় দুদেশের মধ্যে স্থাপিত হলো শান্তি। স্বাক্ষরিত হলো 'তাশখন্দ শান্তি চুক্তি'। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার, ওই চুক্তি স্বাক্ষর করার পর পরই সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৬৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

ভাবা গিয়েছিল, 'তাশখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পাকিস্তানে আবার শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। কিন্তু তা হলো না। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তি চুক্তির ফলে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে দারুণ অসন্তোষ ফেনিয়ে ওঠে। কেননা, এই যুদ্ধে পাঞ্জাব প্রদেশ সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল—জান ও মাল উভয়ের বিচারে। তাই সেখানকার রাজনৈতিক মহল ও জনসাধারণের তরফ থেকে প্রশ্ন উঠল, কিছু না পেয়ে এই যুদ্ধ-বিরতির তাৎপর্য কী? তাহলে যুদ্ধ করা হলো কেন? পাঞ্জাবের অসম্মান হয়েছে এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ইত্যাদি ইত্যাদি। লাহোর ও মুলতানেও এই শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ জাতীয় তৎপরতার জন্য অনেককে করা হয় গ্রেপ্তার। চালানো হয় তাঁদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার। অবশ্য ভুট্টো এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বসলেন। তিনি তাশখন্দ শান্তি চুক্তির বিরোধিতা শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি আইয়ুবের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগও করলেন। আর এর ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পোরা হলো জেলে এবং এই ঘটনার পরিণতিতে তিনি পাঞ্জাবিদের কাছে বীর বলে প্রতিপন্ন হতে লাগলেন। আর যে আইয়ুব খান এই যুদ্ধে বীর হতে চেয়েছিলেন, তিনিই পরিণত হলেন পরাজিত সৈনিকে।

১৯৬৬

'তাশখন্দ চুক্তি' পশ্চিম পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও পূর্ব পাকিস্তানে তাকে স্বাগত জানানো হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পরপরই পাঞ্জাবের দৌলতানা ও জামাত নেতা মাওলানা মওদুদী প্রমুখ সারা পাকিস্তানভিত্তিক একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে বসেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে তিনি তাঁর ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা যদি আমার ৬ দফা সমর্থন কর, তা হলে আমিও আইয়ুববিরোধী সংগ্রামে তোমাদের সঙ্গে থাকব।" তিনি আরো বলেন, "কাশ্মীরের আগে পূর্ববাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ব্যাপারটি তোমাদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে হবে।"

উল্লেখ্য, এই ৬ দফার মূল কথাই ছিল পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্বকারী ৬ দফার অন্তর্ভুক্ত কোনো দাবিই মেনে নিতে সম্মত হলেন না। করাচির এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান আবার তার ৬ দফা তুলে ধরেন। ওই সম্মেলনে তিনি সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেন যে, ১৯৬৫ সালে সংঘটিত ভারতের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের ভেতর দিয়ে এটা ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায় না বা যাবে না। 'তাশখন্দ চুক্তি'কে স্বাগত জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাধান করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলন আইয়ুববিরোধী একটা প্লাটফরম জাতীয় কিছু হলেও, শেখ মুজিব উত্থাপিত ৬ দফা সেখানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে শেখ মুজিব ওই সম্মেলন বয়কট করে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ৬ দফার সমর্থনে শুরু করেন রাজনৈতিক তৎপরতা। এই সময় শেখ মুজিব ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক। এদিকে ৬ দফা জনসমক্ষে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব খান ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বললেন, ৬ দফার প্রতিউত্তর দেওয়া হবে অস্ত্রের ভাষায় এবং গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে।

ঐতিহাসিক ৬ দফা

প্রস্তাব-১

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেলভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে 'লাহোর প্রস্তাব'। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদ নির্বাচিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব-২

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা : দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩

মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে।

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪

রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেল অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর সবরকম করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

ক. ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

খ. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে।

গ. কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোই মিটাবে।

ঘ. অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

ঙ. শাসনতন্ত্রে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬

আঞ্চলিক বাহিনী গঠন ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

এই ছিল ৬ দফা দাবি। এই দাবি নিয়ে প্রচারে নামার পর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে আইয়ুব সরকারের তরফ থেকে প্রচার করা হতে লাগল। শেখ মুজিব তাতে না দমে খুলনা, যশোর ও ময়মনসিংহসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন শহরে শহরে তা প্রচার করতে লাগলেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের মনোভাব যেমন প্রবল হয়ে ওঠে, তেমনি শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকে।

কিন্তু সরকারও বসে থাকে না। ১৯৬৬ সালের ৫ মে নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকরা 'মে দিবস' উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করেন। ওই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে যোগ দেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই সভার পরপরই তাঁকে 'পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে' গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় আওয়ামী লীগের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতা-কর্মীকে। এমন কি আওয়ামী লীগের ছাত্র ফ্রন্ট ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীদেরও। উল্লেখ্য, এই সময় ৬ দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শেখ সাহেবকে বার বার গ্রেপ্তার করা হয় এবং দায়ের করা হয় বিভিন্ন ধরনের মামলা।

যাই হোক, শেখ সাহেব গ্রেপ্তার হওয়ার পর ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬ দফার সমর্থনে ও শেখ সাহেবের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল ও ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এই হরতাল সারা প্রদেশে কার্যত বিরাট সাফল্য লাভ করে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও, টঙ্গীসহ দেশের অন্যান্য স্থানের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা এতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৭ জুনের ওই হরতালে অংশগ্রহণকারী তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক মনু মিয়া গুলিবর্ষণে নিহত হয়েছিলেন।

এই সময় সরকার আওয়ামী লীগের প্রায় এক হাজার সদস্য-সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। 'নিউ নেশন প্রেস' বন্ধ করাসহ 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর প্রকাশনা করেছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষণা। শুধু তাই নয়, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পত্রিকাটির সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকেও। প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকার পর দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় '৬৯-এর প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের মুখে এবং পুনরায় প্রকাশ পেতে থাকে ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা আন্দোলনের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছিল, সাম্প্রদায়িক ও অন্ধ ভারতবিরোধী প্রচারণা দ্বারা পূর্ববাংলার জনগণের জাতীয় অধিকার আদায়ের স্পৃহাকে আপাতত মোহাচ্ছন্ন করে রাখা সম্ভব হলেও, চিরকালের জন্য তা পারা যাবে না।

তবে ৬ দফাকে সেই সময় যেভাবে ‘বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ’ বলে অভিহিত করা হচ্ছিল, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা-সদস্য-সমর্থকদের তরফ থেকে, আমাদের পার্টি তা মনে করেনি। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পক্ষে ৬ দফা যেহেতু একটি উপযুক্ত কর্মসূচি ছিল, সেহেতু আমরা তাকে সমর্থন দিয়েছিলাম। তারপরও আমরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলাম যে, ৬ দফায় যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটগুলোর সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কছেদের, আমূল ভূমি সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি তুলে দেবার, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি ও মাহিনার গ্যারান্টিযুক্ত দফা বা দাবি বাস্তবায়নের কর্মসূচি নেই, তাই ৬ দফা ‘বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ’ হতে পারে না। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে বাঙালি জাতির আংশিক অধিকার অর্জিত হবে, এর বেশি কিছু নয়। তাই আমাদের পার্টি ৬ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন-সংগ্রামকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করলেও, একে ‘বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ’ বলে অভিহিত করেনি।

আমরা পত্রিকা মারফত ৬ দফার ব্যাপারে আমাদের এই অবস্থানের কথা প্রচার করেছিলাম এবং সেটা সেইকালের পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মহলে যুক্তিযুক্ত মতামত বলে সমাদৃতও হয়েছিল।

১৯৬৫, ছাত্র ইউনিয়নের বিভক্তি

ছাত্র ইউনিয়ন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ফ্রন্ট। এই ছাত্র ফ্রন্টে কাজ করতেন আমাদের পার্টির ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সদস্য-সমর্থকরা। যদিও তাঁদের মূল কাজ ছিল ছাত্রদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করা।

কিন্তু গোপন কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনের অনুসরণ ও দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্দোলনগত কৌশল ইত্যাদির প্রশ্নে শুরু হলো নানা রকম তর্ক-বিতর্ক এবং সেই তর্ক-বিতর্ক থেকে মতভেদ-মতান্তর যখন প্রকট রূপ ধারণ করল, তখন তারই ঢেউ লাগে প্রথমে ছাত্র ইউনিয়নের পার্টি সংশ্লিষ্ট নেতৃপর্যায়ে এবং অচিরেই সেটা সম্প্রসারিত হয় সংগঠনটির সাধারণ কর্মী-সদস্য পর্যায়েও। এই ব্যাপারটা আরো প্রকট রূপ ধারণ করে আওয়ামী লীগের ৬ দফার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই সময় মূল পার্টি নেতৃত্বের একটি অংশ ৬ দফা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেও যখন একে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন

করে, তখন পার্টি নেতৃত্বের অপর অংশটি, যাঁরা ওই আন্দোলনের পূর্বাপর বিরোধী ছিলেন, তাঁদের প্রভাবে ছাত্র ইউনিয়নেরও নেতৃত্বের একটি অংশ একে ‘ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়াদের আন্দোলন’, ‘সাম্রাজ্যবাদ প্ররোচিত আন্দোলন’ বলে প্রচার করতে থাকে, ৬ দফাকে সমর্থন করা তো দূরের কথা। আগেই বলেছি, মূল পার্টি নেতৃত্বের একটি সংখ্যালগিষ্ঠ অংশ বেশ কিছুদিন থেকে ‘মাওবাদী’ বা চীনের ‘সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্ব’ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মার্কস ও লেনিনীয় তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশের নীতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করে বা পাশ কাটিয়ে যান্ত্রিক কমিউনিস্টে পরিণত হন। ফলে তাঁরা সর্বত্র বা যত্রতত্র সশস্ত্র বিপ্লব করার মওকা খুঁজে বেড়াতে থাকেন এবং আমাদেরকে ‘সংশোধনবাদী’ বা ‘শোধনবাদী’ লাইনের অনুসারী বলে প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের কাছে ‘শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের’ সম্ভাবনা, দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া ও প্রগতিশীলদের সক্রিয় অংশগ্রহণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ‘বিপ্লব বিচ্যুত’ ও ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ কাজ বলে মনে হতে থাকে।

ফলে ছাত্র ইউনিয়ন অচিরকালের (অল্পদিনের) মধ্যে দুটি স্পষ্ট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। চলতে থাকে নানা টানা-হেঁচড়া, সংগঠনের আদর্শ পরিপন্থী নানা বিশৃঙ্খলা, কোন্দল ও পাল্টাপাল্টি ব্যবস্থা। এইসব বিশৃঙ্খলা ও কোন্দল দূর করার জন্য পার্টির তরফ থেকে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না।

এই সময় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক মতিয়া চৌধুরী। পার্টির অভ্যন্তরীণ নীতিগত ও অন্যান্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এই পর্যায়ে রাশেদ খান মেননের প্রবল মানসিক সম্পৃক্তি ছিল ‘মাওবাদী’ অংশের প্রতি।

শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙে দু টুকরো হয়ে যায়। এক গ্রুপ পরিচিত হয় ‘মেনন গ্রুপ’ বলে এবং অপর গ্রুপ পরিচিতি লাভ করে ‘মতিয়া গ্রুপ’ বলে।

১৯৬৬, পার্টির বিভক্তি

কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সভ্য মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। এঁরা দুজনই ছিলেন চীনপন্থী রাজনীতির অনুসারী। অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিলেন এঁদের বিরোধী। এঁদের দুজনের লিখিত দলিল ও কেন্দ্রীয় কমিটির অবশিষ্ট সভ্যের লিখিত দলিলও পার্টির ভেতরে

প্রচার করা হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক ওই দুটি পৃথক দলিলেই দেশের সেই সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে আন্দোলনের কৌশলগত বিষয় ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছিল।

যাই হোক, পার্টি ভাগাভাগির আগে আমরা আমাদের চীনাপন্থী ওই দুই কমরেডকে বলেছিলাম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন ও মস্কোর মধ্যে নীতি ও কৌশলগত নানা মতভেদ বা বিরোধ থাকতেই পারে। বৃহৎ দুই পার্টির মধ্যে সমঝোতা না হলে এইসব মতবিরোধ আমরা দূর করতে পারব না। আসুন আমরা জাতীয় ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাই। পার্টি ভাঙলে আমরা দুর্বল হব। প্রতিক্রিয়াশীলরা শক্তিশালী হবে। তার জবাবে কমরেড তোয়াহা ও কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেহেতু মতবিরোধ চলছে, সেহেতু জাতীয় ক্ষেত্রেও মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। কাজেই এর একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

এই অবস্থায় পার্টির কর্তব্য নির্ধারণ এবং এরই মধ্যে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দূর করার লক্ষ্যে পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্লেনারি বৈঠক ডাকে। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ সারা প্রদেশের মোট ৩০/৩২ জন নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মী উপস্থিত ছিলেন, নানা রকম ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও।

বৈঠকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভেতরকার মতাদর্শগত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে দেখা গেল, সে এক সীমাহীন বিতর্কের বিষয়। সহজেই শেষ হবার নয়। তাই জোর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, কী করে পার্টির ভেতর বিরাজিত বিশৃঙ্খলা দ্রুত দূর করা যায়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়। ওই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্বীকৃত শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী পার্টির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে লেনিনবাদী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পালন করা আমাদের পার্টির প্রত্যেক সভ্য ও কর্মীর অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কেননা, চীনাপন্থীদের মনোভাব পার্টিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার অনুকূলে ছিল না, এমন কি তাঁদের কর্মতৎপরতাও। তাই তাঁরা পার্টির 'কেন্দ্রিকতার নীতি' সংক্রান্ত ওই প্রস্তাব উপেক্ষা করলেন। মানতে রাজি হলেন না। ফলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হলো। ১৯৬৬ সালের ২০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পার্টির বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়েছিল ওই প্রস্তাব।

এরপর চীনাপন্থীরা দলছুট হয়ে তাদের নিজেদের পার্টি গঠন করেন। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি কার্যত বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও চীনাপন্থীদের সংখ্যা ছিল কম। পার্টি বিভক্তির সময় তাদের

স্লোগান ছিল, "আমরা আর সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে থাকব না" ইত্যাদি। এই সময় আমরা সুখেন্দু দস্তিদারকে বলেছিলাম, "আপনারা পার্টি ছেড়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে। কিন্তু আপনারা যে পার্টি গড়তে যাচ্ছেন, তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।" পরে অক্ষরে অক্ষরে তা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, সুখেন্দু দস্তিদার আজ আর বেঁচে নেই।

পার্টি সত্যিই ভাগ হয়ে গেল। এরপর আমরা পার্টি বিভক্তি-পরবর্তী ঘটনাবলি অনুসরণ করতে থাকি। দেখা গেল, মোহাম্মদ তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার ও আবদুল হক শরণাপন্ন হয়েছেন মশিউর রহমান যাদু মিয়ার। ব্যাপারটা আর কিছুই না, যাদু মিয়ার মারফত সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করে তাঁদের ওপর জারিকৃত হুলিয়া তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে তাঁদের সুবিধাও ছিল। কেননা, এ সময় পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফার চলমান আন্দোলনের তাঁরা বিরোধিতা করছিলেন। তাঁদের মতে, ৬ দফা ছিল সিআইএর দলিল। কাজেই সিআইএ যে আন্দোলনে মদদ যোগাচ্ছে, তার বিরোধিতা করা হক-তোয়াহাদের কাছে একটা বিরাট বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। তাই তাঁরা যাদু মিয়াকে ধরে বসলেন, তিনি যেন মাওলানা ভাসানীকে বলে-কয়ে তাঁদের হুলিয়া তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। কেননা, মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে আইয়ুব খানের দহরম-মরমের কথা তখন আর গোপন কোনো ব্যাপার নয়, একটা উন্মুক্ত সত্য। এদিকে এ সময় আইয়ুব খান এবং তাঁর সরকার পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী ৬ দফা বিরোধী প্রচার কীভাবে জোরদার করা যায়, তার জন্য ছিলেন ভয়ানকভাবে উৎসুক। কাজেই তোয়াহা ও আবদুল হক প্রমুখ ৬ দফাবিরোধী নেতৃবৃন্দের হুলিয়া থেকে প্রকাশ্যে আসার ব্যাপারটি সহজ হয়ে গেল। মাওলানা ভাসানীর মাধ্যমেই সরকারের কাছে তাঁদের নাম যায় এবং অচিরকালের (অল্পদিনের) মধ্যে তুলে নেওয়া হয় তাদের হুলিয়া।

হুলিয়া যখন উঠতে যাচ্ছে এবং এ রকম কথা বেশ জোরেশোরেই শোনা যাচ্ছে, তখন একদিন রাত্রে আমাদের কাছে বিদায় নিতে এলেন কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার। আমি আর সালাম ভাই তখন উপস্থিত ছিলাম। এসেই তিনি কথাচ্ছলে বললেন, "প্রকাশ্য হতে যাচ্ছি। আমার ওপর থেকেও হুলিয়া উঠে যাচ্ছে।" আমরা দুজনেই তাঁকে বললাম, "এই সরকার শুধু প্রতিক্রিয়াশীলই নয়, ঘোর সাম্প্রদায়িকও। কাজেই উৎসাহিত হবেন না। অবস্থা কী হয়, আগে দেখুন।"

সময় মতো ঠিকই দেখা গেল, মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন, আবদুল হক ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের হুলিয়া তুলে নেওয়া হয়েছে, কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার তাঁদের দলে নেই। অর্থাৎ তাঁর হুলিয়া সরকার তুলে নেয়নি। অবশ্য অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ৬ দফার বিরুদ্ধে ছিলেন না।

তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সতীর্থ সহকর্মী এর পক্ষে ইশতেহার বিলি করেছিলেন পর্যন্ত। এ রকম পরিস্থিতিতে কী করে সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন, সে রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে জানা যায়, হুলিয়ামুক্ত করা হবে এমন নেতাদের তালিকায় প্রথমে তাঁর নাম ছিল না। মাওলানা ভাসানীই নাকি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফরের নাম ওই তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। গভর্নর মোনায়েম খানও অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর একজন 'মুসলমান' বলে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর হুলিয়া। অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর এ ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই জানতেন না।

যাই হোক, হুলিয়ামুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে কাজে নামলেন চীনাপন্থী নেতৃবৃন্দ। নেমেই নানাভাবে শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও ৬ দফার বিরুদ্ধে শুরু করে দিলেন প্রচার। কিন্তু তাঁদের সে প্রচার হালে পানি পেল না। কেননা, ৬ দফা তখন এ দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় দাবি হয়ে উঠেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই সময় দেশের দুজন নেতার ওপর ভরসা করতেন। একজন মাওলানা ভাসানী ও অপরজন নিঃসন্দেহে শেখ মুজিবুর রহমান।

কিন্তু আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করার পর মাওলানা ভাসানী সরকারের অর্থে সরকারি দলের নেতা হয়ে চীন সফরে যাওয়ার ফলে তাঁর ভাবমূর্তি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে ভয়ানকভাবে ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। তাঁর ওপরে তাঁদের আগের আস্থা আর থাকে না। তাঁদের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এরই মধ্যে ঘোরতর আইয়ুববিরোধী হয়ে উঠেছিল এবং এই অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাই তাদের কাছে হয়ে ওঠে প্রধানতম রাজনৈতিক কর্মসূচি।

১৯৬৭, আমার গ্রেপ্তার

১৯৬৭ সালের ৬ নভেম্বর আমার জীবনে একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে। ওইদিন সকালবেলা মোহাম্মদপুরের রাস্তায় আমি গ্রেপ্তার হয়ে যাই। আমি এখন ভাবি, আমার সেদিন ওভাবে রিকশায় চেপে রাস্তায় বের হওয়া ঠিক হয়নি। আগে থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

আমার গ্রেপ্তারে পার্টি বিস্মিত হয়। কেননা, দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আমি গোপন জীবন অতিবাহিত করছি। কিছুই হয়নি, এমন কি সশস্ত্র সংগ্রামের সেই দিনগুলোতেও আমি পুলিশি গ্রেপ্তারি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।

যাই হোক, আমার আকস্মিক গ্রেপ্তারি ধাক্কা কাটিয়ে পার্টি আমার আশু মুক্তির আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্টির এই উদ্যোগের ফলেই আমার মুক্তির দাবিতে বিবৃতি দেন এ দেশের প্রখ্যাত বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ও বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন।

এছাড়া আমার মুক্তির দাবিতে এগিয়ে আসে প্রধান প্রধান জাতীয় রাজনৈতিক দল ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র সংগঠনসহ সারা দেশের ছোট-বড় বহু ধরনের সংস্থা। যে আমি আত্মগোপনে থাকতে থাকতে বিস্মৃত একটি নাম হয়ে উঠেছিলাম, গ্রেপ্তারের পর থেকে আমার সেই নাম আমার মুক্তির দিনটি পর্যন্ত মিছিলে-শোভাযাত্রায় উচ্চারিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। দেশের বরেণ্য অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মানুষও আমার মুক্তির দাবিতে হয়েছেন সোচ্চার। সয়েছেন পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর নানা অত্যাচার। তাঁদের ওই প্রাণপণ দাবির মুখেই স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহি দেশবরেণ্য নেতা শেখ মুজিব ও আমাকেসহ অনেক রাজনৈতিক কমরেড সতীর্থ এবং দেশের অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

বীর দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১৯৬৮, ন্যাপ-এর ভাঙন

কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শগত বিরোধের পরিণতিতে ন্যাপ-এও ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি, পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় পার্টির বহুসংখ্যাক সভ্য-সমর্থক কাজ করতেন ন্যাপ-এ। কিন্তু মূল পার্টিতে মতাদর্শগত বিরোধর ফলে, ন্যাপ তার প্রভাবের বাইরে থাকে না। তাই চীনাপন্থী বলে কথিত পার্টি সভ্য-সমর্থকরা পার্টি ত্যাগ করে আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার যেমন প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তেমনি ন্যাপ-এর ভাঙন ধরাবার চেষ্টায় লিপ্ত হন।

মোহাম্মদ তোয়াহা এবং অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন ছিলেন ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। প্রকাশ্য হয়েই তাঁরা যোগদান করেন ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে। ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে চীনাপন্থীরা ছিলেন দলে ভারি। তাঁরা ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির ওই বৈঠকে ৬ দফা আন্দোলন, এমন কি ৭ জুনের হরতালবিরোধী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে বসেন। কিন্তু ন্যাপ-এর ভেতরে কর্মরত আমাদের পক্ষের সভ্য কমরেড ও অন্য প্রগতিশীল নেতাকর্মীরা তার প্রবল বিরোধিতা করেন।

চীনাপন্থীদের কাজকর্ম এখানেই সীমিত থাকে না। পাক-ভারত যুদ্ধকে তাঁরা 'ন্যায়যুদ্ধ' বলে অভিহিত করতে থাকেন এবং মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তীব্র ভারতবিরোধী উত্তেজনা জিইয়ে রাখার পক্ষে কাজ করে চলেন। তাঁরা ৬ দফার আন্দোলন সম্পর্কে এই অভিমত দিতে থাকেন যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলন 'ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়াদের' সংগ্রাম। এমন কি অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, ন্যাপ-এর ওই কার্যকরী কমিটির সভায় চীনাপন্থীরা ৭ জুনে পুলিশের গুলিতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে প্রস্তাব গ্রহণে পর্যন্ত আপত্তি জানান। এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির মতো ন্যাপও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তা দুটি পৃথক সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করে। ন্যাপ-এর একটি অংশের সভাপতি হন অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, অন্যটির সভাপতি থেকে যান মাওলানা ভাসানী।

যে ন্যাপ তার জন্মলগ্ন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রামে পুরোভাগে ছিল, সেই ন্যাপ চীনাপন্থীদের উগ্র ও ভ্রান্ত নীতির কারণে আইয়ুব খানের চক্রান্ত ও দমনমূলক নীতির সমর্থক সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করে।

আসলে কমিউনিস্ট পার্টিতে সৃষ্ট বিরোধের জের ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের ক্রিয়াশীল হওয়ার পরিণতিতে যুগপৎভাবে ওই তিনটি সংগঠনে যে বিভক্তি দেখা দিয়েছিল, সামগ্রিকভাবে তা শুভকর কোনো ফল বয়ে আনেনি। ওই বিভক্তি পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী প্রগতিশীল আন্দোলনের ওপর প্রচণ্ড এক আঘাতস্বরূপ ঘটনা ছিল।

১৯৬৮, প্রথম পার্টি কংগ্রেস

পাকিস্তান কায়েমের পর ১৯৪৮, ১৯৫১, ১৯৫৬, ১৯৬৮—পার্টির এই চারটি সম্মেলন হয়েছে। এই চতুর্থ সম্মেলনকে আমরা প্রথম পার্টি কংগ্রেস হিসেবে ঘোষণা করি।

পার্টির প্রথম কংগ্রেস হিসেবে ঘোষিত এই সম্মেলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগোলিক অবস্থানগত বিচারে আমাদের পার্টি পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষত কমিউনিস্টদের ওপর পরিচালিত পাকিস্তান সরকারের প্রচণ্ড দমন-পীড়নের কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশের কমিউনিস্টদের ভেতরে যোগাযোগ রক্ষা করা বহুদিন থেকেই অসম্ভব কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর সে

বিচারেই শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অবশ্য এর মাঝেই কখনো কখনো পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্মিলিত শক্তিতে একক পার্টি গঠন করা একটা সুদূর পরাহত ব্যাপার বলেই মনে হয়েছিল আমাদের কাছে।

ওই কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ পূর্ব পাকিস্তানের সব জেলা থেকে মোট ৪২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে এতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নওয়াজেশ। এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণ গোপনে।

গুরুত্বপূর্ণ পার্টি কংগ্রেস গোপনে অথচ সফলভাবে অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল ওই সময়ের পার্টি নেতৃত্বের এবং এ জন্য তাঁরা প্রশংসাও পেয়েছিলেন।

কংগ্রেসে গৃহীত রণকৌশল

কংগ্রেস যে রণনীতি গ্রহণ করে, তা ছিল নিম্নরূপ :

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। এতে উল্লেখ করা হয়, সারা পাকিস্তানে এই বিপ্লব এক সঙ্গে সংঘটিত নাও হতে পারে। পূর্ববাংলায় এটা প্রথম সফল হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। ফলে পাকিস্তানের এ প্রদেশটিতে স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রথমেই কায়েম হতে পারে। এই লক্ষ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্যও সংগ্রাম করা প্রয়োজন।

ন্যূনতম দাবির ভিত্তিতে স্বৈরাচারী আইয়ুবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানব্যাপী বৃহত্তর ঐক্য এমন কি এক দফা দাবির ভিত্তিতে হলেও তা প্রতিষ্ঠা করা। এই এক দফা দাবি হচ্ছে, পার্লামেন্টারি প্রথায় নির্বাচন অনুষ্ঠান। জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নও এই রণকৌশলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সংগ্রাম পরিচালনা করা। সব প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তি, বিশেষত ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সংগ্রাম পরিচালনা করা।

'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে কংগ্রেস প্রথমে সিদ্ধান্ত নিলেও, অবস্থা বিশ্লেষণ করে পরে তা বাতিল করে দেয়।

১১ জনকে নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমরেড আবদুস সালাম (বারীণ দত্ত) নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

আবদুস সালাম, অনিল মুখার্জী, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, হারুনুর রশীদ, মোজাফ্‌ফর আহমদ, আমজাদ হোসেন (তখন জেলে), নুরুল ইসলাম (বরিশাল), জ্ঞান চক্রবর্তী ও বরুণ রায়।

সম্পাদকমণ্ডলী

আবদুস সালাম, অনিল মুখার্জী, খোকা রায় ও মোহাম্মদ ফরহাদ।

আমি তখন জেলে। আমার অনুপস্থিতিতেই অনুষ্ঠিত হয় এই কংগ্রেস।

১৯৬৮, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের ২০ জানুয়ারি এক ঘোষণা বা বিবৃতিতে বলেন যে, পকিস্তান সরকারকে উচ্ছেদের জন্য ভারতের আগরতলায় এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রথমে তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু যখন দেখা গেল শুধু কমান্ডার মোয়াজ্জেম নয়, এই ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবুর রহমানকেও জড়িত করা হয়েছে। তখন স্পষ্টতই বোঝা গেল, এই মামলা একটা সাজানো ব্যাপার। কেননা, ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে শেখ সাহেব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি তাঁকে মুক্তি দিয়ে আবার তখনই জেল গেট থেকেই গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এক অন্ধকার সেলে।

মোট ৩৩ জনকে জড়িত করে সাজানো হয়েছিল কুখ্যাত আগরতলা মামলা। এঁদের মধ্যে তিনজন প্রথম শ্রেণির সিএসপি অফিসারও ছিলেন। এঁরা হলেন—এ কে এম শামসুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস এবং আহমদ ফজলুর রহমান। সেই সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাও। কাজেই ষড়যন্ত্র মামলা একটা গুরুতর মামলা হয়ে দাঁড়াল। ১৯৬৮ সালে সরকারের তরফ থেকে 'ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ড (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) আইন' ঘোষণা করা হলো। এই ট্রাইবুনালের সভ্য নিযুক্ত হলেন তিনজন। পাঞ্জাব সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি হলেন এর চেয়ারম্যান। অপর দুজন হলেন বিচারপতি এম আর খান ও বিচারপতি মকসুদুল হাকিম। পাঞ্জাবের প্রখ্যাত আইনজীবী মঞ্জুর কাদিরকে (পাকিস্তানের এককালের বিদেশমন্ত্রী) বিরাট অঙ্কের ফি দিয়ে নিযুক্ত করা হলো পাবলিক প্রসিকিউটর। এই ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে সরকার মনে করেছিলেন, দেশের জনগণ, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ

শেখ মুজিবুর রহমানের ফাঁসি দাবি করবে। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য এবং আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের জুলুম ও দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্যই যে সরকার শেখ মুজিবকে আসামি করে এই ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছে, জনগণের তা বুঝতে বিলম্ব হলো না। তাই এই মামলা দেশে শুধু চাঞ্চল্যের সৃষ্টিই করল না, তার প্রতিবাদে জনগণ সোচ্চারও হয়ে উঠল। এই মামলার বিরুদ্ধে তারা পথে নেমে আসতে দ্বিধা করলেন না।

তথাকথিত আগরতলা মামলার বিচার কাজ শুরু হলো ক্যান্টনমেন্টে। এই মামলার সওয়াল-জবাব ও আসামিদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ প্রতিদিন প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিকের পাতায় প্রকাশিত হতে লাগল। ফলে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতে ও তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সেই সঙ্গে সরকারের প্রতি বাড়তে লাগল তাঁদের প্রবল ঘৃণা।

এই মামলা চলার সময়েই ২৪ জুলাই হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ছাত্র সমাজ ধর্মঘটের ডাক দিল। তাঁদের এই আহ্বানে ১০ আগস্ট প্রদেশব্যাপী পালিত হলো ধর্মঘট। এভাবে আন্দোলন আরম্ভ হতে শুরু করল।

ওদিকে 'তাশখন্দ শান্তি চুক্তি'র সমালোচনা করে আইয়ুবের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করায় ভুট্টোর জনপ্রিয়তা যে পাঞ্জাবিদের মধ্যে বেড়ে গিয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। অথচ যুদ্ধের সময় এই ভুট্টোই বলেছিলেন, প্রয়োজনে এক হাজার বছর ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। পদত্যাগ করে তিনি স্লোগান তুলেছিলেন ইসলামী সমাজতন্ত্রের। ফলে তিনি পাঞ্জাবি যুবকদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি বীরের প্রতীকেও পরিণত হয়েছিলেন।

এই সময় রাওয়ালপিণ্ডির এক ছাত্রসভায় ভাষণ দেওয়া উপলক্ষে ভুট্টো সেখানে অবস্থান করছিলেন। এই ছাত্রসভার দুই-একদিন আগে সেখানকার গর্ডন কলেজের কিছু ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে ওই কলেজের ছাত্ররা এক বিক্ষুব্ধ মিছিল সহকারে ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করতে আসে। পথে তারা আইয়ুবশাহির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে সরকারি গাড়ি-ঘোড়ায় লটকানো পাকিস্তানি পতাকা ইত্যাদি টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। ছাত্ররা ভুট্টোর অবস্থানকারী হোটেল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলে, পুলিশ তাঁদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও সেই সঙ্গে লাঠিচার্জ করে এবং গুলি চালায়। ওই গুলিবর্ষণের ফলে সেখানে ১৭ বছরের একজন ছাত্র মারা যায়। ছাত্রদের ওপর গুলি চালনা এবং একজন ছাত্রের শহীদ হওয়ার খবর দাবানলের মতো সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

দলে দলে লোক জমায়েত হতে থাকে। পরের দিন ছাত্ররা ১০ সহস্রাধিক মানুষের এক মিছিল বের করে। ওই মিছিলে শামিল হয় বহু শ্রমিক, বস্তিবাসী ও সাধারণ কর্মচারীও। সব স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমন কি বড় বড় ধনীদের বাড়িতে আক্রমণ পর্যন্ত চালানো হয়। আইয়ুববিরোধী স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রাওয়ালপিণ্ডি। পুলিশ বাহিনীর পক্ষে এসব ঘটনা দমন করা সম্ভব হয় না। শেষে তলব করা হয় সামরিক বাহিনী। তাদের ওপর এইসব মিছিল-সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। জারি করা হয় সান্ধ্য আইনও। এর ফলে পিণ্ডিতে আন্দোলন স্তিমিত হয় বটে, কিন্তু সারা পাকিস্তানে তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে অচিরেই।

এরই মধ্যে আইয়ুবি শাসনের এক দশক তথা 'উন্নয়নের এক দশক' পূর্তি উৎসব আয়োজনের তোড়জোড় শুরু করা হয় সরকারি মহল থেকে। শুরু হয় এই উপলক্ষে রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম জুড়ে ব্যাপক অভিযান। 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার' নামে একটি আত্মজীবনী লেখেন আইয়ুব খান। গ্রন্থটির প্রকাশনা বাবদ ব্যয় করা হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, এই সময় মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের সময়ও এসে পড়ে। আইয়ুবকে পাকিস্তানের আজীবন প্রেসিডেন্ট করার কথাও জোরেশোরে প্রচার করা হতে থাকে। আইয়ুবের পক্ষে প্রচারের এই জাঁকজমকতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ অচিরেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তাঁদের প্রকট দারিদ্র্যে ও বঞ্চনার ভেতরে অর্থ ব্যয়ের বাহুল্য জনসাধারণকে ঠেলে দিল সংগ্রামের পথে।

এই অবস্থায় মূলত ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগেই ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ ও অন্য কয়েকটি গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত হয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক, সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা, ছাত্র লীগের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে আবদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলি, ছাত্র ইউনিয়নের অপর অংশের সভাপতি ও সহ-সম্পাদক যথাক্রমে—মোস্তফা জামাল হায়দার ও দীপা দত্ত, ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে—তোফায়েল আহমেদ ও নাজিম কামরান চৌধুরী। তোফায়েল আহমেদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। এইসব ছাত্র সংগঠন যৌথভাবে প্রণয়ন করে ১১ দফা কর্মসূচি। আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবির মতো ছাত্রসমাজের ১১ দফা কর্মসূচিও পূর্ববাংলার উদীয়মান বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়াদের প্রোগ্রাম হলেও, তুলনামূলকভাবে এটা ছিল পরিপূর্ণ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বোনাস প্রদান, কৃষকদের খাজনা-ট্যাক্স কমানো, পাটের দাম মণ প্রতি

৪০ টাকা করার দাবি ইত্যাদি জানানো হয়, ৬ দফার কর্মসূচিতে যা ছিল অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, ১১ দফায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় বড় বড় শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা, 'সিয়াটো', 'সেন্টো' ও 'পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি' বাতিল করার দাবি। এই সঙ্গে ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিও। অবশ্য ১১ দফায় সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের কোনো দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

যাই হোক, ১১ দফার ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সূচনা হয়। এই সময় সারা পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' সংক্ষেপে 'ডাক' নামে একটি জোট গঠন করে। মাওলানা ভাসানীর দল ছাড়া আর সব দল, এমন কি জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম-এর মতো দলগুলোও 'ডাক'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আগেকার 'কপ'-এর মতোই এবার 'ডাক'-এর সৃষ্টি হয়।

তবে মাওলানা ভাসানী 'ডাক'-এ অন্তর্ভুক্ত না হলেও এ সময় তিনি তার নিজের মতো করে আন্দোলন করতে থাকেন। ৭ ডিসেম্বর (১৯৬৯) মাওলানা ভাসানী পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে স্কুটার চালকদের আন্দোলনের সমর্থনে এক সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানান। ওই ধর্মঘট সফল হয়।

ছাত্রদের উত্তুঙ্গ আন্দোলন-সংগ্রামের মুখে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিণত হয় একটি যুদ্ধক্ষেত্রে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করার সময় ২৩ জানুয়ারি (১৯৬৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। ফলে এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা অর্জন করে, ধারণ করে আরো জঙ্গি ও মারমুখো রূপ।

২৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে ডাকা হয় দেশব্যাপী হরতাল। ওই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ৬ জন ছাত্রকে হত্যা করা হলে, ঢাকা শহর প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী ছাত্র-জনতার উত্তাল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। নিহতদের লাশ নিয়ে ঢাকায় ২৪, ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি—এই তিনদিন পর্যন্ত মিছিল চলে। ২৪ জানুয়ারি (১৯৬৯) বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং আক্রমণ করে তার একটা অংশ পুড়িয়ে দেয়। ছাত্র-জনতার এই বিক্ষুব্ধ অভিযানের মুখে পুলিশ গুলি চালালে ছাত্র মতিউর রহমান ও মুনির নিহত হন। বিক্ষুব্ধ জনতা এইদিন 'মর্নিং নিউজ' অফিস ও 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকা ভবনে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে। তাঁরা কেন্দ্রীয় এ্যাসেমব্লির মেম্বার এম এ লস্করের বাসভবনেও অগ্নিসংযোগ করে। উল্লেখ্য, এই আন্দোলনে রিকশা চালক, মোটর ড্রাইভার, দিনমজুরসহ শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ

ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রদেশের বিভিন্ন জেলাতেও এই আন্দোলন একই রকম জঙ্গিরূপ ধারণ করে ও সমতালে চলতে থাকে।

১৯৬৯ সালের ১৫ জানুয়ারি তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দী অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড '৬৯-এর আন্দোলনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। এরপর আহত হন সার্জেন্ট ফজলুল হক। চারদিকে হত্যা, গুলি, লাঠিচার্জ—আন্দোলনের চরিত্র এক রণাঙ্গনের রূপ ধারণ করে। সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট ফজলুল হক—আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এই দুই আসামির হত্যাকাণ্ড ও আহত হওয়ার ঘটনার মুখে শেখ মুজিবের নিরাপত্তা ও তাঁর মুক্তির দাবি এই সময় আরো প্রবল হয়ে ওঠে। জনসাধারণ হয়ে উঠতে থাকে বেপরোয়া থেকে বেপরোয়াতর। আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য এবার সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং জারি করা হয় সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত কারফিউ। কিন্তু জনসাধারণ এ সবকিছুই একের পর এক উপেক্ষা করে চলে। কারফিউ ভঙ্গ করেই বের করে তাঁরা একের পর এক জঙ্গি মিছিল। মালিবাগ এলাকার জনসাধারণ প্রথম কারফিউ ভঙ্গ করে। ১৯ তারিখে সেখানে সেনাবাহিনী গুলি চালায়। অনেকেই আহত হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী রাজধানী ও প্রদেশের সর্বত্র আন্দোলনরত জনগণের ওপর গুলি চালিয়ে পাখির মতো মানুষ মারতে থাকে। তবুও জনসাধারণের রোষ দমানো সম্ভব হয় না। শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর হাতেই।

১৮ ফেব্রুয়ারি খবর আসে সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে ঢুকে হত্যা করেছে। এই খবরে ওইদিনই কারফিউ ভঙ্গ করে হাজার হাজার মানুষ ঢাকার রাজপথে নেমে আসে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিছিলকারী জনতার ওপর গুলি চালালে রক্তের স্রোত বয়ে যায়।

তেজগাঁও, ডেমরা ও ঢাকার শ্রমিক এলাকার শ্রমিকরাও পথে নেমে আসে কারফিউ ভঙ্গ করে। এই সময় পুলিশের কাছ থেকে রাইফেল-বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটতে থাকে। বিক্ষুব্ধ জনতা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারপতি রহমানের গেস্ট হাউজ আগুন ধরিয়ে ভস্মীভূত করে। কোনো রকমে তিনি পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, ওই মামলার আইনজীবী মঞ্জুর কাদির জনতার এই মারমুখী আক্রমণে ভীত হয়ে প্রাণশঙ্কায় পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যান।

আইয়ুবের পশ্চাদপসারণ

এই রকম অবস্থায় ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব ঘোষণা দেন যে, তিনি বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি আছেন। মাওলানা ভাসানী আইয়ুবের ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, ভুট্টোও গ্রহণ করেন না। কিন্তু 'ডাক' ওই প্রস্তাবকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করে না। ১৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ওই গোলটেবিল বৈঠক বসে। 'ডাক'-এর শরিক দলের কিছু সদস্য এর আগেই পিন্ডিতে যান এবং সেখানে গিয়ে তারা বলেন, শেখ মুজিবের অংশগ্রহণ ছাড়া সেই গোল টেবিল বৈঠক ফলপ্রসূ হবে না। ফলে ওই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়টি অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

২২ ফেব্রুয়ারি সরকার স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল উঠিয়ে নিলে আগরতলা মামলা আর কার্যত থাকে না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সব বন্দী মুক্তি পেয়ে যান।

শেখ মুজিবুর রহমান ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। আমি এবং আমার সঙ্গে আরো পাঁচজন নেতা-কমরেড মুক্তি পাই ওই একই দিনে। এর আগে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী মুক্তি পেয়েছিলেন। ফলে সব দলের বন্দী নেতা-কর্মীরাই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যান। কেবল বিশেষ মামলায় অভিযুক্ত এমন কিছু বিনাবিচারের বন্দী মুক্তি পান না। তাঁরা রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না।

এর আগে গোলটেবিল বৈঠকে প্যারোলে মুক্তি সাপেক্ষে যোগ দিতে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মত ছিলেন না। কিন্তু উত্তাল গণবিক্ষোভের মুখে আগরতলা মামলা উঠে গেলে সম্পূর্ণ মুক্ত মানব হিসেবে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন।

যাই হোক, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সারা পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান এমন প্রবল রূপ ধারণ করে যে, আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা আর সম্ভব হয় না। পাঞ্জাবি জনগণও তাকে আর সমর্থন দেয় না 'তাশখন্দ শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর করার ফলে। অবশেষে ১৯৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বিশাল রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানের এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। ওই সংবর্ধনা সভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু'

উপাধি দেন। শেখ মুজিব প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশে অনুষ্ঠিত তার সংবর্ধনা সভায় গ্রহণ করে নেন ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবি। সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন, তিনি বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মুক্তির দাবির সঙ্গে কখনই বেঈমানি করবেন না।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলানা ভাসানী

মাওলানা ভাসানী ১৯৬৯-এর আন্দোলনের সূচনায় গোটা দুই ধর্মঘটের আহ্বান দিয়ে তারপর চুপ মেরে যান। ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন তিনি 'জ্বালাও-পোড়াও' আর 'ঘেরাও'-এর স্লোগান তোলেন। এই উগ্র স্লোগানের কিছুটা প্রভাব পড়ে কৃষকদের মধ্যে। এই সময় তাঁদের হাতে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু চোর-ডাকাত ও টাউট-বাটপার জাতীয় লোক মারা পড়ে।

মাওলানা ভাসানী আহূত এই 'ঘেরাও' আন্দোলনের সময় কিছু বাড়াবাড়ির ঘটনাও ঘটে। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারের সহযোগী আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করে। মাওলানা ভাসানী এই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েও 'জ্বালাও-পোড়াও'-এর আওয়াজ তুললেন। আসলে এর আগে মাওলানা সাহেব আইয়ুব-ঘেঁষা নীতি গ্রহণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যে বদনাম কুড়িয়েছিলেন, তা মুছে ফেলার জন্যই আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের মুখে এ জাতীয় উগ্র আওয়াজ তুলতে লাগলেন। ফলে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হলো। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাওলানার এই তৎপরতার ফলে এই বলে প্রচার করার সুযোগ পেল যে, পূর্ব পাকিস্তানে গণ-আন্দোলনের নামে নির্বিচারে গণহত্যা, লুটতরাজ আর বিশৃঙ্খলা চলছে।

এই অবস্থায় সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মধ্যে ভীতি ও দোদুল্যমান মনোভাবের সঞ্চার হয়। আন্দোলন আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে।

গোলটেবিল বৈঠক

১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ শুরু হয় গোলটেবিল বৈঠক। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উঠিয়ে নেবার জন্য নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান 'ডাক'-এর পক্ষ থেকে আইয়ুব খানকে ধন্যবাদ জানান। আগেই বলেছি, এই বৈঠক মাওলানা ভাসানী ও ভুট্টো ভয়কট করেন।

১০ মার্চ আবার আলোচনা শুরু হয়। 'ডাক'-এর পক্ষ থেকে নবাবজাদা কতকগুলো দাবি উত্থাপন করে সরকারের প্রতি তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। দাবিগুলো ছিল :

১. ফেডারেশন পার্লামেন্টারি পদ্ধতি।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন।
৩. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন।

এরপর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি ছিল ৬ দফা। সেগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন।
৩. এক ইউনিট বাতিল। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একটি সাব ফেডারেশন।
৪. অঞ্চলগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার।
৫. সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি এবং পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা।

এই বৈঠকে আসগর খান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারিত করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের গোলমাল ইত্যাদি মোনায়েম খানই বাড়িয়ে চলেছেন। আইয়ুব খান এর উত্তরে বলেন, এটা ভুল বক্তব্য। মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবারই চেষ্টা করছেন। শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ুবের বক্তব্যের উত্তরে বলেন, এ কথা ঠিক নয়। আপনার শাসনযন্ত্রগুলোই যত রকমের গণ্ডগোলের মূল। আইয়ুব খান শেখ মুজিবের এই বক্তব্যে ভয়ানক চটে যান। তিনি বলতে থাকেন, তাহলে আমাকে ব্যাপারটা আরো বিস্তারিতভাবে বলতে হবে। ভারত থেকে প্রচুর লোক পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে, তারাই এসব গোলমালের হোতা।

শেখ মুজিব আবার আইয়ুবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ও বলা হয়েছিল, হিন্দু এবং ভারতের সক্রিয় মদদেই এই আন্দোলন হচ্ছে। ব্যাপারটা ভুল।

আইয়ুব এরপর এক লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমি সকলের কথা শুনেছি। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে,

১. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে জাতীয় পরিষদ প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন।
২. দেশ শাসিত হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে।

এই বক্তব্যকে গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত সকলে স্বাগত জানালেও, কেবল শেখ মুজিব আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন, যেহেতু আইয়ুবের বক্তব্যে ৬ দফা কোনো স্থান পায়নি, কাজেই এটা আমি গ্রহণ করতে পারি না।

আইয়ুব এবার তার বক্তব্যে বলেন, সারাদিন ধরে চলা আলোচনার ভেতর দিয়ে সকলেই দুটি বিষয়ে একমত হয়েছেন। আমিও তাতে মত দিয়েছি এবং এও বলেছি, অবশিষ্ট দাবিগুলো সম্পর্কে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক নেতা এতে রাজি নন, তাঁরা সব বিষয়ের সমাধান এখনই চান। আমি সব সময়ে বলেছি, শক্তিশালী কেন্দ্রই হলো পাকিস্তানের প্রকৃত ভিত্তি। অনেকেই আমাকে বলেছেন, সব দাবি-দাওয়া মেনে না নিলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না। অথচ ওইসব দাবি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো পাকিস্তানকে নির্মূল করা। কেন্দ্র হবে দুর্বল, সৈন্যবাহিনী হবে পঙ্গু। কাজেই পাকিস্তানের ধ্বংসের জন্য আমি সভাপতিত্ব করতে পারি না।

আইয়ুবের ওই বক্তব্যের পর গোল টেবিল বৈঠক ভেঙে গেল।

এর পরপরই আইয়ুব খান প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ তার ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে। আর এইভাবে সম্পন্ন হলো 'লৌহ-মানব' জেনারেল আইয়ুব খানের পতন। প্রমাণিত হলো আরেকবার, জনগণের রুদ্ররোষের কাছে লৌহ-মানব জেনারেলদের পতন অনিবার্য।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট এবং চিফ মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর হয়েই নিযুক্ত করলেন তিনজন ডেপুটি প্রধান মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর। এঁরা হলেন : ১. লে. জে. আবদুল হামিদ, ২. ভাইস এডমিরাল এম এম আহসান এবং ৩. এয়ার মার্শাল এম নুর খান।

ইয়াহিয়া খান তাঁর বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আমার অন্য আর কোনো রকম আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য নেই। যত দ্রুত সম্ভব দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করাই আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

তিনি তাঁর ভাষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সমাধানেরও ইঙ্গিত দিলেন :

১. প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটাধিকার প্রদান করা।
২. জনসাধারণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাঁরা সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করবেন।
৪. এক ইউনিট বাতিল করা।
৫. এক মানুষের এক ভোট।
৬. পার্লামেন্টারি ফেডারেল সরকার।
৭. যে ইসলামিক আদর্শে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ইসলামিক আদর্শ সংবিধানে সমুন্নত রাখা।

তিনি তাঁর ভাষণে আরো বললেন, নির্বাচনী আইনের কাঠামো ৩১ মার্চ (১৯৬৯)-এর মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর।

২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইন সংক্রান্ত কাঠামো অর্ডার ঘোষণা করেন। কিন্তু মাওলানা ভাসানী ইয়াহিয়ার ভাষণের পরপরই আওয়াজ তুললেন যে, 'ভোটের আগে ভাত চাই'।

অধ্যাপক মোজাফফ্‌র আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ দাবি করল যে, প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী ২০, ২৫ ও ২৭ নং ধারা বাতিল করতে হবে। এই ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নলিখিত দাবিসমূহ :

পাকিস্তান হবে ফেডারেল রিপাবলিক। এর নাম হবে ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। যে সব প্রদেশ এখন আছে বা পরে হবে, তারা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে স্থানীয় অখণ্ডতা এবং পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ফেডারেশনের ঐক্য কোনোক্রমেই ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২-ক. পাকিস্তানে ইসলামিক আদর্শ সমুন্নত রাখা।

২-খ রাষ্ট্রের প্রধান হবেন একজন মুসলমান।

৩. গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্র এবং প্রদেশে নিয়মিত ব্যবধানে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে।

৩-খ. পাকিস্তানের অধিবাসীদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে।

৩-গ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকবে এবং মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। শাসন ক্ষমতা এবং অর্থ এমনভাবে প্রদেশ ও ফেডারেল সরকারের মধ্যে ভাগ করতে হবে, যাতে প্রদেশগুলো সবচেয়ে বেশি স্বায়ত্তশাসন পায়, যাতে ফেডারেল সরকারের শাসন ক্ষমতা ও অর্থের ওপর প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকে, যাতে ফেডারেল সরকার বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা হয়।

৫-ক. পাকিস্তানের সব এলাকার জনসাধারণ জাতীয় কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারে।

৫-খ. প্রদেশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ও অন্য ধরনের বৈষম্য আছে, তা সংবিধান বা অন্য উপায় দ্বারা দূর করতে হবে।

২৫. ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি যে সংবিধানই গ্রহণ করুক প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রতিপাদন করতে হবে। যদি প্রেসিডেন্ট তা গ্রহণ না করেন, তাহলে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে তা বাতিল হয়ে যাবে।

২৭. অর্ডারের ব্যাখ্যা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের বক্তব্যই হবে চূড়ান্ত। এ সম্পর্কে কোর্টে কোনো রূপ মামলা করা যাবে না।

২৭-খ. প্রেসিডেন্ট ছাড়া এই অর্ডারের কোনো সংশোধন ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে করা যাবে না।

আইয়ুব সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেও এবং ইয়াহিয়া খান এসে নির্বাচনের তারিখ ও এর রূপরেখা ঘোষণা করলেও, তখনো যে পাকিস্তান, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাঙ্ক্ষিত দাবি-দাওয়া আদায় হয়নি এবং দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র যে তখনো তাঁদের অধিকার ইত্যাদি পদদলিত করার জন্য সমানভাবে চলছে, পার্টি এসব বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে যথাসম্ভব প্রচার কাজ চালায়। পার্টি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সরাসরি উদ্যোগও গ্রহণ করে এ ব্যাপারে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হলো ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর। কিন্তু আওয়ামী লীগ ছাড়া আর সব কটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাল। তাদের অভিমত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বলে ওই তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ঠিক হবে না। আওয়ামী লীগের বিরেধিতা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে পরিবর্তিত তারিখ ঘোষণা করেন ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর।

নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেবার পর পরই ইয়াহিয়া খান চলে যান চীন সফরে। চীনে অবস্থানকালে তিনি হঠাৎ করে জানতে পারেন যে, কিছু জেনারেল তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে গোলমালের ঘোট পাকিয়েছে। কাজেই তিনি তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করে রাওয়ালপিণ্ডি ফিরে আসেন।

এদিকে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যায় শতাব্দীকালের এক ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। ফলে নোয়াখালী, ভোলা ও পটুয়াখালীসহ উপকূলীয় অঞ্চলের এক সুবিস্তৃত এলাকায় ব্যাপক সহায়-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চল ও দেশে এই মর্মান্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর পৌঁছে যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন থেকে জাহাজ ভর্তি করে দুর্গত মানুষের জন্য সাহায্য আসলেও, পশ্চিম পাকিস্তান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকে। কোনো খাদ্য সাহায্য পাঠানো তো দূরের কথা, সহানুভূতিটুকু প্রকাশ করে না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, ইয়াহিয়া খান চীন থেকে সরাসরি ১০ নভেম্বর ঢাকায় এসে পৌঁছেন। তিনি গভর্নর এডমিরাল আহসান ও পূর্ব পাকিস্তানের মার্শাল ল এডমিনিসট্রেটর লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব সহযোগে প্লেনে করে দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যান এবং নামে মাত্র পরিদর্শন শেষে তিনি ওইদিনই সন্ধ্যায় রাওয়ালপিণ্ডি ফিরে যান। ফিরে গিয়ে জানতে পারেন, কিছু জেনারেল ও সামরিক অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ এবং তারা সবাই পদোন্নতি চান। ব্যাপারটি নিয়ে বৈঠক বসে এবং অনেক আলাপ-আলোচনার পর বিক্ষুব্ধ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগের পদোন্নতির ব্যাপারে ইয়াহিয়া স্বীকৃত হন। এইসব গোলমাল মেটাতে ১০ দিন সময় চলে যায়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বা পশ্চিম পাকিস্তানের তরফ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত মানুষের জন্য কোনো রকম সাহায্য আসে না। ১০ দিন পর ইয়াহিয়া খান দুর্গতদের জন্য ৫ কোটি টাকার সাহায্য মঞ্জুর করলেও, উল্লিখিত ১০ দিন কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার জন্য হেলিকপ্টারযোগে খাদ্য ও ওষুধপত্রসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দুর্গত এলাকায় বিতরণ করা যায়নি। গেলে জীবিত অথচ আহত ও বুভুক্ষু আরো বহুসংখ্যক মানুষকে বাঁচানো যেত। অবশ্য, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলগুলো দুর্গত মানুষের সাহায্যে যথাসাধ্য ত্রাণ তৎপরতা চালাতে দ্বিধা করেনি। আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নে কর্মরত পার্টির সভ্য-সমর্থকদের সম্মিলিত করে দুর্গত এলাকায় তার সাধ্যানুযায়ী তৎপরতা চালায়। প্রকাশ্যে কাজ করেন পার্টির এমন সভ্য-সমর্থকরাও নানাভাবে রিলিফসামগ্রী সংগ্রহ এবং তা বিতরণ করেন।

এদিকে বাংলার দুর্গত মানুষের সাহায্যকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নিদারুণ অনীহা ও অবহেলা তাদের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিকতার প্রতি গভীর সন্দিহান শেখ মুজিব তাই এ সময় নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তার চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করেন। ইয়াহিয়া নির্বাচন আর চান না। তিনি ঘোষণা দেন, নির্বাচন নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বরেই অনুষ্ঠিত হবে। তবে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত এলাকাসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে।

অবশেষে, প্রদেশব্যাপী সৃষ্টি হয় নির্বাচনের উত্তাল জোয়ার। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে সংগ্রাম করা, জেল-জুলুম সওয়া, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়ে নির্যাতন সওয়া এবং পরিশেষে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত পূর্ববাংলার মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের চরম অবহেলা ও উদাসীনতার সমালোচনায় মুখর হওয়ার ফলে শেখ মুজিব বাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন। ফলে ভোট যুদ্ধে দেশের জনগণ শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকেই বিপুলভাবে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। ১৬২টি সরাসরি সিটের মধ্যে তারা জয়লাভ করে ১৬০টি সিটে। কেবল দুটি সিটে তারা পরাজিত হয়। এই দুটি সিটের একটি ছিল ময়মনসিংহে এবং অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামে। মোট সিট সংখ্যা ১৯৬। ৭টি ছিল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সিট। এসব সিট নির্বাচিত হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। এইভাবে আওয়ামী লীগ লাভ করে মোট ১৬৭টি সিট (মহিলাদের ৭টি সিটসহ)। ফলে দেশব্যাপী শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের জয়-জয়কার।

নির্বাচনী এই ফলাফল দেখে ইয়াহিয়া খান স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের এমন চমকপ্রদ জয় আশা করেননি। কিন্তু কার্যত ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় তিনি প্রমাদ গুনলেন।

পূর্ববাংলার নির্বাচনী ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিল শতকরা ৯৭ ভাগ সিট, এবারকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছে শতকরা ৯৮ ভাগ সিট। এ এক অভূতপূর্ব বিজয়!

ভোট-যুদ্ধে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েই শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের প্রতি আবেদন জানান, যত দ্রুত সম্ভব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে হবে। আর এ অধিবেশন ডাকতে হবে ঢাকায়। তার তারিখও নির্দিষ্ট করে দিলেন তিনি—১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের এই আবেদনের জবাবে বললেন, সংবিধান সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা হওয়া দরকার। তিনি শেখ মুজিবকে এ ব্যাপারে ইসলামাবাদে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চালানোরও পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন না।

এ দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী (মহিলা সিটসহ মোট ৮৮ সিট পেয়ে) পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো জানালেন যে, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের আগে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথা মেনে নিয়ে ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে বসেন। ব্যাপারটা সঙ্গত কারণেই শেখ মুজিবের

কাছে সুখকর মনে হয় না। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁর কথা না মানা—ব্যাপারটা শিষ্টাচারবহির্ভূত হলেও শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের ৩ মার্চের তারিখটি মেনে নেন।

জানুয়ারি মাসে (১৯৭১) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ সাহেবের কথা হয়। তারপর ঢাকায় কথা হয় তার ভুট্টোর সঙ্গে। সেই আলোচনা শেষে উভয় নেতাই মত প্রকাশ করেন যে, মূলগতভাবে ৬ দফার ব্যাপারে কোনো আপত্তি না থাকলেও অন্যান্য ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

ভুট্টো যখন ঢাকা থেকে লাহোরে ফিরে যান, তখনই ওই সময় সেখানে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে। দুজন কাশ্মীরি ভারতের একটি বিমান হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে আসে। ভুট্টো সরাসরি ওই দুজন হাইজ্যাকারের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের 'বীর' বলে অভিহিত করেন। পরের দিন খবর পাওয়া যায়, হাইজ্যাকার দুজন বিমানটি গ্রেনেড ছুঁড়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শেখ সাহেব এ মর্মে একটি বিবৃতি দেন যে, বিমান ধ্বংসের ঘটনা একটি দুঃখজনক ব্যাপার। এ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া আবশ্যক। শেখ সাহেবের এই বিবৃতির দ্রুত প্রতিক্রিয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানকার নেতৃবৃন্দ এই অভিমত ব্যক্ত করতে শুরু করেন যে-শেখ মুজিব দেশপ্রেমিক নন, তিনি ভারতের দালাল।

এদিকে ভারতেও বিমান ধ্বংসের ঘটনায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারত এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানকে সাফ জানিয়ে দেয় যে, ভারত তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে পাকিস্তানের কোনো বিমানকে যেতে দেবে না। পাকিস্তান এবার দমে যায়। ভবিষ্যৎ অসুবিধার কথা ভেবে, লোক দেখানোভাবে গঠন করে একটি তদন্ত কমিটি। হাইকোর্টের জজ নুরুল আরেফিনকে ওই কমিটির প্রধান করা হয়। তিনি তদন্ত শেষে রায় দেন যে, হাইজ্যাকার ওই কাশ্মীরি দুজন ভারতের গুপ্তচর। ভারতের আকাশসীমার ওপর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়া বন্ধ করা এবং সেখানকার অবস্থা ঘোলাটে করার সুবিধার্থেই বিমানটি ধ্বংস করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ সকাল ৯ টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ওই তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সর্বসম্মতভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ববাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যে কোনো পন্থা গ্রহণের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়।

অন্যদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো এক সংবাদ সম্মেলনে জানান যে, আওয়ামী লীগের তরফ থেকে ৬ দফার ব্যাপারে আপস বা পুনর্বিন্যাসের কোনো রকম আশ্বাস পাওয়া না গেলে ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। ভুট্টো ওই সংবাদ সম্মেলনে আরো বলেন যে, ভারতের শত্রুতা এবং ৬ দফা না মানার ফলে ঢাকায় তাঁদের অবস্থা হবে ডাবল জিম্মির শামিল। ভুট্টোর এসব উক্তি আওয়ামী লীগসহ পূর্ববাংলার রাজনৈতিক মহলে যারপরনাই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

ভুট্টোর এই রকম মন্তব্য এবং জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে তাঁর যোগদানের টালবাহানামূলক অস্বীকৃতির মুখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে 'গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়সমূহ' নিয়ে আলোচনার জন্য এক বৈঠক আহ্বান করেন। ফলে ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) রাওয়ালপিণ্ডিতে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী এক বৈঠক হয়। সম্ভবত ওই বৈঠকেই বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গভীর নীল-নকশা প্রণীত হয়েছিল।

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক শেষে ভুট্টো আরেকটি বিবৃতি দেন এই মর্মে যে, ঢাকা অধিবেশনে যোগদানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এই বলে হুমকি দেন যে, তাঁদের কেউ যদি ঢাকায় যান, তবে তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। তিনি তাঁর ওই হুঁশিয়ারিতে এ কথাও বলেন যে, পিপলস্ পার্টির অনুপস্থিতিতে মহিলা প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হলে তিনি খাইবার থেকে করাচি পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করবেন। সব ধরণের দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, ঢাকার পরিষদ একটি 'কসাইখানা' হয়ে দাঁড়াবে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ভুট্টোর এসব হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের ৫ জন নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য (পিপলস্ পার্টি নয়, ভিন্ন রাজনৈতিক দলের) ঢাকায় এসে পৌঁছান।

আওয়ামী লীগ এদিকে সংবিধানের খসড়া তৈরি করার জন্য ৩০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করার মাধ্যমে ৬ দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। শেখ মুজিব মনে করেছিলেন, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ আর পরিবর্তন করা হবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ১ মার্চ (১৯৭১) দুপুরবেলা বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, জাতীয় পরিষদের অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন ইয়াহিয়া খান স্থগিত করেছেন এবং পরে যে কোনো সময় তিনি এই অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করবেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা সংক্রান্ত ঘোষণা শোনার পরপরই পূর্ববাংলার জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজধানীর পাড়া-মহল্লার মানুষ পথে নেমে আসেন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল

সহকারে। মুহূর্ত কয়েকের ভেতরেই ঢাকা পরিণত হয়ে যায় একটি উত্তাল বিক্ষোভ আর মিছিলের শহরে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কল-কারখানা, দোকানপাট ও যানবাহনসহ সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। চারদিকে কেবল জঙ্গি মিছিলের পর জঙ্গি মিছিল।

এই সময় আওয়ামী লীগের বৈঠক চলছিল মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত হোটেল পূর্বাণীতে। নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষুব্ধ মিছিলের পর মিছিল এসে সমবেত হয় এই হোটেলের সামনে। সৃষ্টি হয় এখানে জনতার এক বিশাল সমুদ্র। এই জনসমুদ্র থেকে ক্রমাগত দাবি উঠছিল, এই মুহূর্তে করণীয় কী, সে সম্পর্কে ওই হোটেলে অবস্থানরত শেখ মুজিবুর রহমান কিছু বলুন। তাঁদের দাবির মুখে শেখ মুজিব হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে জনতাকে ধৈর্যহারা না হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান জানান।

ঐদিনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আবদুর রব, সিরাজুল আলম খান প্রমুখ ছাত্র ও শ্রমিক নেতা জনগণের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও নির্দেশ মোতাবেক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু জনগণ অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি জানাতে থাকেন।

শেখ মুজিবুর রহমান সন্ধ্যায় হোটেল পূর্বাণীতে এক সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন ওইদিন। সম্মেলনে তিনি ইয়াহিয়াকর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি ২ মার্চ মঙ্গলবার ঢাকা শহরে এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল ও ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার স্বার্থে এক জনসভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

২ মার্চ, ১৯৭১

২ মার্চ ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। জঙ্গি মিছিলে মিছিলে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো শহর। প্রতিটি মিছিলে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি স্লোগান।

সকাল ১১টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালালে ও বেয়নেট চার্জ করলে অন্তত ৯ ব্যক্তি হতাহত হয়। এদিন ন্যাপ-এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন

মহিউদ্দিন আহমদ, মতিয়া চৌধুরী, সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক, সরদার আবদুল হালিম ও নূরুর রহমান প্রমুখ। জাতীয় লীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ-জনসভা অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকররম চত্বরে। সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান খান এতে বক্তৃতা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও প্রতিবাদ-মিছিল-শোভাযাত্রায় উত্তাল থাকে এ দিন। অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল ছাত্রসভা। সভায় প্রথমে উত্তোলন করা হয় পতাকা। ঘোষণা করা হয়, এই পতাকা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। পতাকায় খচিত ছিল সবুজ পটভূমির ওপর লাল বৃত্তের মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র। এই বিশাল ছাত্র-জনতার সভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা এবং এর জন্য শেষ পযন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আহ্বান জানানো হয়।

সভার শুরুতে ছাত্র লীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ছাত্রসমাজকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করান। সভায় ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর বর ও ছাত্র লীগ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখনও বক্তৃতা করেন। সভা চলাকালে মাইকে অবিরাম স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে স্লোগান দেওয়া হতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় ওই সভায়। সভা শেষে অনুষ্ঠিত এক বিরাট ছাত্র মিছিলে স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান দেওয়া হতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় ওই সভায়। সভা শেষে এক বিরাট ছাত্র-মিছিল স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান দিতে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বায়তুল মোকাররম অভিমুখে চলে যায়।

এ দিনই বেতার মারফত আকস্মিকভাবে কারফিউ ঘোষণা করা হয়। কারফিউর ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস, শ্রমিক এলাকা ও ঢাকার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা থেকে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা কারফিউর বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে মিছিল সহকারে পথে নেমে আসে। তাঁদের কণ্ঠে ছিল এইসব স্লোগান : 'কারফিউ মানি না, মানি না,' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর,' 'জয় বাংলা' ইত্যাদি।

সন্ধ্যায় কারফিউ ভঙ্গ করতে গিয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হাতে বহু লোক হতাহত হয়। ৩ মার্চ তারিখে আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। জনতা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ি কোনো মতেই চলাচল করতে না পারে। ২ মার্চ রামপুরায় এ রকমই একটি ব্যারিকেড সৃষ্টি করতে গিয়ে সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ১৮ বছর

বয়স্ক জঙ্গি ছাত্রনেতা ফারুক ইকবাল। ফারুক ইকবালের লাশ পরদিন অর্থাৎ ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে নিয়ে আসা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ সমবেত হয়ে প্রয়াত ছাত্রনেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে বিপুল জনতাও এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপক সভায় সমবেত হন। নামাজে জানাজা শেষে শহীদ ফারুক ইকবালের মরদেহ আজিমপুর গোরস্তানে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়।

৩ মার্চ

শেখ মুজিবুর রহমান পল্টন ময়দানে এদিন বিশাল এক জনসভায় ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে ঘোষণা করেন অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি। আজ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই অসহযোগ। কর্মসূচির মধ্যে ছিল : ভোর ৫টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত হরতাল। এই হরতালের সময় কোর্ট-কাচারি, সরকারি অফিস, কল-কারখানা, রেল, স্টিমার ও বিমানসহ সব কিছু বন্ধ থাকবে। সামরিক বাহিনীর অত্যাচার বন্ধ ও তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে না নেওয়া এবং জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত ট্যাক্স ও খাজনা প্রদান বন্ধ। পানি, বিদ্যুৎ ও এ্যাম্বুলেন্সসহ সাংবাদিকদের গাড়ি এই হরতালের আওতামুক্ত থাকবে। তিনি ওই সভায় আরো ঘোষণা করেন, এই কয়েকদিনের মধ্যে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন না হলে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এদিনকার জনসভায় যোগদানকারী বিশাল জনসমাবেশ আশা করেছিল শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কিন্তু তিনি তা দেননি।

তবে এরই মধ্যে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীন বাংলার ঘোষণাপত্র প্রচার করে। এই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে ছিলেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্র লীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ।

স্বাধীন বাংলার ওই সংক্ষিপ্ত ঘোষণাপত্রের ভাষ্যটি ছিল এ রকমের :

"স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।"

"স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।"

জঙ্গি ছাত্রসমাজ

জঙ্গি ছাত্রসমাজ জহুরুল হক হলকে তাদের সংগ্রাম পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র বা ঘাঁটিতে পরিণত করে। ছাত্রসমাজের এই মূল নেতৃশক্তি ছাত্র লীগের ছিল মূলত ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা। তাই তাঁরা হাতবোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি তৈরির দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেয়।

ওইসময় ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নই ছিল ছাত্রসমাজের বৃহত্তম দুই সংগঠন। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী-নেতারা জগন্নাথ হলকে তাঁদের এই সংগ্রামের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ঘাঁটি করে তোলেন। তাঁদের চিন্তাধারা ছিল সমাজতন্ত্রের ভাবধারা সম্পৃক্ত। ফলে তাঁরা নিজেদের কর্মী-সমর্থকদের এই সময় যেমন রাইফেল ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন, তেমনি তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেন ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার কাজে।

৪-৫ মার্চ

এদিন ঢাকা ও প্রদেশের সর্বত্র পালিত হয় পূর্ণ হরতাল। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র অচল হয়ে যায় বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা। ফলে অকার্যকর কারফিউ তুলে নিতে বাধ্য হয় সরকার। শুধু তাই নয়, ঢাকা বিমানবন্দরে তারা সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। ঢাকা নগরীর সর্বত্র, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে জনসাধারণ গড়ে তুলতে থাকে ব্যারিকেড। সকল ধরনের সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিমান, রেল, স্টিমার, লঞ্চ, বাস, ট্যাক্সি, ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স সংস্থাসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

এদিন চট্টগ্রাম শহরে আন্দোলনগত পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সেখানে শুরু হয় বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষ এবং তা অব্যাহত থাকে। ফলে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩ থেকে ৪ মার্চ—এই দুদিনের মধ্যে চট্টগ্রামে ১২০ জন নিহত ও ৩৩৫ জন আহত হয়।

ওদিকে খুলনায় ২ মার্চ থেকে পূর্ণ হরতাল চলছিল। ফলে শহরে জারি করা হয়েছিল কারফিউ। ৩ মার্চ সেখানে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়।

৫ মার্চ টঙ্গী শিল্প এলাকায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে বহু শ্রমিক হতাহত হয়। ফলে সমগ্র টঙ্গী শিল্পাঞ্চল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বড় বড় গাছপালা ফেলে তারা পথে পথে সৃষ্টি করে ব্যারিকেড। সেনাবাহিনীর যানবাহন চলাচলের পথে সৃষ্টি করে প্রবল প্রতিবন্ধকতা।

ওইদিন রাজশাহীতে সামরিক বহিনীর গুলিতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। যশোরে ৩ মার্চ সেনাবাহিনী মিছিলের ওপর গুলি চালালে সেখানেও অনেক লোক হতাহত হয়।

৫ মার্চ তারিখে ঢাকার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক-কবি-শিল্পীবৃন্দ জনতার চলমান আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা ঘোষণা করে পথে নেমে আসেন।

৬ মার্চ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এদিন বেতার মারফত ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এ ঘোষণা ছিল ধোঁকাবাজির নামান্তর। বাংলার আপামর মানুষের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্য সৈন্য আমদানি করার লক্ষ্যে সময় নেওয়াই ছিল এই ঘোষণার গোপন তাৎপর্য। এদিনও অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে পূর্ণ মাত্রায়।

এদিন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে চলমান আন্দোলনকে বেগবান করা এবং তাকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সে কথা উল্লেখ করা হয়।

সেনাবাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে টঙ্গীতে এদিন কাজী জাফরের সভাপতিত্বে ও নেতৃত্বে এক বিশাল জনসভা এবং মিছিল হয়। ছাত্র লীগ সন্ধ্যায় বের করে এক বিরাট মশাল শোভাযাত্রা।

৭ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও ঘোষণা

এদিন ঢাকার রেসকোর্সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। দুপুরের ভেতরেই লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে পূর্ণ হয়ে যায় রেসকোর্সের বিশাল ময়দান। তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। জনতার মহাসমুদ্রে পরিণত হয় এ দিন ওই ময়দান। মানুষের হাতে হাতে গাঢ় সবুজের পটভূমিতে লাল বৃত্তের মাঝখানে সোনার বাংলার মানচিত্র আঁকা পতাকা আর ব্যানারে ব্যানারে সয়লাব জনতার সমুদ্র। উপস্থিত জনতার কারো হাতে বাঁশের লাঠি, ঢাল-সড়কি, কারো হাতে গাছের ভাঙা ডাল। 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম,' 'আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ', 'পরিষদ না রাজপথ, রাজপথ, রাজপথ,' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি স্লোগানে স্লোগানে উদ্দীপ্ত, প্রকম্পিত রেসকোর্স ময়দান।

আজ বহু প্রতীক্ষিত ভাষণ দেবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সবাই উন্মুখ তাঁর সেই ভাষণ শোনার জন্য। সবারই আশা, অধীর প্রতীক্ষা, তিনি আজ বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। আর এ লক্ষ্যে দেবেন পরবর্তী করণীয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশও।

দুটোর সময় সভা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা শুরু হয় তিনটার সময়। বঙ্গবন্ধু সভাস্থলে পৌঁছুতেই আবার মুহুর্মুহু স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রেসকোর্সে সমবেত জনতার মহাসমুদ্র।

বঙ্গবন্ধু অবশেষে শুরু করেন তাঁর ভাষণ। সেই ঐতিহাসিক ভাষণ। তিনি বললেন, "...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা...।"

তিনি উপস্থিত বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তা দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের এই ঘোষণা ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতারই ঘোষণা। এই ঘোষণা উপস্থিত জনতা ও দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত-অনুপ্রাণিত করে সীমাহীনভাবে।

বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণ ঢাকা বেতার থেকে সরাসরি প্রচার করার ব্যাপারে বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁদের আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন এবং বাস্তবেও তা শুরু

হয়েছিল, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করায় তা শেষ পর্যন্ত আর সম্প্রচার করা সম্ভব হয় না। এর প্রতিবাদে বেতারের সব বাঙালি কর্তৃপক্ষ-কর্মচারী বেতার কেন্দ্র ছেড়ে চলে আসেন। ফলে বেতার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। সামরিক কর্তৃপক্ষ ৮ মার্চ সকালে সেই ভাষণ প্রচারের অনুমতি দিলে বেতারের কাজ পুনরায় শুরু হয়। ২৫ মার্চ পর্যন্ত বেতার ও টেলিভিশন একযোগে আওয়ামী লীগের নির্দেশ মতোই পরিচালিত হয়। এদিকে বেতারে পাকিস্তানের জাতীয় সম্প্রচার কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং টেলিভিশনে বন্ধ করা হয় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার প্রদর্শন।

এরই মধ্যে সামরিক বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ কালো পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানায়। ২৩ মার্চ থেকে কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হতে থাকে প্রতিটি ভবন শীর্ষে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবকে অপসারণ করে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। টিক্কা খান ছিলেন রূঢ় প্রকৃতির লোক। কোনো বিচারপতিই টিক্কা খানকে শপথ-বাক্য পাঠ করাতে রাজি হন না। ফলে তাকে কেবল সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করে যেতে হয়। ২৫ মার্চের গণহত্যার সূচনায় টিক্কা খান গভর্নর হন এবং জেনারেল নিয়াজিকে নিয়োগ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে।

৯ মার্চ (১৯৭১) মাওলানা ভাসানী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেন, "সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।" তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি সাড়ে ৭ কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা প্রদানের আহ্বান জানান। ২৫ মার্চের মধ্যে এই দাবি মেনে নেওয়া না হলে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন বলেও ঘোষণা দেন এই সভা থেকে।

১৫ মার্চ

১৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের বড় বড় জেনারেলদের সঙ্গে নিয়ে সামরিক প্রহরায় ঢাকায় আসেন। সেদিনই কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বায়তুল মোকাররমে এক সভা করে। আ স ম আবদুর রব ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। আমাদের ওপর সামরিক বিধি-বিধান জারি করার

ক্ষমতা কারুরই নেই। বাংলাদেশের জনগণ কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ মেনে চলবে। বাংলার সকল নারী-পুরুষ ও তরুণ-তরুণীকে সৈনিক হতে হবে। গণশত্রুরা আমাদের দেশকে ভিয়েতনাম ও হিরোশিমার মতো বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। এই সর্বাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। এ সভায় আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ ও নূরে আলম সিদ্দিকীও বক্তৃতা করেন।

১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট হাউসে কড়া সামরিক প্রহরায় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনার প্রহসন শুরু হয়। এই আলোচনা শুরু করার একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল কালক্ষেপণ করা এবং পূর্ববাংলার জনগণের ওপর ভবিষ্যৎ আক্রমণ পরিচালনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবহিনীর লোক আনা।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা শুরু হলেও বিক্ষুব্ধ জনতার আন্দোলন কিন্তু থেমে থাকে না। চলতে থাকে তাদের সভা-সমাবেশ ও শোভাযাত্রা। স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো রকম আপস নয়—দিকে দিকে এই আওয়াজ উঠতে থাকে জোরেশোরে।

এদিকে সামরিক বাহিনীর নির্যাতন সমান গতিতেই চলতে থাকে। খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকার পিলখানা, ফার্মগেট ও শের-ই-বাংলা নগর এলাকায় মিছিল ও বিক্ষোভকারীদের ওপর সেনাবাহিনীর তরফ থেকে নির্যাতন চালানো হয়। এবং এসব নির্যাতনের হাত থেকে মা-বোনেরাও রেহাই পাননি, এমন কি কোলের শিশুও।

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়ার বৈঠক বসে। এই দিন ছিল তাঁর জন্মদিন। তিনি তার জন্মদিন উপলক্ষে বলেন, 'আমি আমার জন্মদিনের উৎসব পালন করি না। দুঃখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই-বা কি, মৃত্যু দিনই-বা কি।... আমার জীবন নিবেদিত জনগণের জন্য। আমি যে তাঁদেরই লোক।'

১৯ মার্চ ঢাকার জয়দেবপুর ও গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বহিনীর লোকজনের সঙ্গে জনসাধারণ ও বাঙালি সৈনিকদের এক সংর্ঘষ হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকরা পশ্চিম পাকিস্তানি কমাণ্ডের নির্দেশ অমান্য করে স্বদেশী ভাইদের বুকে গুলি চালাতে অস্বীকার করেন। ওই এলাকার জনসধারণ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের চলাচল বন্ধ করার জন্য পথে পথে গড়ে তোলেন অসংখ্য ব্যারিকেড। পাকিস্তানি সৈন্যরা সেগুলো তুলে ফেলবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সেনাবাহিনী গুলি চালায়। শুধু তাই নয়, মহল্লায় মহল্লায় ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে অশেষ নির্যাতন করে। ফলে বহু লোক হতাহত হয়। এই সময় জয়দেবপুরে

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান অবস্থান করছিল। ব্যাটেলিয়ানদের নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করা হলে তা ব্যর্থ হয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মেজর শফিউল্লাহ।

১৯ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের তৃতীয় দফা বৈঠক শুরু হয়। শেখ সাহেব জয়দেবপুর ও টঙ্গীতে নিরীহ জনসাধারণের ওপর পাকবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, তারা যদি মনে করে থাকেন যে, বুলেট ও শক্তির বলে জনগণের সংগ্রাম দাবিয়ে রাখা যাবে, তা হলে তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। জনগণ যখন রক্ত দিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাদের দমন করা শক্তি দুনিয়ার কারোরই থাকে না।

২০ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও ড. কামাল হোসেকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেড় ঘণ্টা যাবৎ এক বৈঠক করেন। ২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ৯০ মিনিটব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংকট নিরসনের জন্য দিনের পর দিন যখন আলোচনা চালাচ্ছিলেন এবং তার থেকে কোনো ফল বেরিয়ে আসছিল না, সেই প্রেক্ষাপটে জনসাধারণ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। এই অবস্থায় অগণিত মানুষ প্রতিদিন মিছিল ও শোভাযাত্রা সহকারে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরের বাড়িতে ভীড় জমাতে এবং স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগানে মুখর হতে লাগলেন। অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান তার জেনারেলদের নিয়ে সামরিক অভিযানের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। প্রতিদিন ৬ থেকে ১৭টি পর্যন্ত পিআইএ-র ফ্লাইটে বোয়িং ৭০৭ বিমান সৈন্য ও রসদ নিয় সিংহল হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখছিল। অন্যদিকে জাহাজযোগে চট্টগ্রাম বন্দরে আসছিল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র। এইভাবে পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান তার সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করে চলেছিল শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে সময়ক্ষেপণের বদৌলতে।

২১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক সলাপরামর্শে মিলিত হবার জন্য ভুট্টো তার ১২ জন উপদেষ্টা নিয়ে কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকায় এসে উপস্থিত হন।

এ দিকে জনগণের মিছিল-শোভাযাত্রা সমানে চলতে থাকে। ওই সব মিছিল-শোভাযাত্রা থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত দাবি জানানো হতে থাকে।

২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পতাকার রঙিন প্রতিলিপি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়। এই দিন বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের

বাসভবনে মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে। তাঁদের একটাই মাত্র দাবি, স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারিত হোক বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে। বঙ্গবন্ধু প্রতিটি মিছিল-শোভাযাত্রার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং বলেন, আমার রক্ত দিয়ে আপনাদের ঋণ শোধ করব। এইদিন ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও শেখ মুজিবের মধ্যে ৭২ মিনিটকাল বৈঠক হয়।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ২৩ মার্চ ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র গৃহ শীর্ষেও উত্তোলন করা হয় এই পতাকা। এ দিনকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সকালবেলা পল্টন ময়দানে 'জয় বাংলা বাহিনী'র কুচকাওয়াজ। সেখানেও স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। গাওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা...' গানটি। 'জয় বাংলা' বাহিনীর ছিল ১০টি প্লাটুন ও একটি ব্যান্ড প্লাটুন। এই প্লাটুন শেখ মুজিবুর রহমানের বাসগৃহে গমন করে। সেখানে বঙ্গবন্ধু এই বাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।

সাধারণ ছাত্র ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাধীনতা রক্ষায় সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনসাধাণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। 'জয় বাংলা' ধ্বনির ভেতর দিয়ে শ্রমিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, যে জাতীয় পতাকা আমরা উড়িয়েছি, তা প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। যে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করেছি, তার থেকে পিছিয়ে আসাও সম্ভব নয়।

একই দিনে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগেও শহীদ মিনারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতায় বলেন যে, সরকার একদিকে পূর্ববাংলার দাবি মেনে নিতে বিলম্ব করছে, অনদিকে সামরিক বাহিনী অধিকতর তৎপরতা ও প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। সভার বক্তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার আহ্বানও জানান।

২৪ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং ড. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাবৃন্দের সঙ্গে দুঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ যখন এই আলোচনা বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন একই সময়ে চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর এবং ঢাকার মিরপুরে পাকবাহিনীর সাহায্যে অবাঙালিরা বাঙালি নিধন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। চলছে তাদের হত্যা, লুঠতরাজ, ধর্ষণ প্রভৃতির মতো কাজ। ফলে বহু বাঙালি হতাহত হয়। যশোরে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ এবং হেড কোয়ার্টারের জওয়ানরা 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গান গেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে তাঁর প্রতি

অভিবাদন জানান। সেদিন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে মিছিলের পর মিছিল এসে সমবেত হতে থাকে। এসব মিছিলের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সঙ্গে, শহীদের রক্তের সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। আমি কঠোরতর নির্দেশ দেবার জন্য বেঁচে থাকব কিনা জানি না। দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

এদিকে ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করার কাজ চলতে থাকে।

ইয়াহিয়া খান সম্ভবত আশা করেছিলেন যে, শেখ সাহেব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন আর এ ব্যাপারটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে তিনি বাঙালিদের ওপর শুরু করবেন সামরিক অভিযান। কিন্তু শেখ সাহেব তাঁদের সেই সুযোগ না দেওয়ায় ইয়াহিয়া খান ধরলেন ভিন্ন পথ। ১৬ মার্চ থেকে আলোচনার নামে শুরু করলেন প্রকৃত প্রহসন।

শেখ সাহেবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার যেসব মূল বিষয়ে মতৈক্য হয়, সেগুলো ছিল :

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রেসিডেন্টের ঘোষণা মারফত বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে।

২. প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

৩. ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৪. শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদনকল্পে পরিষদের যুক্ত অধিবেশনের প্রস্তুতিস্বরূপ জাতীয় পরিষদ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের পৃথক অধিবেশন। ইয়াহিয়া কতগুলি অবাস্তব সুবিধার কথা এ প্রসঙ্গে তুলেছিলেন। যথা, ৬ দফা বাংলাদেশ ও কেন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর বিধান হিসেবে কাজ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের কতগুলো অসুবিধা সৃষ্টি করবে। এ কারণেই ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র এবং এক ইউনিট ভেঙে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানি এমএনএ-দের একত্র বসার সুযোগ দিতে হবে।

এরই মধ্যে বাহ্যত শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খানের খানের মধ্যে নীতিগত মতৈক্য হয়ে গেলেও শুধু অন্তবর্তীকালীন সময়ে বাংলাদেশ ও কেন্দ্রের ক্ষমতা নিরূপণের প্রশ্নের নিষ্পত্তিই বাকি থেকে গেল। এই অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান বের করার জন্য প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম এম আহমদকে বিশেষ বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আনা হয়।

এম এম আহমদ ঢাকা এসেই স্পষ্টভাবে জানালেন, রাজনৈতিক ঐক্য হয়ে গেলে, এমন কি অন্তর্বর্তীকালীন ৬ দফার অনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কোনো সমস্যাই দূরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করবে না। ২৪ মার্চের বৈঠকে আওয়ামী লীগ কিছু কিছু ভাষাগত পরিবতর্ন করে সংশোধনীসমূহ গ্রহণ করল এবং ইয়াহিয়া ও মুজিবুর রহমানের উপদেষ্টাদের মধ্যে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত বৈঠক ডাকার পথে কার্যত কোনো বাধাই থাকল না।

এখানে বলা দরকার যে, কোনো সময়ই আলোচনা ভেঙে যায়নি। ২৪ মার্চ ইয়াহিয়া ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত বৈঠকের পর সেখানে যখন এম এম আহমদ তাঁর সংশোধনী পেশ করলেন, খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে জেনারেল পীরজাদা তখন বৈঠক আহ্বানের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এমন কোনো আহ্বান এলো না। জানা গেল, আলোচনার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি এম এম আহমদ আওয়ামী লীগকে কোনো কিছু না জানিয়ে ২৫ মার্চ সকালে করাচির পথে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

ওই দিনই, অনেকেই আশা করেছিলেন যে, একটা কিছু সমঝোতা হবে। তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, এখন আর আলোচনা নয়, এবার সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই। ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর আলোচনার পর ভুট্টো সাংবাদিকদের জানান যে, পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। সাংবাদিকরা তখন তখনই তড়িৎ গতিতে বঙ্গবন্ধুর কাছে ছুটে এলেন। বঙ্গবন্ধু ভুট্টোর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। আলোচনার মাঝপথে একজন এ মর্মে খবর নিয়ে এলেন যে, ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে চলে গেছেন এবং যাওয়ার আগে সেনাবাহিনীকে দিয়ে গেছেন চরম আদেশ।

এ অবস্থায় শেখ সাহেব ২৭ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করলেন।

বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রচারিত তাঁর এক বিবৃতিতে বললেন, "আমি সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরে সামরিক অভিযানের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। বেসামরিক জনসাধারণের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের সংবাদ আসছে—প্রেসিডেন্ট স্বয়ং যখন ঢাকায় আমি তাঁকে অবিলম্বে এইসব সামরিক অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা জেনে রাখা উচিত যে, নিরন্ন জনসাধারণকে হত্যা ও তাঁদের ওপর পরিচালিত বর্বরতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেওয়া হবে না। আমার এ আস্থা আছে যে, বাংলাদেশের সাহসী সন্তানরা তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য সব ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রস্তুত।" বঙ্গবন্ধুর ওই বিবৃতি ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনের সান্ধ্য সংবাদে প্রচারিত হয়। বিদেশি সাংবাদিকরাও বহির্বিশ্বে সেটা প্রচার করেন।

ওইদিনই ঢাকা থেকে হেলিকপ্টরে জেনারেল খাদিম রাজা, জেনারেল মিঠ্যা খান ও জেনারেল খোদাদাদ খান চট্টগ্রামে উপস্থিত হন এবং বাঙালি স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার আনসারিকে চট্টগ্রামের স্টেশন কমান্ডার এবং কর্নেল শিগারিকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ডার করা হয়।

২৫ মার্চ রাত আটটার সময় জরুরি সংবাদ নিয়ে এলেন কর্নেল ওসমানী। বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পর পরই একজন অপরিচিত ব্যক্তি দ্রুত রিকশা থেকে নেমে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ঢুকে গেলেন। তিনি তাঁর বাড়ি প্রহরায় নিযুক্ত লোকজনদের জানালেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে একটি জরুরি চিরকুট নিয়ে এসেছেন। সংক্ষিপ্ত অথচ স্বাক্ষরবিহীন ওই চিরকুটে বাংলায় লেখা ছিল, "আজ রাত্রে আপনার বাসভবনটি আক্রান্ত হবে।"

শেখ সাহেব সবাইকে ডেকে এনে আত্মগোপন করতে বললেন। কিন্তু তিনি নিজে থেকে গেলেন তাঁর বাসভবনে।

২৫ মার্চ : গণহত্যার কালো রাত্রি

রাত ১১টায় সামরিক বাহিনী রাস্তায় বের হয়ে আসে। ঢাকা শহরে তখন কোনো কারফিউ ছিল না।

সামরিক বাহিনী রাত ১টার সময় একটি ট্যাংক, একটি সশস্ত্র গাড়ি, এক ট্রাক সৈন্যসহ বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর (ধানমণ্ডি) সড়কের বাসভবনে এসে উপস্থিত হয় এবং গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। গলা উঁচিয়ে একজন অফিসার বলতে থাকে, "শেখ তুমি নিচে নেমে এসো"। বঙ্গবন্ধু ওপরের বারান্দায় এসে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি প্রস্তুত। গুলি চালানোর প্রয়োজন নেই। আমাকে টেলিফোনে খবর দিলেই আমি উপস্থিত হতাম"।

ওই অফিসারটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে বলল, "তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো"। এ সময় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির প্রহরাকাজে নিযুক্ত এক ব্যক্তিকে ভয়ানকভাবে মারপিট করা হয়। শুধু তাই নয়, তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসা পাকবাহিনীর সদস্যরা তাঁর বাড়ি তল্লাশি করে কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায়, তাঁর ভবনশীর্ষে উড্ডীন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা লক্ষ্য করে গুলিও ছোড়ে।

যাই হোক, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ক্যান্টনমেন্টে, পরে সেখান থেকে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় তারা।

সেদিন গভীর রাতে পাকবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ গ্যারিসন (পিলখানা), জগন্নাথ হল ও সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে একযোগে আক্রমণ করে বসে। ওই সময় জহুরুল হক হলে বেশকিছু ছাত্র ছিল। পাকবাহিনী তাঁদের সকলকেই হত্যা করে। জনগন্নাথ হল লক্ষ্য করে তারা অবিরাম ট্যাংক ও মর্টার থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা হলটির রুমে রুমে ঢুকে যেসব ছাত্রকে ধরতে পারে, তাঁদের সবাইকে এনে দাঁড় করায় জগন্নাথ হলের মাঠে এবং হত্যা করে ব্রাশফায়ার করে। অধ্যাপক জি সি দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা ও ডা. সিরাজুল হক খানসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা মোট ৭ জন অধ্যাপককে এইদিন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে পাকবাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে 'মধুদা' বলে খ্যাত মধুর কেন্টিনের মালিক মধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও হত্যা করা হয় একইভাবে। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বস্তিগুলোও তারা পুড়িয়ে ফেলে।

পুলিশ ও ইপিআর-এর সদস্যদের সঙ্গে পাকবাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। বহুক্ষণ পর্যন্ত গুলি বিনিময় চলে, কিন্তু উন্নততর ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় তারা আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত পাকবাহিনীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠে না।

এমন কি পাকবাহিনী রাস্তায়, ফুটপাথে শুয়ে থাকা নিরীহ ঘুমন্ত মানুষগুলোকে পর্যন্ত রেহাই দেয় না। তাঁদের নির্বিচারে গুলি করে মারে।

ফায়ার ব্রিগেডের লোকজনকেও পাকবাহিনী ডেকে আনে। তাঁরা যখন ইউনিফরম পরে লাইন করে দাঁড়ায়, তখন তাঁদের সবাইকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হলে, তাঁরা একে একে মৃত্যুমুখে লুটিয়ে পড়ে। যাঁদেরই তাদের কাছে ছাত্র বলে মনে হয়েছে, তাঁদের কারোরই জীবন রক্ষা পায়নি তাদের হাত থেকে।

হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত তাঁতিবাজার ও শাঁখারি বাজারে তারা আগুন ধরিয়ে দিলে, সেই আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে ভয়-ভীতিতে যাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন, তাঁদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় গুলি চালিয়ে। এ ছিল এক বীভৎস গণহত্যা। এভাবে হত্যা করা হয়েছিল ঢাকা শহরের প্রায় ৫০ হাজার মানুষকে। এভাবে সারা বাংলাদেশে পাকবাহিনী এক পৈশাচিক অত্যাচার অভিযানের সূচনা করে, যার সঙ্গে তুলনা চলে কেবল হিটলারের ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের।

২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা দিলেন যে, "আমি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঘোষণা করছি, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যান।" এই ঘোষণার সময় আওয়ামী লীগ নেতা হান্নানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে জিয়াউর রহমানের এই ভাষণ অপরিমেয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

২৭ মার্চের পর থেকে পাকবাহিনীর এই অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ দলে দলে নিরাপদ আশ্রয়ে এবং সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে যায়। বর্বর পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ঢাকা শহরের কোনো কোনো এলাকায় গেরিলা আক্রমণ চলতে থাকে। ছাত্ররা বেশকিছু স্থানে সৈন্য চলাচলে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ব্যারিকেড রচনা করে। কিন্তু এসব ব্যারিকেড অপসারণ করে বর্বর পাকবাহিনী তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখে। এই সময় পাকবাহিনীর ওপর কিছু বোমাও নিক্ষিপ্ত হয়।

এদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো সরে পড়েন। তাঁরা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করেন। দেশের ছাত্র, যুব, তরুণসহ সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ হানাদার পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও তাদের পরাস্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। ঐক্যবদ্ধ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাকবাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়ায় জামায়াতে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও অবাঙালিরাও। মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী, প্রধানত জামাতে ইসলামীর সক্রিয় উদ্যোগেই গড়ে ওঠে রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌স প্রভৃতি জঙ্গি ও ঘাতক বাহিনী।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা অংশ নিতে চান, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অভূতপূর্ব সাহায্য প্রদান করেন। বাংলাদেশের প্রায় কোটি খানেক মানুষ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসব দেশত্যাগী শরণার্থীর আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসার জন্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশেষত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে সংঘটিত পাকবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডেরও তীব্র প্রতিবাদ জানান ইন্দিরা গান্ধী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পদগর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে বাংলাদেশে সংঘটিত ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে একটি তারবার্তা পাঠান ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল। ওই তারবার্তার সারাংশ এখানে দেওয়া হলো :

"মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহোদয়,

ঢাকায় আলোচনা ভেঙে যাওয়া এবং প্রশাসন কর্তৃক চূড়ান্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন মনে করে সামরিক বল প্রয়োগের খবর সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। এই ঘটনার ফলে পাকিস্তানের অগণতি মানুষের প্রাণহানি, নিপীড়ন ও দুঃখ-কষ্টের খবরে সোভিয়েত জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিকে বন্দী ও নির্যাতন করার জন্যও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করছে।

পাকিস্তানের জনগণের কঠিন পরীক্ষার দিনে খাঁটি বন্ধু হিসেবে আমরা দুএকটা কথা না বলে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানে বর্তমানে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বল প্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবেই তার সমাধান করা যায় এবং করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে দমননীতি এবং রক্তপাত যদি চলতে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সমস্যার সমাধান আরো কঠিন হয়ে উঠবে এবং তাতে করে পাকিস্তানের সকল মানুষের মৌল স্বার্থই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রেসিডেন্ট মহোদয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাকে কিছু বলা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। পূর্ব পাকিস্তানের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য, সেখানকার মানুষের ওপর পরিচালিত নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য এবং সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় উদ্ভাবনে অত্যন্ত জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের সব মানুষের স্বার্থ এর ফলে রক্ষিত হবে।

ক্রেমলিন, মস্কো
২ এপ্রিল ১৯৭১"

১৭ এপ্রিল (১৯৭১) :
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অভ্যুদয়

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের আমবাগানে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। সরকার গঠন উপলক্ষে ওই দিনের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও দেশি-বিদেশি বহু সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানসূচির ঘোষণায় ছিলেন আবদুল মান্নান।

একটি ছোট মঞ্চ। মঞ্চের ওপর ফরাস (কার্পেট) বিছানো। তার ওপর পাতা ছখানা চেয়ার। উঁচু ওই মঞ্চের নিচে এক কোণায় পাতা আরো কয়েকটি চেয়ার। চেয়ারগুলোর গায়ে লেখা 'সাংবাদিক'—এই শব্দটি। অন্য পাশে আরো কয়েকখানা চেয়ার। সেগুলোও সংরক্ষিত আমন্ত্রিত অভ্যাগত অতিথিদের জন্য।

নির্দিষ্ট সময়ে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করলেন প্রথমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং তাদের পরপরই খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও কর্নেল ওসমানী। আগেই বলেছি, অনুষ্ঠানসূচির

ঘোষক ছিলেন আবদুল মান্নান। তিনি চিফ হুইপ হিসেবে নাম ঘোষণা করলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলীর। তিনিই পাঠ করে শোনালেন নতুন রাষ্ট্রের ঘোষণাপত্র। এরপর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান। আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম হলেন উপ-রাষ্ট্রপ্রধান। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর ওপরই।

উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল মঞ্চে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করলেন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমি তাজউদ্দীন আহমদকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করছি। তাঁরই পরামর্শক্রমে আমি নিয়োগ করছি আরো চারজন মন্ত্রী। তিনি এই অনুষ্ঠানে আরো ঘোষণা করলেন যে—বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চের আগেই বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে এম এ জি ওসমানীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাই তাঁকে আজ সেই দায়িত্বে সরকারিভাবে অভিষিক্ত করা হলো। এই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন সেনাবাহিনী প্রধানের চিফ অব স্টাফ হিসেবে আব্দুর রবের নাম।

এই সময় একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, "জনাব প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের কতটুকু জায়গা এখন আপনাদের দখলে আছে?" প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন জবাব দিলেন, "কেবল কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি ছাড়া গোটা দেশই আমাদের দখলে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির এটাই রাষ্ট্র। ওরা হানাদার। ওদের আমরা বিতাড়িত করবই।"

ঘোষণার সারাংশ

"আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি। এতদ্বারা আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার

অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। ইহা ছাড়া তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, যে কোনো কারণে রাষ্ট্রপ্রধান যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কাজে যোগদান করিতে না পারেন, অথবা তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে, উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব। আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।”

তাজউদ্দীন সাহেব ভবেরপাড়া স্থানের নাম বদলে রাখেন ‘মুজিবনগর’।

মুক্তিবাহিনী

২৫ মার্চের গভীর রাত থেকে সারা বাংলাদেশে গণহত্যা, উৎপীড়ন-নির্যাতন, নারী ধর্ষণসহ লুটপাট ও ব্যাপক অগ্নিসংযোগের যে তৎপরতা শুরু হয়, তার সঙ্গে কেবল হিটলারের ফ্যাসিস্ট তৎপরতারই তুলনা করা চলে।

দেশ জোড়া এই অবস্থার প্রেক্ষাপটেই অবিলম্বে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অথচ সক্রিয় অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠল এক বিরাট-বিশাল মুক্তিবাহিনী।

মুক্তিবাহিনীর একটি দল দেশের ভেতরে থেকে শুরু করল গেরিলা কায়দায় অভিযান। তাঁদের এই অভিযানে ঘায়েল হতে থাকল পাকবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর অপর অংশটি ভারতে চলে গেল। সেখানে গিয়ে তাঁরা গ্রহণ করল সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ। ভারত সরকার তাঁদের প্রশিক্ষণ দানের পর অস্ত্র সজ্জিত করে গড়ে তোলেন পাকা সৈনিক হিসেবে। তাঁরা বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন আগরতলা, মেঘালয় ও চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয় পাকবাহিনীর সঙ্গে।

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নও সম্মিলিতভাবে তাঁদের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী ও সদস্য-সমর্থকের সমন্বয়ে গড়ে তোলে এক গেরিলা বাহিনী। আমাদের এই বাহিনী গ্রহণ করে এক উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ।

কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড আবদুস সালাম, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ ও মণি সিংহ মে মাসের দিকে দিল্লি গমন করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাদের নেতৃত্বে গড়ে তোলা বাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার অনুরোধ জানান। আমরা শ্রীমতী গান্ধীকে বলি, "পাকিস্তানের পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম করছি। আমাদের অস্ত্র দিলে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে যাব।"

ইন্দিরা গান্ধী আমাদের অনুরোধের জবাবে বলেন, "আপনাদের এই সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবহিত। সেটা আমরা অস্বীকার করি না।" অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরও আমাদেরকে অস্ত্র দেবার ব্যাপারে সেদিনই তিনি স্বীকৃত হননি। বেশ পরে তিনি আমাদের তিন সংগঠন—কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে গঠিত বাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হন। আমাদের এই বাহিনী পরে ভারত থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে যথাযোগ্য অবদান রাখে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

'৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আমি জেল থেকে (একটানা ২০ বছর আত্মগোপনে থাকার পর গ্রেপ্তার হই ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে) মুক্তি পাই ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে। ওই দিনই জেল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও মুক্তি পান। আমার সঙ্গে আমাদের পার্টির আরো তিন-চারজন কমরেড ও ন্যাপ-এর মতিয়া চৌধুরী ওই একই দিনে মুক্তি লাভ করেন।

মুক্তি পাওয়ার পর বিশ্রাম নেওয়ার কোনো রকম অবকাশ মেলে না কিংবা তার প্রশ্নই ছিল না। আমাকে নানা জায়গায় সভা করে বেড়াতে হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়েই এসে উঠেছিলাম সাহিত্যিক-সাংবাদিক সত্যেন সেন যেখানে থাকতেন, মুনির হোসেন লেনের সেই এক নম্বর বাসায় ঠিকানায়। করিম আর হেলেনদের বাসায়।

এ বাসায় এসে ওঠার দিন কয় পরে এক বিকেলে একজন যুবক এসে আমাকে খবর দিল যে, রংপুরের মশিউর রহমান যাদু মিয়া পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। যাদু মিয়ার সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছিল আগে থেকেই। আমি যুবকটিকে বললাম, কোনো অসুবিধা নেই। তিনি আসতে পারেন। যাদু মিয়া আসলেন। আমাদের দুজনের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে

অনেকক্ষণ কথা হলো। কথা চলার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, "আমি আপনাকে একটা বিশেষ খবর দিতে এসেছি। খবরটা হলো, খুব শিগগিরই একটা ক্যু হতে যাচ্ছে। ক্যু সংঘটিত হবার তারিখেরও উল্লেখ করলেন তিনি। এই সঙ্গে আরো বললেন, কী ধরনের ক্যু হবে সে সম্পর্কে জানি না। দক্ষিণপন্থী হতে পারে। তবে দক্ষিণপন্থী ক্যু হলে আপনাদের খুবই মুশকিলে পড়তে হবে।" আমি যাদু মিয়ার কথার জবাবে সোজাসুজি বললাম, "যে ধরনেরই ক্যু হোক না কেন, আমি আর আন্ডারগ্রাউন্ডে যাচ্ছি না। যা হয় হবে।"

তখন অনেক রাত। কিন্তু ক্যু সংক্রান্ত খবরটা শোনার পরপরই আমি অত রাতেই গিয়ে হাজির হলাম অধ্যাপক মোজাফফ্‌র আহমদের বাড়িতে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, যাদু মিয়ার কথিত ক্যু সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কিনা। অধ্যাপককে একটু চিন্তিত মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুকে ফোন করলেন। জানতে চাইলেন, অবস্থা কী? কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ জাতীয় আশঙ্কাজনক ঘটনা সম্পর্কে কোনো কিছু অবহিত নন বলে জানাতেই আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

কাজেই পরের দিন আমি ও মতিয়া চৌধুরী চট্টগ্রাম রওয়ানা দেই। সেখানে আমাদের জনসভা ছিল। জনসভার স্থান ছিল শহর থেকে ৩০ মাইল দূরে মিরসরাইয়ে।

সভাস্থলের পাশেই নাজিমউদ্দীন কলেজ। সভা শুরুর আগে কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, সভা শেষে তাঁর ওখানে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে আসতে। সভা শেষে কলেজ সংলগ্ন তাঁর বাসায় বসে আমরা যখন চা খাচ্ছি এবং কথাবার্তা বলছি, তখন স্থানীয় পার্টির একজন কমরেড এসে আমাদের খবর দিলেন, মার্শাল ল জারি করা হয়েছে। রেডিওর সান্ধ্য খবরে বলা হয়েছে সে কথা। তিনি আরো বললেন, "আমরা একটা বাসের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা চট্টগ্রাম শহরে চলে যান।" আমরা তাঁকে বললাম, আমরা চট্টগ্রাম শহরে যাব না। কারণ সেটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই আমরা সেখান থেকে গ্রামের দিকে চলে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন চৌধুরী হারুন-অর-রশীদ। গ্রাম থেকে আমরা সুবিধা বুঝে চট্টগ্রাম শহরে যাই, দুদিন পরে সেখান থেকে মোটরকার যোগে পরে ঢাকায় চলে আসি।

দেশের এই রকম পরিস্থিতির ভেতরেই একটা ঘটনা ঘটে। পার্টির নির্দেশে আমি তখন গোপনে। গোপন অবস্থাতেই খবর এলো, এক বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত খেতে হবে। আমন্ত্রণকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬৯ সালের উত্তাল অভ্যুত্থানের সময়ে। আমি আমন্ত্রণ কবুল করলাম। তখন সন্ধ্যা রাত। আমি সঙ্গে হাবিবকে নিলাম। সেখানে আমাদের আরো দুইজন নেতার

দাওয়াত ছিল। একজন জ্ঞান চক্রবর্তী, অন্যজন মোহাম্মদ ফরহাদ। আমি সন্ধ্যার পর হাবিবকে নিয়ে ওই বাসায় খাওয়ার জন্য হেঁটে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতেই খোঁজ করছি রিকশার। একটু দূরে দেখলাম, একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দুজনেই রিকশায় উঠলাম। কিছুদূর যাবার পর একটা বেবিটেক্সি আমাদের রিকশাকে হঠাৎ করে এসে ধাক্কা দেয়। আমরা হৈ হৈ করে উঠলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, রিকশা চালক নীরব। দেখলাম, ওই বেবিটেক্সি থেকে জোয়ান মতো ৩/৪ জন লোক (লুঙ্গি ও টুপি পরা) নেমে এলো এবং বলল, "চলুন, লালবাগ থানায়।" আসলে তারা ছিল আইবির লোক। আমি বললাম, "আমার নামে কোনো ওয়ারেন্ট নেই, কেন থানায় যাব?" তারা বলল, "আমরা এসবের কিছুই জানি না। আপনাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আমাদের তা পালন করতেই হবে।" কী আর করা, অন্য কোনো উপায় না পেয়ে আমি থানায় গেলাম। আমাকে সারারাত লালবাগ থানায় রাখা হলো। অফিসাররা এসে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অবশ্য কোনো রকম খারাপ ব্যবহার তাঁরা করেননি আমার সঙ্গে। ভদ্র ব্যবহারই করেছেন। এই সময়ে, ঘটনার যোগে কিনা জানি না, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ফয়েজ আহ্‌মদ থানায় এসে দেখলেন, আমি গ্রেপ্তার হয়েছি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কমরেডদের এ খবর জানিয়ে দেন। ফলে আমাদের সকলে জানতে পারেন যে, আমি ও হাবিব গ্রেপ্তার হয়েছি। সকালবেলা আমাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারাগারে অবশ্য আমাকে এক জায়গায় ও হাবিবকে রাখা হয় অন্য জায়গায়।

আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বাইরে আমাদের কমরেডদের কাছে এ মর্মে খবর পাঠাই যে, দাওয়াতকারী ওই ভদ্রলোকের বাসায় আমার উপস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ আগে থেকেই আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য ফাঁদ পেতে রাখে। কাজেই আমার গ্রেপ্তারের ঘটনা কোনো রকম আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা একটা পরিকল্পিত ঘটনা। কাজেই বিয়ষটা অনুসন্ধান করা দরকার। জেল থেকে বাইরে এসে সব ঘটনা পরে জানতে পারি। আমি আমার গ্রেপ্তারের দিন রাত দশটার সময় বাঁ দিকের রাস্তায় একটা রিকশা দাঁড়ানো দেখি। ঠিক ডান দিকের রাস্তায় আরো একটা রিকশা দাঁড়ানো ছিল। ফরহাদ ও জ্ঞান চক্রবর্তী ওই রিকশা দেখে তাতে উঠে বসেন। কিন্তু রিকশাচালক অল্প কিছুদূর গিয়েই বলে বসে যে, আমি যাব না। আপনারা নেমে পড়েন। রিকশাচালক কেন আর যাবে না—ইত্যাদি নানা কথা বলা সত্ত্বেও কিছুতেই যেতে রাজি হয় না। পরে ওই রিকশা ছেড়ে অন্য রিকশা করে ফরহাদ ও জ্ঞান চক্রবর্তী চলে যান।

মূল কথা হলো আমাকে ধরাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। অন্য কাউকে নয়। কাজেই রাস্তার বাঁ ও ডান পাশের দুটি রিকশাই পুলিশের লোকজন আগে থেকেই

সেখানে মোতায়েন করে রেখেছিল। কারণ, আমি কোন পথে যাব পুলিশের জানা ছিল না। পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে জানা যায়, আমন্ত্রণকারী ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আইবির আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল এবং পুলিশের কাছ থেকে টাকাকড়ি পেত। ওই ব্যক্তির চরিত্র সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে যাবে—এই চিন্তায় অন্য দুজন গোপন নেতাকে ধরিয়ে দেননি। চোটটা আমার ওপর দিয়েই গেছে।

যাই হোক, আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। পরে সেখান থেকে পাঠানো হয় রাজশাহী জেলে। রাজশাহী জেলে থাকার সময় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনি। ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার পর পরই বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি একটা টেলিগ্রাম পাঠাই। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে জানালেন, আপনার টেলিগ্রাম যাবে না। কারণ, আইবি অফিসও শেখ সাহেবের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন করছে। আমি এই খবর পেয়ে অবাক হলাম। বই-পুস্তকে পড়েছি, সৈন্যরা জনতার জোর দেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু কোনো দেশের গোয়েন্দা পুলিশ আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, এমন কোনো সংবাদ বই-পুস্তকে কখনো পড়েছি বলে মনে পড়ল না। আমি বুঝলাম, অসহযোগ আন্দোলন অভূতপূর্বভাবে সফল হয়েছে।

জেলখানায় রেডিও মারফত কিছু কিছু খবর পেতে থাকি। এদিকে প্রায় প্রতিদিনই জেলের কর্মচারীরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, আপস আলোচনা চলছে। একটা আপস হয়ে যেতে পারে। আপনি কী বলেন? আমি তাঁদের শেষ পর্যন্ত বলেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো ও সরকার ৬ দফা মানবে না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই আপস হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

এই অবস্থায় একদিন চমক ভাঙে জেলখানার ওপর দিয়ে জেট প্লেনের ঘোরাঘুরি করার ভীষণ শব্দে। গুলিও চালায়। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের জেলখানা ভেঙে কয়েদি পালাবার ঘটনা ঘটেছে। রাজশাহী জেলেও একই রকমের ঘটনার মুখে কয়েদিদের গুলি করে হত্যা করা হয়। অবস্থার মোকাবেলায় বাইরে থেকে আরো পুলিশ এনে জেলখানা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। এই রকম ঘটনার ভেতরেই একজন পুলিশ কর্মচারী মিলিটারি জিপ লক্ষ্য করে গুলি চালাল। ফলে জেলখানার ওপর মিলিটারিদের পাহারা দ্বিগুণ কড়াকড়ি হয়ে ওঠে। জেলের ওপর মিলিটারিদের আক্রমণ হতে পারে—এ জাতীয় আশঙ্কাও আমরা করছি। এই আশঙ্কা থেকেই সন্ধ্যার দিকে আমরা ডিআইজি মোকলেসুর রহমান সাহেবকে খবর পাঠাই—আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কোনো বন্দীই সেদিন লকআপে যাচ্ছে না। ফলে জেলখানায় এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জেলে ওয়ার্ডারদেরও দেখা যাচ্ছে না জেলের মধ্যে।

আমরা রাজনৈতিক বন্দীরা অবশ্য জেলের ভেতরেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ ভাগ করে থাকি। আমরা সবাই মিলে ডিআইজি'র সঙ্গে দেখা করব বলে ঠিক করি। রাজশাহীতে আগে থেকেই একটি মিলিটারি ছাউনি ছিল। সেই মিলিটারি ছাউনি লক্ষ্য করে একজন পুলিশের গুলি চালানোর পর ওই ছাউনির লোকেরা জেলখানায় এসে কিছু ওয়ার্ডারকে ধরে নিয়ে গিয়ে এরই মধ্যে ভীষণভাবে মারপিট করেছে। অন্যদিকে যত বর্ডার পুলিশ ছিল, তাঁরা সীমান্ত চৌকির পাহারা ছেড়ে জেলখানার বাইরে আস্তানা গেড়েছে।

এ অবস্থায় ডিআইজির সঙ্গে আমাদের কথা হলো। আমার সঙ্গে ছিলেন দেবেন সিকদারসহ আরো কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী। ডিআইজিকে আমরা বললাম, "আপনি আমাদের আটকে রাখতে পারেন, কিন্তু আমাদের খুন করতে পারেন না।" তিনি বললেন, "আমি খুন করছি, সে কী রকম কথা!" আমরা বললাম, "যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে যে কোনো সময় জেলখানা আক্রান্ত হতে পারে। আর জেলখানা আক্রান্ত হলে আমাদের মৃত্যু অবধারিত। কাজেই আপনি জেল খুলে দিন, আমরা চলে যাই।" ডিআইজি বললেন, "আমরা জেল খুলে দিলে মিলিটারি আপনাদেরকেই হত্যা করবে।" তিনি আরো বললেন, "আমাকে আগামী সকাল পর্যন্ত সময় দিন। আমি একটা ব্যবস্থা করছি।"

ডিআইজির সঙ্গে কথা শেষ করে তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে দেখি, সব কয়েদি জটলা করে বসে আছে। তাঁরা লকআপে যায়নি। অর্থাৎ নিয়মমতো প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে কয়েদিরা যাঁর যাঁর ওয়ার্ডের তালাবদ্ধ হয়ে থাকে এবং তাদের গোণা-গুনতি হয়। কিন্তু আজ সে কাজটি হয়নি। কয়েদিরা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কী ব্যবস্থা করে আসলেন?" আমরা বললাম, "ডিআইজি সাহেব আমাদের মিলিটারির ভয় দেখালেন। তিনি আগামীকাল সকাল পর্যন্ত সময় চেয়েছেন।" জেলের কয়েদিরা আমাকে 'কাকাবাবু' বলে ডাকত। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "উড়োজাহাজ থেকে গুলি চললে, ঘরের মধ্যে না বাইরে থাকা ভালো।" আমি বললাম, "ঘরের মধ্যে থাকাই ভালো।" তাঁরা আরো বলল, "যাই হোক, আমরা লকআপে যাব না।" আমি বললাম, "এটা আপনাদের ইচ্ছা।" কেউ সেদিন লকআপে যায়নি।

রাত ১১টার সময় একজন নাইট গার্ড (দীর্ঘদিন সাজা খাটতে খাটতে যাঁদের আচরণ ভালো হয়, তাঁদেরকেই সাধারণত পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা রাতে জেলখানার ভেতরে মুক্ত মানুষের মতো পাহারা দেয়। তাঁদের বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়) এসে বলল, "কাকাবাবু, ইপিআর-রা জেলার সাহেবকে বলেছে কয়েদিদের ছেড়ে দিতে। কিন্তু জেলার সাহেব তাতে রাজি হননি। ইপিআর বলেছে, কয়েদিরা যদি চলে যায়, তবে তারা কিছু বলবে না।"

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চকিতে উঠে দাঁড়ালাম। আমি থাকতাম হাসপাতালের একটা হলে। আমার সঙ্গে কারোরই মেশার অধিকার ছিল না। সরকারের নির্দেশ ছিল তাই। আমি সিকিউরিটি বন্দী। আমার রান্নাবান্নার কাজে নিয়োজিত ছিল একজন কয়েদি। আরেকজন কয়েদি নিয়োজিত ছিল আমার সাহায্যকারী হিসেবে। সে আমার অন্য সব কাজ করত। তাঁরা থাকত আমার ঘরেই। ওই ঘরে ছিল চারটা ইলেকট্রিক পাখা। কয়েকজন ছাত্র বন্দীও থাকত আমার এই ঘরে। আমি ছাত্রদের তখনই ঘুম থেকে ওঠালাম। আজ জেল থেকে বের হবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭ এপ্রিল। ভোর হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কয়েদিরা লাল গাড়ির দরজা ভাঙার কাজে লেগে গেল। লালগাড়ি হলো জেলের পেছন দিকের দেয়াল। এর কতকটা অংশ কাটা। ওই কাটা অংশ লোহার আবরণ দিয়ে তালা-চাবি বন্ধ করা। আগে ওই লালগাড়ি দিয়ে জেলখানার পায়খানা প্রভৃতি নিয়ে যাওয়া হতো। এখন স্যানিটারি পায়খানা হওয়ায় তার প্রয়োজন হয় না।

ভাঙচুর করার দুমদাম আওয়াজ হচ্ছে। ধারে-কাছে কোনো ওয়ার্ডার বা জেল পুলিশ নেই। জেলখানার ভেতরেও ওয়ার্ডারদের বাহ্যত কোনো পাহারা নেই। কয়েদিরা ওই লালগাড়ির কাছাকাছি দেয়ালে হাসপাতালের লোহার খাট থাক থাক করে বসিয়েছে। ওই খাটের সাহায্যে জেলপ্রাচীরের ওপরে উঠে কয়েদিরা বাইরে যেতে শুরু করে। আমার সাহায্যকারীরা বলল, “কাকাবাবু, চলেন খাটের ওপর দিয়ে পার হয়ে যাই।” আমি বললাম, “১২ ফিট উঁচু দেয়াল থেকে লাফ দিলে তো আমার পা ভেঙে যাবে। একটা কাজ কর, ধুতি ঠিক করে রাখ। ধুতি বেঁধে ওপারে এসে পড়ব। দেখ, লালগাড়ি ভাঙতে পারো কিনা। তাহলে সহজেই যাওয়া যাবে।”

অল্পক্ষণ পরেই লালগাড়ি ভেঙে ফেলল কয়েদিরা। আমরা লালগাড়ি দিয়েই বের হলাম। কোনো অসুবিধা হলো না। আমার সাহায্যকারীদের মাথায় দুটো সুটকেস। আমি বললাম, “সুটকেসে যে জামা-কাপড়-জুতো আছে, সব পরে নাও। মুক্তি পেয়ে গেলে অনেক কাপড়-চোপড় হবে। এই সুটকেস নিয়ে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে।”

আমার কথায় তারা সুটকেস রেখে দিল। ভোরের দিকে আমরা জেলের পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে আসলাম। জেলখানার পেছনে একটা রাস্তা। দেখলাম বহুলোক সেখানে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা আমাদের নদীর পারের দিক দেখিয়ে দিলেন। আমরা হেঁটে চরের পথ ভেঙে নদীর কাছে এলাম। দেবেন সিকদার অন্যপথে চলে গেলেন। নদীর পারে এসে দেখলাম, একটা বড় নৌকা অপর পার থেকে এদিকেই আসছে। নৌকাটা তীরে ভিড়তেই

আমরা প্রায় ৫০/৬০ জন তাতে চেপে অপর পারে এলাম। শুনলাম, এ পারের কতক অংশ না কি পাকিস্তানের। যা হোক, অবস্থা বুঝে আমরা উত্তর দিকে রওয়ানা দিলাম। আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আসতেই একজন বলল, মিলিটারিরা আমাদের ডাকছে। আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। মিলিটারিরা সব নেপালি। এবার বুঝলাম, আমরা ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে পা রেখেছি। নেপালি সৈন্যরা বলল, যুবকরা যেতে পারবে না। তাঁরা লড়াই করবে। বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের যাওয়ার হুকুম আছে।

আমার সঙ্গে একটা ১৪ বছরের ছেলে ছিল। তার বাবা-মা আগেই ভারতে চলে এসেছে। নেপালি সৈন্যরা তাকেও যেতে দেবে না। সে বন্দুকের গুলিতে সামান্য আঘাত পেয়েছিল। আমি বললাম, ও বয়সে এখনো ছোট, ওকে যেতে দিন। আমার কথায় ছেলেটিকে তাঁরা ছেড়ে দিল।

এদিকে ছাত্ররা বলল, আপনি এদের বুঝিয়ে বলুন, যাতে এই সৈন্যরা আমাদের ছেড়ে দেয়। আমি বললাম, এরা ১২৩-এর লোক। হাজার বললেও হুকুম যা আছে তা পালন করবেই। এর নড়চড় হবে না। আমি ছাত্রদের বললাম, আর একটু দূর দিয়ে তোমরা উত্তরে চলে যাও। সেখানে কোনো মিলিটারি নেই। তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তাঁরা সেইভাবে চলে গেল। আমি ওই ১৪ বছরের ছেলেটিকে আসতে দেখলাম। আরেকটু অগ্রসর হতেই দেখতে পেলাম আরেক দল মিলিটারিকে। তারা লোকজনের নাম-ধাম টুকে নিচ্ছে। আমার পালা আসতেই আমি অন্য একটা নাম বললাম এবং সেটা লেখা হয়ে গেল। এই সময় দেখতে পেলাম রাজশাহী জেলের একজন ওয়ার্ডারকে। তাঁর পাশেই বসে আছে তাঁর স্ত্রী পুত্র। আমি বললাম, আপনিও যাচ্ছেন? তিনি বললেন, এখানে আমার আত্মীয়-স্বজন আছে। আমি একটু অসুবিধায় পড়লাম। ওয়ার্ডার যদি আমার প্রকৃত নাম বলে বসে, তবেই বিপদ! আমি অন্য নাম বলেছি। ইনি আমার প্রকৃত নাম বলে দিলে আবার না কোনো ঝঞ্ঝাট বেধে যায়! তাই তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্য আমি বললাম, ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে। একটু পানি পাওয়া যাবে কি? তিনি তখনই পানির জন্য ছুটলেন। পানি আনলেন। যাক, তিনি সৈন্যদের কাছে আমার প্রকৃত নাম বলেননি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমি ওই ১৪ বছরের ছেলেটিকে নিয়ে অনেক চর ভেঙে একটা গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই বসবাস। তাঁরা সব শুনে খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। একজন বললেন, "আমরা আপনাদের জন্য রান্না করেছি। খেয়ে যেতে হবে।" এর মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক লোক বললেন, "কংগ্রেসকে খবর দেই।" আমি বললাম,

"না, কংগ্রেসকে খবর দিতে হবে না। আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই। এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করতে পারলে আমরা বাসে করে গন্তব্য স্থানে চলে যাব। পরে আপনাদের দেনা শোধ করে দেব।" তিনি চলে গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর একটা জিপ এসে উপস্থিত হলো। যিনি জিপ এনেছেন, তিনি বললেন, "আমার নাম টুনু। আমি রাজশাহীর আবদুস সালাম উকিলের ভাই। আপনাকে নিতে এসেছি।" আমি বললাম, "ধন্যবাদ, তবে এঁরা রান্না করছে। না খেয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।" আমার নাম তিনি কী করে জানলেন, সেটা ভেবে পেলাম না। টুনু বললেন, "আমাদের খুব তাড়া আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য জিনিসপত্র পাঠাতে হবে।"

আমি তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ পর ওই জিপে উঠে আমি একজন ডাক্তারের বাড়ি গেলাম। ওই ডাক্তার একজন সাবেক এমএলএ। জিপটি ওই ডাক্তারেরই। ডাক্তার বললেন, "আপনার খাওয়া হয়েছে কি?" আমি বললাম, "আমার খাওয়া হয়েছে।" ডাক্তার বললেন, "আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আপনাকে বহরমপুর পৌঁছে দিয়ে আসব। এখান থেকে বহরমপুর ২৮ মাইলের মতো।"

বেশ কিছুক্ষণ পর আমরা জিপে করে বহরমপুরের দিকে রওয়ানা হলাম। ডাক্তারের বাড়ির পাশেই ভারতের সৈন্য-সমাবেশ দেখা গেল। ডাক্তার বললেন, "আপনি কোথায় যাবেন?" আমি বললাম, "যে কোনো রাজনৈতিক পার্টির নেতাকর্মীর কাছে গেলেই আমার চলবে।" তিনি সিপিআই'র একজন বন্ধুর নাম বললেন। আমি বললাম, "তাঁকে আমি চিনি।" জিপের ড্রাইভার বললেন, "ওই জায়গাটা ভালো নয়।" সিপিআই'র একজন প্রফেসর আছেন। আমাদের ইউনিয়নের তিনি সভাপতি। সেই এলাকাটা ভালো। ডাক্তার বললেন," সিপিআইএম ও নকশালদের মধ্যে দুদিন আগে খুনোখুনি হয়েছে। কাজেই শহরে কারফিউ। আমাদের কারফিউর আগেই ফিরতে হবে। যা হোক কিছুক্ষণের মধ্যে প্রফেসরের বাসায় জিপ এসে উপস্থিত হলো। প্রফেসর তখন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি বললাম, "ডাকুন তাঁকে।"

তিনি নিচে নেমে এলেন। আমি তাঁকে আমার নাম বললাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, "আরে আপনি! এপারে এসেছেন, খবরের কাগজে তা আগেই বেরিয়েছে।" আমি বললাম, "না, তা ঠিক না। আজই জেল ভেঙে আমি বেরিয়ে এসেছি।" তিনি বললেন, "খুব ভালো হয়েছে। কয়েকদিন এখানে থাকুন।" আমি বললাম, "সেটা সম্ভব না। আমাকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় যেতে হবে। আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই। এ ব্যাপারে সাহায্য করে আমাকে কলকাতায় পাঠাতে হবে।" তিনি বললেন, "সেজন্য কোনো চিন্তা করবেন না।" মাত্র একদিন সেখানে অবস্থান করে বাসে চেপে কলকাতায় চলে এলাম।

কলকাতায় এসে শুনলাম, আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেড ও অন্য সবাই আগরতলায়। কাজেই আমি আগরতলা যাওয়াই শ্রেয় মনে করলাম। কলকাতায় কয়েকদিন থেকে আমি আগরতলার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী অণিমা তখন আগরতলায় থাকে। আমার আগমনের তারিখ, কোন ফ্লাইটে আগরতলা আসছি, সেটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম। সে এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিল। কাজেই আমাদের নেতাদের খুঁজে পেতে আর কোনো রকম অসুবিধেই হয়নি।

সিপিআই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রতি প্রসারিত করল তাদের সাহায্যের হাত। ত্রিপুরা কমিটি আমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করল। ত্রিপুরা সরকারও করল আমাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা।

আমাদের থাকার জন্য একটা বড় বাড়ি পাওয়া গেল। এ ছাড়া পাওয়া গেল অন্য একটি বাড়িও। পাকিস্তান থেকে যাঁরা এসেছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ওই বাড়ি হলো তাঁদের আশ্রয়স্থল। ওই বাড়িটির বাসিন্দাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করার ভার নিলেন কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী। তিনি সুষ্ঠুভাবে এই বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের থাকার জন্য একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করা হলো।

এদিকে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে যাঁরা ইচ্ছুক তাঁদেরও মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের একটা ব্যবস্থা করা হলো। উচ্চতর গেরিলা ট্রেনিং-এর জন্য কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন সম্মিলিতভাবে যুবকদের পাঠাতে থাকল। এইভাবে ট্রেনিং নিয়ে কয়েক হাজার যুবক আগরতলায় ফিরে এলো। তাছাড়া সাধারণভাবে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীতেও যুবকদের পাঠানো হলো। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সবাই ট্রেনিং নিয়ে আগরতলায় এসে সমবেত হলো। বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে দেওয়া হলো তাঁদের। মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর শফিউল্লা, ক্যাপ্টেন খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল তাহের প্রমুখ অফিসার বিভিন্ন সীমান্তে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন

ইয়াহিয়া খান ১১ আগস্ট ঘোষণা করলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো এক সামরিক আদালতে মুজিবের গোপন বিচার শুরু হবে। বিচার কাজে কোনো বিদেশি আইনবিদ গ্রহণ করা হবে না। মুজিবের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সরকারি ঘোষণায় আরো

বলা হলো, মুজিবকে তাঁর নিজ পক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি নিজের পছন্দ মতো আইনবিদ নিতে পারবেন। কিন্তু শেখ মুজিব সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি নিজের পক্ষ সমর্থনে কিছুই করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। এই সঙ্গে তিনি তাঁর বিচার কাজে সামরিক আদালতের বৈধতার প্রশ্ন তুলে বললেন, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করাই যদি তাঁর অপরাধ হয়ে থাকে, তবে তাঁর আর কিছুই বলবার নেই।

আইয়ুব খান একবার শেখ মুজিবুর রহমানকে মিথ্যা আগরতলা মামলায় জড়িয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের ফলে তা শুধু ব্যর্থই হয়নি, আইয়ুব খান নিজেই ক্ষমতা থেকে অপসারিত হতে বাধ্য হন। ওই একই উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খানও শেখ মুজিবুর রহমানকে শেষ করে দিতে চান। ইয়াহিয়া নিজেই যেহেতু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগকারী, কাজেই আমরা প্রমাদ গুনলাম, তাঁর মৃত্যুদণ্ড এবার অবধারিত। ভারত এই বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারতীয় পার্লামেন্টের ৫০০ সদস্য জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার আবেদন জানান। খ্যাতনামা আইনজীবীরা বলেন, গোপন সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার অবৈধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী, ১৯৪৯ সালের ১২ আগস্টে স্বাক্ষরিত জেনেভা চুক্তির সাধারণ অনুচ্ছেদ ও তৃতীয় অনুচ্ছেদের বিরোধী। পাকিস্তান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি তাকে মেনে চলতে হবে। জাপানের সংসদ সদস্য মি. কামিচি মিসিসুরা অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি জানান। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে তিনি উ থান্টের প্রতি পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের দাবি জানান।

ইন্দিরা গান্ধী ২৪টি দেশের কাছে বার্তা পাঠান। ওই বার্তার মর্ম ছিল নিম্নরূপ :

"শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার অনুষ্ঠিত হতে চলছে। আশঙ্কা হয় যে, তাঁর তথাকথিত বিচার আর কিছুই নয়, শেখ মুজিবকে বিচারের নামে হত্যা করা। এর ফলে পূর্ববাংলা ও ভারতের অবস্থা মারাত্মক রূপ ধারণ করবে। আমরা আপনার নিকট আবেদন করছি, ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে যাতে তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হন।"

ভারতের বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবের এই বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হতে থাকে সভা-সমিতি। ওঠে প্রতিবাদের প্রবল ঝড়। সুখের বিষয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হয়নি, ইয়াহিয়াই হয়েছেন গদিচ্যুত। যা সত্য, চিরকাল তাই টিকে থাকে। যা কিছু অসত্য, তার জয় খুবই সাময়িক।

এরই মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তার মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। এই উপদেষ্টা কমিটিতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সভ্যবৃন্দ ছিলেন : মাওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ন্যাপ), মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস) ও মণি সিংহ (কমিউনিস্ট পার্টি)।

একটা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে শুধু গেরিলা আক্রমণ দ্বারা তা সম্ভব হয় না। গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা একটা শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে নাজেহাল করতে, ক্ষতিসাধন করতে পারলেও একটা দেশ দখল করতে পারে না। তার জন্য চাই সামরিকভাবে প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী।

১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর উপদেষ্টা কমিটির এক বৈঠকে আমন্ত্রিত জেনারেল ওসমানীকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনার মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা কত?" তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আশি হাজার।"

আমাদের তিন সংগঠনের সম্মিলিত গেরিলা বাহিনী ট্রেনিং শেষে আগরতলা থেকে বিভিন্ন সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের ভেতরে ঢুকে পাকবাহিনীর সঙ্গে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ ধরনের একটি গেরিলা দল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য রাতের অন্ধকারে ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে কুমিল্লা জেলায় উপস্থিত হয়। ঘটনাটা ঘটে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার বেতিয়ারা গ্রামের কাছে। এই দলের গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন নিজামুদ্দিন আজাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাঁরা এগিয়ে যেতে থাকেন। পেছনে ভারতের সীমান্ত এলাকা। এই সময় আওয়াজ আসে, 'হ্যান্ডস্ আপ্।' গ্রুপ কমান্ডার আজাদ আকস্মিক বিপদের মুখে পড়ে সবাইকে পেছনে চলে আসার নির্দেশ দিলেন। নিজের মেশিনগান দিয়ে শুরু করলেন গুলিবর্ষণ। সহকর্মীরাও গ্রহণ করলেন একই মতো কার্যক্রম। কিন্তু হানাদার বাহিনী তাদের তিন দিক থেকে আক্রমণ চালাতে চালাতে ঘিরে ফেলল। সামনে পাকবাহিনীর রাইফেল ও মেশিনগানের শেল পড়তে লাগল। এই অবস্থায় গেরিলাবাহিনী নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারলেও ৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা পারলেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁরা তাঁদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়ে গেলেন।

বেতিয়ারার ওই যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন নিজামুদ্দিন আজাদ ও সিরাজুম মুনির (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), শহীদুল্লাহ সাঈদ (কনিষ্ঠতম শহীদ, নবম শ্রেণির ছাত্র), আওলাদ হোসেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি ক্লাসের ছাত্র), বসির মাস্টার (স্কুল শিক্ষক), দুদু মিয়া (সাধারণ কৃষক), আবদুল কাইয়ুম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র), মো. শফিউল্লাহ ও আবদুল কাদের। এই গেরিলা দলটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কমান্ডের অধীন।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী রাস্তার পাশেই বেতিয়ারা গ্রামে এঁদের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি বছর এই শহীদ মিনারের পাদদেশে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মরণসভা করা হয়ে থাকে।

১৯৭১ সালের ৩ মে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। ইন্দিরা গান্ধী এরই মধ্যে সারা দুনিয়া ঘুরে এলেন বাংলাদেশ নিয়ে উপমহাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে অবগত করার জন্য। কিন্তু একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া বাংলাদেশ ও ভারতকে সাহায্য করার ব্যাপারে আর কোনো দেশ তেমন আন্তরিকভাবে সাড়া দিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট। এই চুক্তির ভেতর দিয়ে শক্তিশালী হয় ইন্দিরা গান্ধীর হাত।

পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের সমর্থনে ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে বন্‌ধ পালিত হয়। রাজ্য ও লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং।

শুরু হলো যুদ্ধ

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করে বসে। পশ্চিম পাকিস্তানে তার সীমান্ত বরাবর ভারত ছিল প্রস্তুত। তারাও বিরাট পাল্টা আঘাত করে বসে। ফলে উভয়পক্ষে বেধে গেল যুদ্ধ। বাংলাদেশেও ভারতের সৈন্য নেমে গেল। মিলিত হয় তারা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে। প্রবল যুদ্ধ চলতে লাগল। ভারতের জঙ্গি বিমান বহর আক্রমণ চালাল ঢাকার ওপর। ধ্বংস হলো পাকিস্তানের অনেকগুলো জঙ্গি বিমান। কিছু বিমান পালিয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে।

বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭৫ থেকে ৮০ হাজারের মতো। ভারত তার চাইতেও বেশিসংখ্যক সৈন্য নামিয়ে দিল। একমাত্র দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ছাড়া, বাংলাদেশ তিন দিক দিয়ে ভারতের সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাজেই ১২০০ মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে যুদ্ধরত পাকবাহিনীর জন্য তেমন কোনো কার্যকর সাহায্য আসতে পারল না। ফলে পাকবাহিনী সম্পূর্ণ বিপাকে পড়ে গেল। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মলিত বিমান ও স্থল আক্রমণ, সেই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে

মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ইউনিটগুলোর উপর্যুপরি আক্রমণে পাকবাহিনীর যুদ্ধ করার মনোবল অচিরেই ভেঙে পড়ল।

মুক্তিবাহিনী অবশ্য আগে থেকেই যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, সিলেট, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল এবং ঢাকার আশপাশে যুদ্ধ করে চলেছিল। ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে যাত্রাবাড়ী এলাকায় এই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক আক্রমণে কিছুসংখ্যক পাকবাহিনীর সদস্য নিহত হলো। প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য তারা যাত্রাবাড়ীর নিকটবর্তী দয়াগঞ্জ এলাকায় কয়েকশ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিলে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এক নতুন প্রাণাবেগের সঞ্চার হয়।

৭ ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের আগমনের সংবাদ পাওয়া গেল। ওই নৌবহরের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে আসছে সোভিয়েত সাবমেরিন বহর—এমন সংবাদও প্রচারিত হলো। এই সময় পাকবাহিনী কার্যত আত্মসমর্পণের চিন্তা-ভাবনা করছিল, কিন্তু সপ্তম নৌবহরের আগমন সংবাদে তারা যেন একটুখানি দম নেওয়ার ফুরসত পেল। ভারতের জঙ্গি বিমানগুলো তখনো ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বোমার পর বোমা নিক্ষেপ করে চলেছে। বঙ্গভবনের ওপরেও এই সময় একটা বোমা পড়ে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ওপরেও বোমা বর্ষিত হয়। ১০ ডিসেম্বর নাগাদ পাকবাহিনীর অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। সীমান্ত এলাকায় থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

ভারতীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল মানেক শ এই সময় বারবার পাকবাহিনীর প্রতি আত্মসমর্পণের আবেদন প্রচার করতে লাগলেন। তিনি তাঁর আবেদনে বলতে লাগলেন, সাধারণ সৈন্যদের অনর্থক প্রাণহানি ঘটাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন ডা. মালেক। তিনি ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহনীর সম্মিলিত আক্রমণে এতটাই ভীত হয়ে পড়েন যে, তিনি পদত্যাগ করে ঢাকার এক নামি হোটেলে এসে আশ্রয় নেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাকে গ্রেপ্তার ও তার বিচার করা হয়।

নয় মাস দীর্ঘ প্রবল সংগ্রাম, পাকবাহিনীর নৃশংস অত্যাচার, ২ লাখ নারীর সম্ভ্রম ও ৩০ লাখ মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে বাংলাদেশ অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করল। এই দিনই ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমাণ্ডের লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির নেতৃত্বে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

১৬ ডিসেম্বরের অব্যবহিত পরেই আমাদের পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ বাহিনীর সদস্য ও নেতারা ঢাকায় চলে আসেন। আমি ও আমাদের দলের কয়েজন ১৪ ডিসেম্বর যশোরে যাই। সেখানে আমরা আমাদের পার্টি অফিস উদ্বোধন করি। তখনো পাকবাহিনী খুলনায় আত্মসমর্পণ করেনি।

১৬ ডিসেম্বরের পাঁচদিন পর অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বরে আমি বিমানবাহিনী প্রধান এ কে খন্দকার সাহেবের সঙ্গে এক জঙ্গি বিমানে চেপে ঢাকায় এসে পৌঁছি। অস্থায়ী সরকারের নেতৃবৃন্দ কয়েকদিন পর ঢাকায় আসেন।

দেশের মাটিতে ফিরেও আমরা স্বস্তি পাই না। হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের নানা সংবাদে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে প্রতি মুহূর্তে। এদিকে বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশ। দেশের এই পরিস্থিতিতে স্বদেশের মাটিতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসী আকুলপ্রায়। অবশেষে ১০ জানুয়ারি তাঁর স্বদেশ-ভূমি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু। দেশবাসী তাঁকে জানাল আন্তরিক বিপুল সংবর্ধনা।

দেশের মাটিতে ফিরে আসার পর পরই যে মর্মান্তিক সংবাদটি আমাকে উদ্বেগ আকুল করে তুলেছিল, তা ছিল বুদ্ধিজীবীদের হত্যার বিষয়টি। এই হত্যার শিকার হয়েছেন আমাদের কমরেড শহীদুল্লা কায়সার, সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী, চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আবদুল আলিমসহ চেনা-অজানা দেশবরেণ্য এমন অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, বেঁচে থাকলে যাঁদের আন্তরিক সেবায় দেশের মাটি নানা ক্ষেত্রে ধন্য হতে পারত। এই ক্ষতি সহজে পূরণ হওয়ার নয়। রাজাকার, আলবদর ও আলশামস্ বাহিনীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত এইসব বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিকের মৃত্যু তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার, সেই সঙ্গে দেশবাসীর জন্যও এক দুঃসহ ঘটনা।

সরাসরি যাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, অথচ দেশের ভেতরে থেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিবাহিনীকে আহার ও বাসস্থান দিয়ে, ওষুধপত্র ও নানা ধরনের সেবা দিয়ে সাহায্য করেছেন, আমি সেই আপামর বীর দেশবাসীকেও আমার প্রাণের গভীর থেকে অভিনন্দন জানাই। কেননা সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী এবং নিরস্ত্র দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেরই ফসল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

অমর হোক বাংলাদেশ। মৃত্যুঞ্জয়ী দেশবাসীকে আমার লাল সালাম।

■

আলোকচিত্র
কমরেড মনি সিংহ

পাহাড়ি এলাকায় কৃষকসভা ছবি : সুনীল জানা

নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা-ভারত কৃষক সম্মেলনের প্রবেশ পথে সংগ্রামী কৃষকের ভাস্কর্য

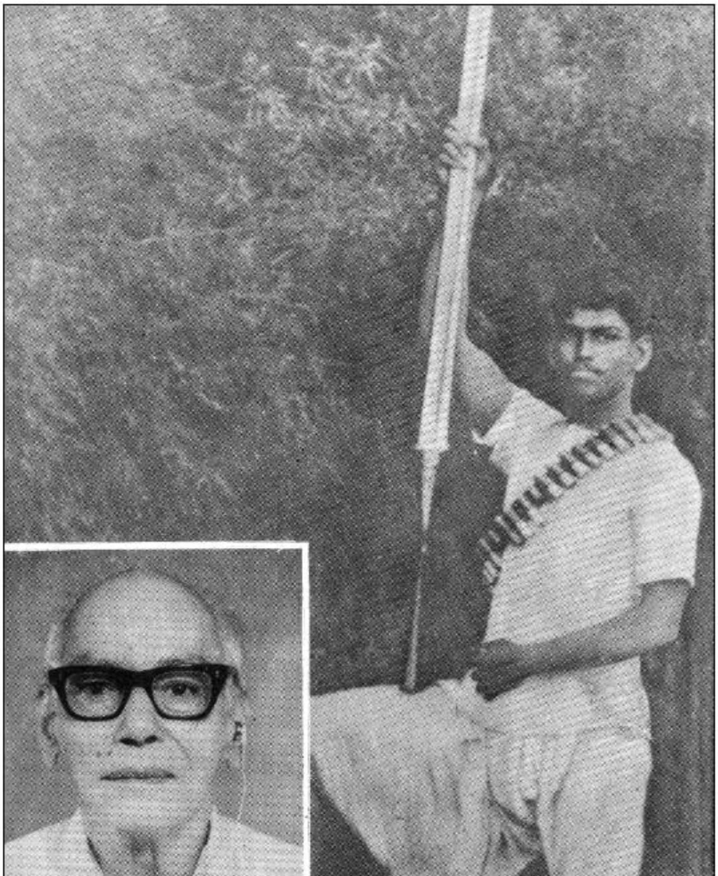

লেখক মণি সিংহ

২০ বছর বয়সে মণি সিংহ

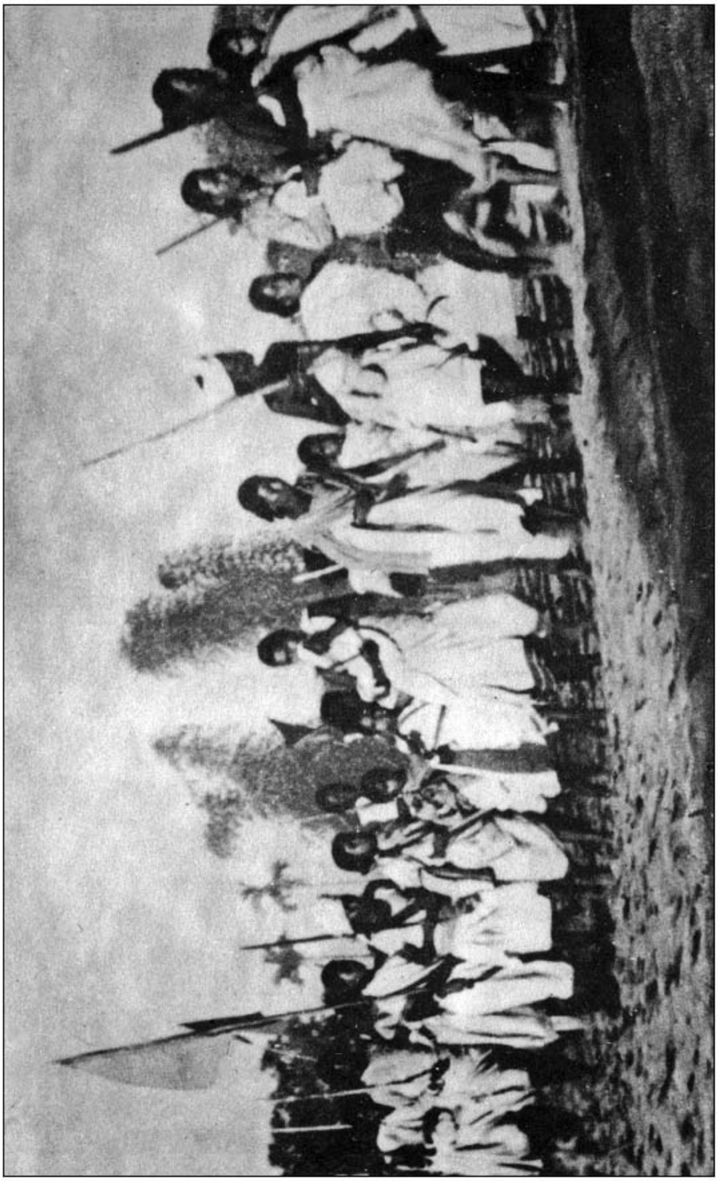

পাহাড়ি এলাকায় হাজং নারীদের মিছিল ছবি : সুনীল জানা

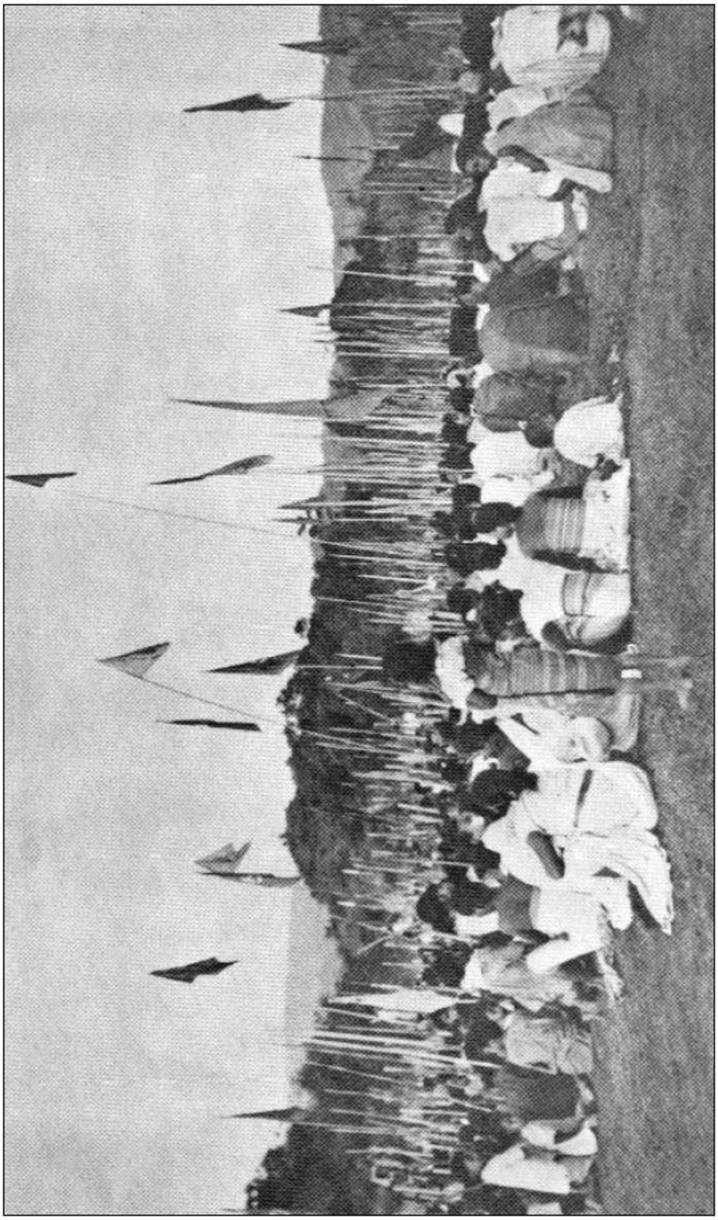

লাল পতাকা ও লাঠি নিয়ে একটি জঙ্গি মিছিল ছবি : সুনীল জানা

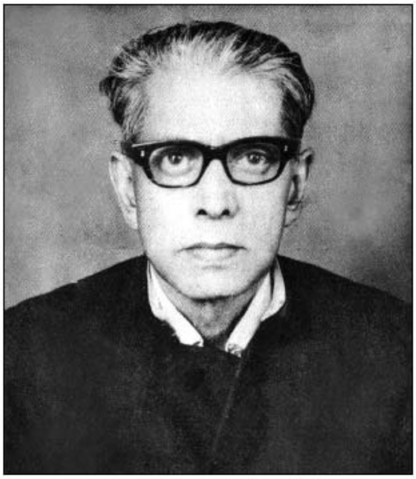

খোকা রায়

ললিত সরকার ও প্রমথ গুপ্ত

আলতাব আলী

শহীদ অনন্ত

রবি নিয়োগী

অণিমা সিংহ

পরেশ চন্দ্র হাজং

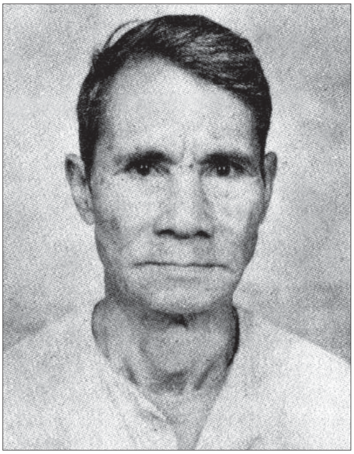

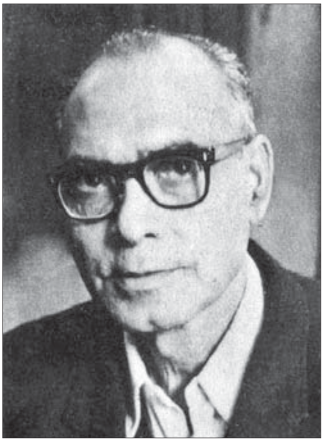

জলধর পাল

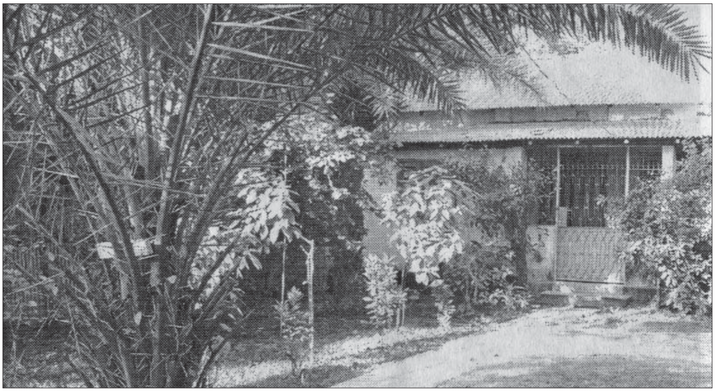

দুর্গাপুরে মণি সিংহের বাড়ির ভিটার একটি অংশ

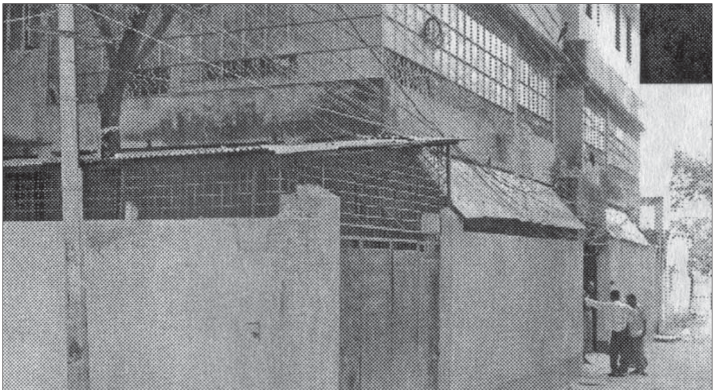

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পাশে প্রয়াত অধ্যাপক হিশামউদ্দিনের এই বাসায় ১৯৬০-৬৪ সাল পর্যন্ত কমরেড মণি সিংহ আত্মগোপন অবস্থায় থেকেছেন। তখন এটি একটি আধাপাকা বাড়ি ছিল

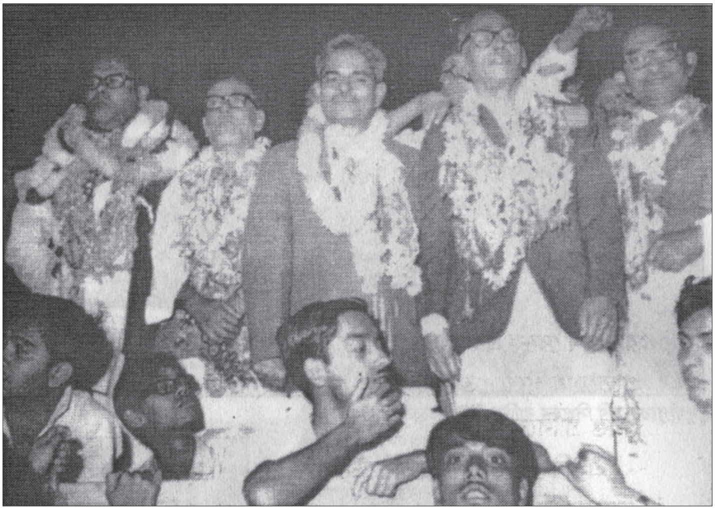

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে বের হবার পর কমরেড মণি সিংহসহ রাজবন্দীদের গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছবিতে কমরেড মণি সিংহের সাথে কমরেড মন্মথ দে, কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জী, কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, কমরেড অমল সেন প্রমুখ।

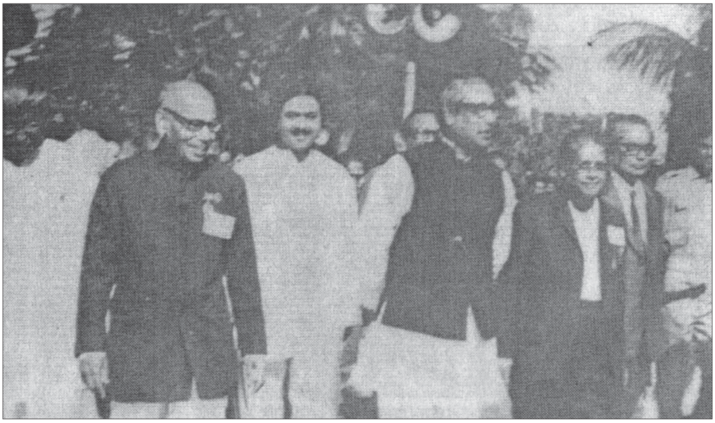

কমরেড মণি সিংহ (বাম দিক থেকে দ্বিতীয়), ড. কামাল হোসেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কমরেড আবদুস সালাম (বারীণ দত্ত); ১৯৭৩ সাল

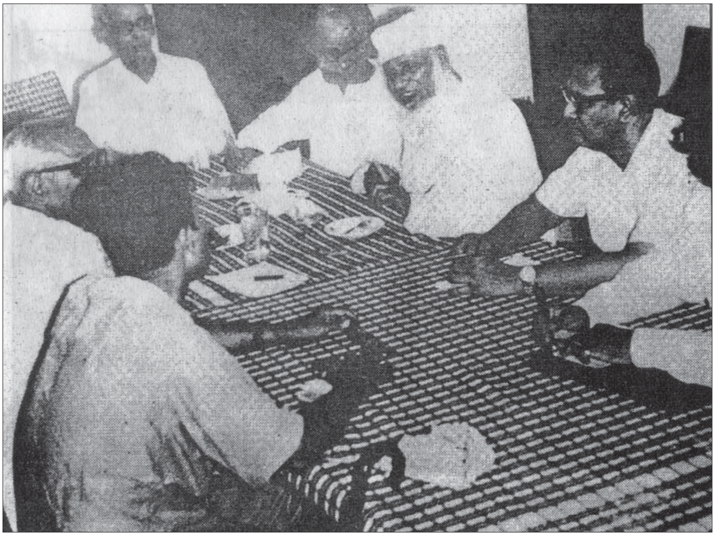

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠিত অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর বৈঠকে অন্যদের সাথে কমরেড মণি সিংহ, ১৯৭১

কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী, কমরেড আবদুস সালাম (বারীন দত্ত), কমরেড খোকা রায় ও কমরেড মণি সিংহ; ১৯৭২

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য মিছিলে কমরেড মণি সিংহ, কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ, কমরেড খোকা রায়, কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী প্রমুখ

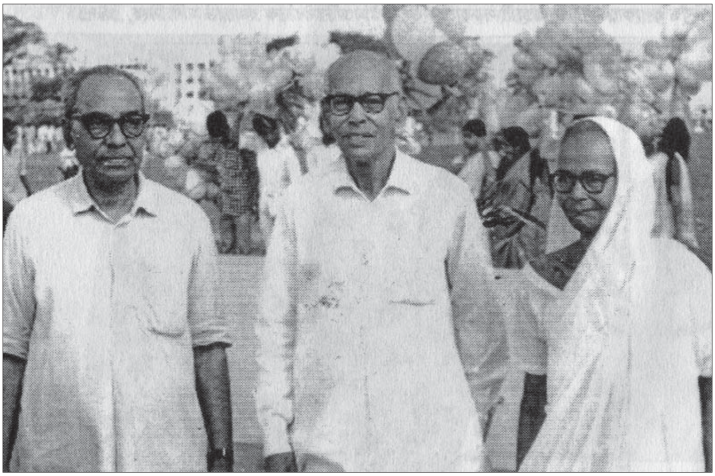

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ২০তম জাতীয় সম্মেলনে কমরেড গোপেন চক্রবর্তী, কমরেড মণি সিংহ ও কমরেড মণি সিংহের বড় বোন কমরেড নির্মলা সান্যাল

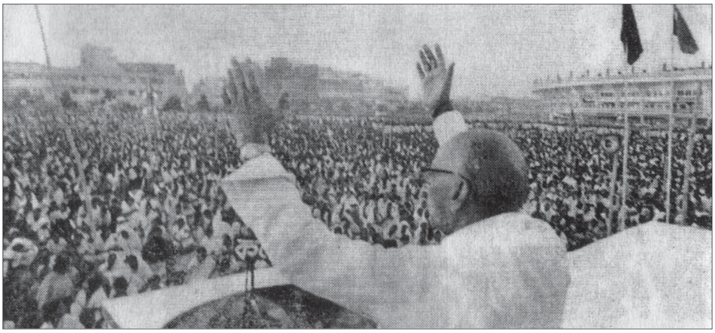

স্বাধীন বাংলার মাটিতে ১৯৭২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন কমরেড মণি সিংহ।

১৯৭৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন কমরেড মণি সিংহ।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কুশপুত্তলিকা দাহ (১৯৭৩)। ছবিতে কমরেড মো. ফরহাদ, কমরেড মণি সিংহ, কমরেড আবদুস সালাম (বারীন দত্ত) ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

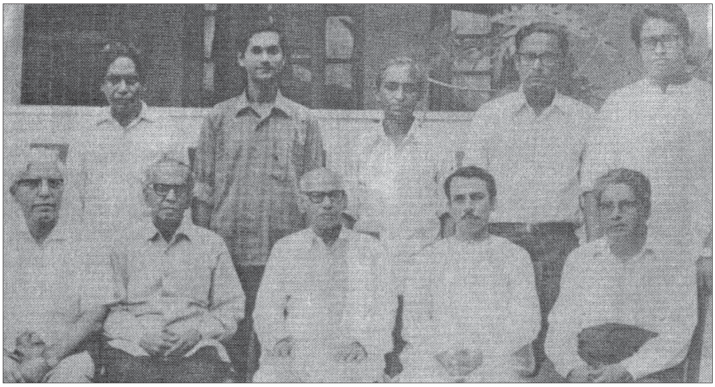

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী। দাঁড়ানো যথাক্রমে সর্বকমরেড আমজাদ হোসেন, নূরুল ইসলাম, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, অজয় রায়, মনজুরুল আহসান খান। বসা সর্বকমরেড অনিল মুখার্জী, খোকা রায়, মণি সিংহ, মোহাম্মদ ফরহাদ ও আবদুস সালাম (বারীণ দত্ত)।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস (১৯৭৩) মঞ্চে কমরেড মণি সিংহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং কমরেড আবদুস সালাম (বারীণ দত্ত)।

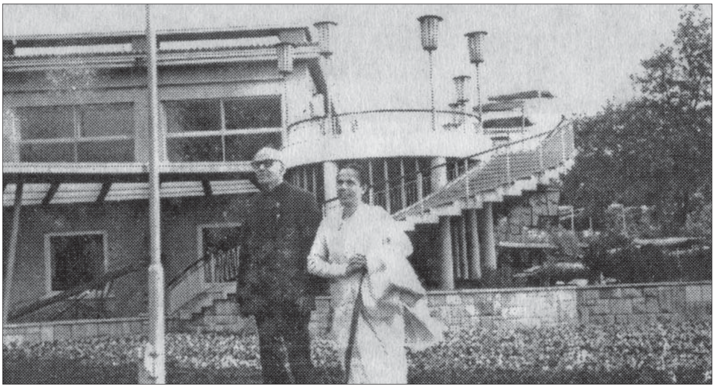

১৯৭৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমরেড অণিমা সিংহ ও কমরেড মণি সিংহ

একতা পড়ছেন কমরেড মণি সিংহ; ১৯৮০

জনসভায় সুপরিচিত ভঙ্গিমায় বক্তৃতারত কমরেড মণি সিংহ। পাশে দাঁড়ানো কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ ও কমরেড মনজুরুল আহসান খান।

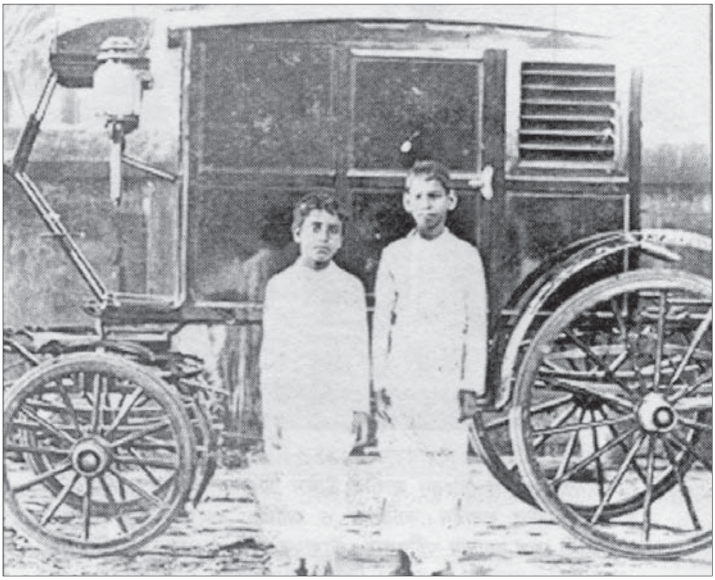

ডানে দাঁড়ানো কমরেড মণি সিংহ, ১৯১৪

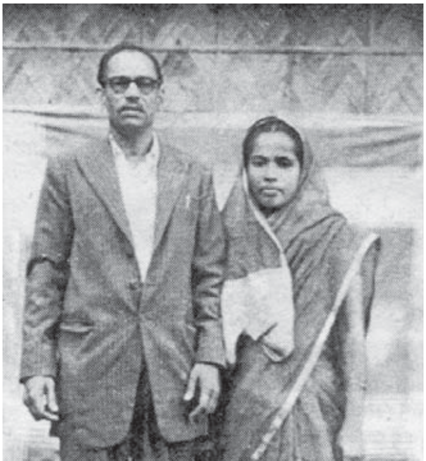

কমরেড মণি সিংহ ও
কমরেড অণিমা সিংহ;
১৯৫৫

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কমরেড আবদুস সালাম ও এ্যাড. রতনের সঙ্গে কমরেড মণি সিংহ; ১৯৮০

অসুস্থ কমরেড মণি সিংহকে খাইয়ে দিচ্ছেন কমরেড শান্তি দত্ত। পাশে পার্টির নিরাপত্তা কর্মী কমরেড ইদ্রিস আলী।

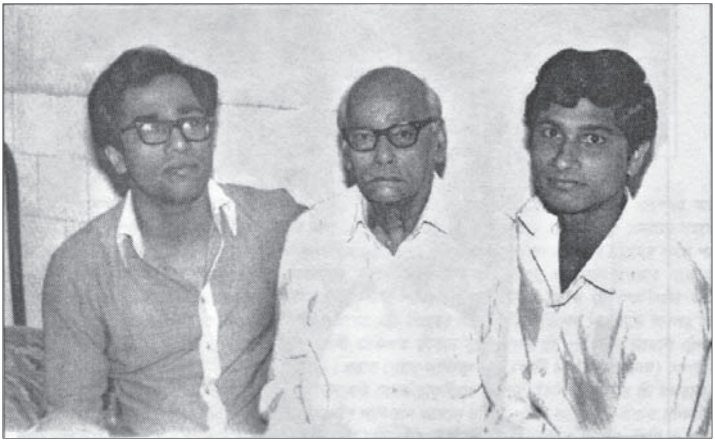

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম স্ট্রোকের পর, বামে পুত্র কমরেড ডা. দিবালোক সিংহ ও তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. অসিত বরণ রায়ের সাথে; **১৯৮৪**

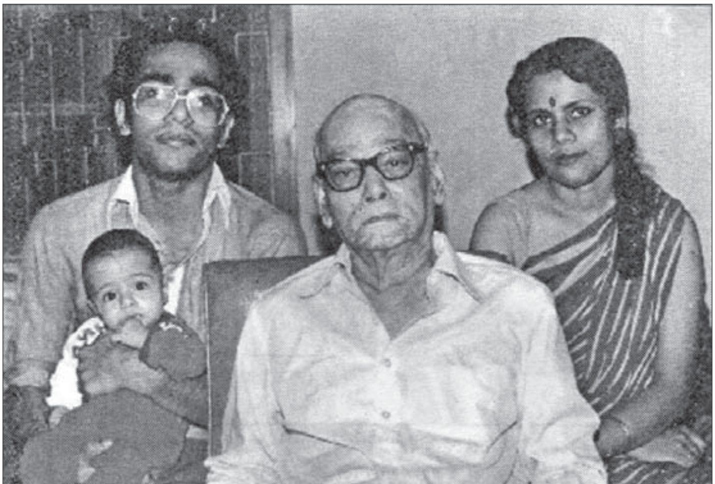

পুত্র ডা. দিবালোক সিংহ, নাতি অনিক সিংহ ও পুত্রবধু ডা. সাকি খন্দকারের সঙ্গে কমরেড মণি সিংহ; **১৯৮৬**

অন্তিম প্রস্থান : কমরেড মণি সিংহের মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা; ১৯৯১

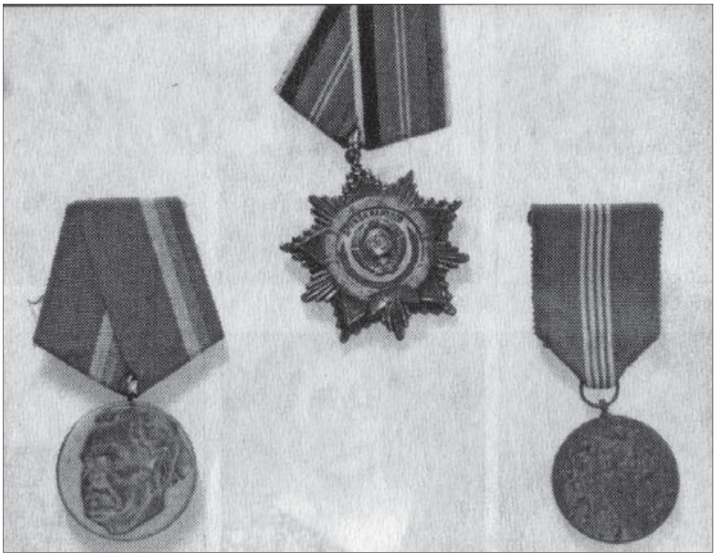

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস (মাঝখানে), বুলগেরিয়ার ডিমিট্রিভ পদক (বামে), চেকেশ্লোভাকিয়ার পদক (ডানে)

বাকশাল প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু পদক, ১৯৮৬ (বামে), কমরেড মণি সিংহের ৮৩তম জন্মদিনে প্রদত্ত কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাজ; ১৯৮৩

স্বাধীনতা পুরস্কার পদক (মরণোত্তর), ২০০৪

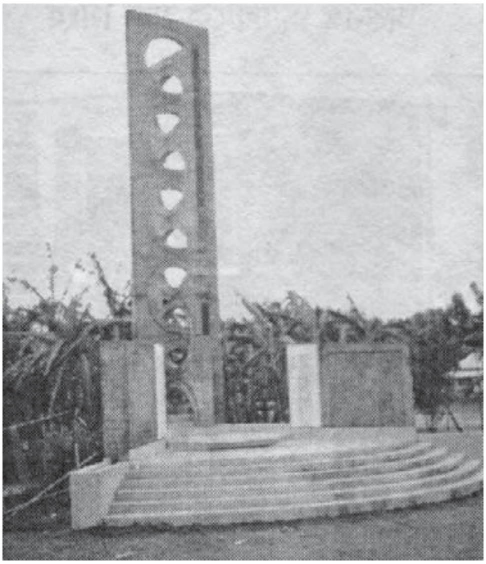

টংক শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। নির্মাণকাল : ১৯৯৩।
উদ্বোধন করেন কমরেড রবি নিয়োগী

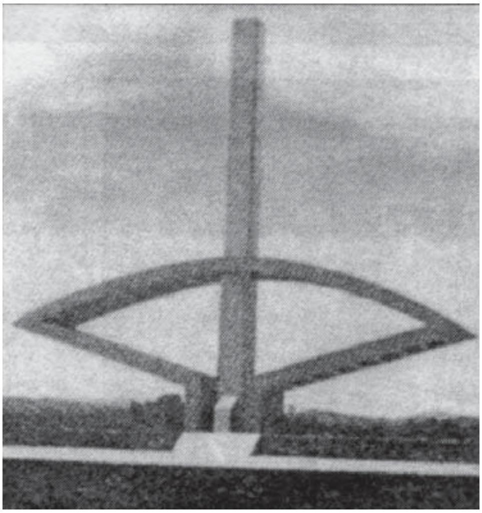

শহীদ রাশিমনি (১৯৪৬) স্মৃতিস্তম্ভ, বহেরাতলি,
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ, কমরেড মণি সিংহ, কমরেড আবদুস সালাম (বারীণ দত্ত)।

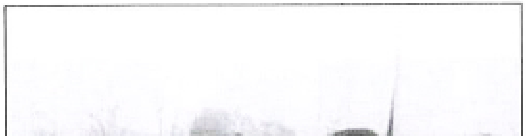

কমরেড ইলা মিত্রের সঙ্গে কমরেড মণি সিংহ